ভারতের
শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

১৮৩০—১৯৭০

প্রথম খণ্ড

সুকোমল সেন

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—৭



প্রথম প্রকাশ
১লা মে, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি সংগ্রামে
শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন
যাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্যে

দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।

গ্রন্থকারের নিবেদন

আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা অবসানের পর পৃথিবীতে এ-যাবৎ যে সমাজব্যবস্থাগুলি বিরাজমান ছিল তার ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। দাস সমাজব্যবস্থায় দাস মালিকদের সঙ্গে দাসদের সংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে ভূমিদাসদের সংগ্রাম—এটাই ছিল ইতিহাসের প্রক্রিয়া। ইতিহাস সম্পর্কে এই মার্কসীয়, শিক্ষার আলোকেই বিচার্য শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস।

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়— সেই শিল্প-বিপ্লব দুইটি পরস্পর বিরোধী আধুনিক শ্রেণীর জন্ম দেয়। একটি বুর্জোয়াশ্রেণী, অপরটি শ্রমিকশ্রেণী।

ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে শিল্প-বিপ্লবের কোন সুযোগ ঘটেনি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত ও যন্ত্রণাদায়ক। বর্তমান গ্রন্থটি ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই উদ্ভব প্রক্রিয়া ও তার কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস।

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ভারতের সামাজিক ইতিহাস রচনায় তাদের শ্রেণীগত কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকাকে উপলব্ধি করতে পারেননি এবং তাই তাঁদের রচিত ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কাহিনী নিতান্তই গৌণ।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের মার্কসীয় বিশ্লেষণে শ্রমিকশ্রেণীই আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী এবং এই শ্রেণীই পুঁজিবাদের সমাধি রচনা করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়। ১৯১৭ সালে মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এই শ্রেণীরই বৈপ্লবিক নেতৃত্বে।

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম তাই শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অঙ্গীভূত। ঔপনিবেশিক ভারতের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

বৈপ্লবিক সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে বাদ দিয়ে নয়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ভারতের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রবাহ থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে সরিয়ে রাখবার সযত্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ইতিহাসই। আজকের ভারতের ভিন্নতর পটভূমিকায় ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই বৈপ্লবিক ভূমিকাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থিত করে ভারতের গণ-সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক তাৎপর্যটিকে তুলে ধরাই বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য।

কিন্তু এই কাজ অত্যন্ত দুরূহ। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে তার ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম বা রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারাবাহিক এবং বস্তুনিষ্ঠ কোন ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা এই সম্পর্কে যে প্রচেষ্টাগুলি চালিয়েছেন তা নিতান্তই খণ্ডিত এবং বিক্ষিপ্ত। বিশেষ করে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর আবিলতার দরুণ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য তাঁদের সেই বিক্ষিপ্ত রচনাগুলির মধ্যে কোন ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হয়নি। তবে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রজনী পাম দত্তের রচনার কথা। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' গ্রন্থে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ের বৈপ্লবিক তাৎপর্যটিকে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের আকারে হলেও ভারতের জনগণের সামনে তুলে ধরেন।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে দেশটিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সাধিত হয়েছিল সেই ইংলণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে ফ্রেড্‌রিখ এঙ্গেলস্ তাঁর রচিত 'কনডিশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংলণ্ড' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'বর্তমান কালের সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি এবং তার গতি পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার মধ্যেই নিহিত, কারণ এটাই হচ্ছে আমাদের যুগের সামাজিক দুর্গতির প্রকটতম এবং সর্বোচ্চ রূপ।'

অর্থাৎ পুঁজিবাদী কর্তৃক শ্রমিককে শোষণ এবং এই শোষণের অবসানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামই পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক আন্দোলন ও গতি পরিবর্তনের চালিকা শক্তি। পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সমৃদ্ধি বহন করে আনেনি। এনেছে এক শোচনীয় জীবন যন্ত্রণা।

ইংলণ্ডে সর্বহারার ইতিহাস শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ থেকেই। কিন্তু তার একশত বৎসর পরেও আধুনিক পুঁজিবাদের জন্মস্থান

ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর যে অবস্থা এঙ্গেলস্ বর্ণনা করেছেন তা পুঁজিবাদের কদর্য শোষণমূলক চরিত্রটাকে তৎকালেই সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ে পুঁজিবাদীর সমৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকট ছিল শ্রমিকশ্রেণীর অশেষ দারিদ্র্য। পরস্পর বিরোধী দুইটি শ্রেণীর সামাজিক পার্থক্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ছিল। এঙ্গেলস্ লিখেছেন, 'প্রতিটি বৃহৎ শহরেই ছিল এক বা একাধিক বস্তী যেখানে শ্রমিকরা ঠাসাঠাসি হয়ে থাকত। এটা সত্যি যে ধনীদের প্রাসাদের অন্ধকারে আনাচে কানাচে প্রায়শই থাকে দারিদ্র্যের অবস্থান ; কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে এখানে একটা পৃথক অঞ্চল, যাতে করে ধনিকশ্রেণীর দৃষ্টি থেকে দূরে থেকে দারিদ্র্য তার সাধ্যমত লড়াই করে এগিয়ে যেতে পারে।' যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত এবং অন্যান্য উপনিবেশ লুণ্ঠন করে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহায়তায় ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সমাধা করছে তখন ইংলণ্ডের শ্রমিশ্রেণীর কাছে এই দারিদ্র্যই ছিল নির্মম বাস্তবতা।

এক নিদারুণ অমানবিকতা হল পুঁজিবাদের সহচর। এঙ্গেলস্ লিখছেন, 'শিল্প মালিকদের ঘৃণ্য অর্থ-লালসা জন্ম দিল এক বিরাট সংখ্যক ব্যাধির। স্ত্রীলোকেরা সন্তান ধারণে অনুপযুক্ত হল, শিশুদের অঙ্গ-বিকৃতি ঘটল, পুরুষরা দুর্বলতর হল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ভেঙে-চুরে গেল, একটা সমগ্র পুরুষই ব্যাধিতে এবং দৈহিক অক্ষমতায় সর্বনাশগ্রস্ত হল এবং তার একমাত্র কারণ হল বুর্জোয়াদের অর্থের ঝুলিটিকে ফাঁপিয়ে তোলা'। ইংলণ্ডের পুঁজিবাদী শোষণের বর্বরতার নিদর্শন দিতে গিয়ে এঙ্গেল্স আরো লিখেছেন, '....কিভাবে সর্দাররা নগ্ন শিশুগুলিকে তাদের শয্যা থেকে ধরে আনে এবং লাথি ঘুষি মারতে মারতে তাদের কারখানায় ঠেলে নিয়ে যায়, শিশুদের জামাকাপড়গুলো তাদের হাতেই থাকে আর কিভাবে ঘুষি মেরে তাদের ঘুম ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিভাবে তাসত্ত্বেও শিশুগুলি কাজ করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার কিভাবে সর্দারের ডাকে একটি অসহায় ঘুমন্ত শিশু ধরমর করে জেগে ওঠে· কিভাবে অতি ক্লান্ত শিশুগুলি শুকনো ঘরে পশমের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার কিভাবে চাবুক খেয়ে কারখানা থেকে বিতাড়িত হয়, কিভাবে শত শত শিশু রাত্রিতে এত ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যে নিদ্রালুতার জন্য এবং খিদে বিনষ্ট হওয়ায় রাত্রির খাবার খেতে পারে না এবং তাদের পিতামাতারা দেখে প্রার্থনারত অবস্থায় তাদের শয্যার পাশে এলিয়ে পড়েছে......'

এই হচ্ছে ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী। ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর এই অবস্থা ঘটছে তখন যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে ভারতীয় জনগণকে শোষণ করে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সফল করতে ব্যস্ত। তাই সহজেই অনুমেয় এই পরিস্থিতিতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে যখন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব শুরু হল তখন এই ঔপনিবেশিক দেশের নবজাত শ্রমিকশ্রেণীকে কি এক অসহ্য নারকীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে আবার এই শোষণের ছিল দুইটি রূপ। শ্রমিকশ্রেণী সহ সমগ্র ভারতীয় জনগনের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। আবার ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকানা নির্বিশেষে ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণীর উপর পুঁজিবাদী শোষণ।

ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীকে জন্মকাল থেকে সংগ্রাম করতে হয়েছে একমাত্র পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধেই। কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হয়েছে এক দিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, অপর দিকে তেমনি ভারতীয় ও ব্রিটিশ পুঁজিপতির শোষণের বিরুদ্ধে। তাই এক অসহনীয় সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবন যন্ত্রণার মধ্যে থেকে ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীকে এই কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে তার জন্মলগ্ন থেকেই।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রাম কঠোরতম রূপ ধারণ করে। পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রেণীসংগঠন ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হয়। এই ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনা বিকশিত হতে শুরু করে এবং এক দীর্ঘ, কঠিন ও তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই শ্রমিকশ্রেণী আজ একটি পরিণত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিকাশলাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

এই গ্রন্থে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তি এবং তার উৎপত্তিকালীন সমস্যা ও বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তি মুহূর্ত থেকে তার কঠোর শ্রেণীসংগ্রামের ইতিবৃত্তই বিশ্লেষণ করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম জাতীয়

মুক্তিকে বাদ দিয়ে সংঘটিত হয় না বরং তা সংঘটিত হয় জাতীয় মুক্তির সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিতেই।

এই গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ায় এবং প্রকাশনার বিভিন্ন অসুবিধার দরুন গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে ১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সর্বভারতীয় শ্রেণী সংগঠন সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তৎপরবর্তীকাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং স্বাধীনতা উত্তর ঘটনাসমূহের বিকাশ আলোচিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির বিকাশও আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডে।

এই গ্রন্থ রচনার কাজটি ছিল স্বভাবতই অতি কঠিন। কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দুর্নিবার আগ্রহ-ই ছিল এই কঠিন কাজে প্রেরণার উৎস। অবশ্যই পূর্বসূরীদের বিভিন্ন রচনা থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হতো না। তাই সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়েছে একদিকে যেমন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের রচনাগুলি থেকে, অতি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের অমূল্য রচনাগুলি থেকে। গ্রন্থকার তাই এঁদের কাছে ঋণী।

এই গ্রন্থ রচনায় বিভিন্নভাবে সহায়তা দান করেছেন এবং অশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছেন আমার বহু বন্ধু ও সহকর্মী। তাঁরা সকলেই গ্রন্থকারের ধন্যবাদার্হ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বন্ধুবর অমুনয় চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ, সাহায্য ও সহযোগিতা। তাঁর কাছে গ্রন্থকার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ নয়াদিল্লীস্থিত ভারতের জাতীয় মহাফেজ-খানা, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য মহাফেজখানার কর্মীবৃন্দের নিকট, যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এই গ্রন্থ রচনাকে ত্বরান্বিত করেছে।

নবজাতক প্রকাশনের পরিচালক মজহারুল ইসলাম অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতি এবং অন্যান্য যে কর্মীরা এই গ্রন্থ প্রকাশনায় বিভিন্ন কাজে পরিশ্রম ও সাহায্য করেছেন, গ্রন্থকার তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস রচনার এই কঠিন প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারাই তার বিচার করবেন। যদি এই গ্রন্থ তাঁদের অনুসন্ধিৎসাকে আংশিকভাবেও মেটাতে সক্ষম হয় তবে একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে গ্রন্থকার তাঁর প্রচেষ্টাকে অবশ্যই সার্থক মনে করবেন।

এইরূপ একটি গ্রন্থে ভুল-ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে উল্লেখ করে গ্রন্থটির সমৃদ্ধির সহায়তা করলে গ্রন্থকার কৃতজ্ঞ হবেন।

গ্রন্থকার

৮৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
১লা মে, ১৯৭৫

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। গ্রন্থকারের পক্ষে নিশ্চয়ই এটা আনন্দের বিষয়। যে লক্ষ্য নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছিল আজ বলা যায় মোটামুটি তা সফল হয়েছে।

গ্রন্থটিতে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভবকাল থেকেই আলোচনা শুরু করা হয়েছিল এবং মূলত সেই আলোচনা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-প্রাপ্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। তা ছাড়া গ্রন্থের কোন কোন পরিচ্ছেদে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতাও পরিলক্ষিত হয়েছিল। সেই অসম্পূর্ণতাগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষ করে প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৭ সালেই প্রকৃতপক্ষে শেষ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালের ইতিবৃত্ত বিষদভাবে আলোচিত ছিল না প্রথম সংস্করণে। দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ অসম্পূর্ণতা দূর করার চেষ্টা হয়েছে এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ হবে।

মোট কথা ১৮৩০ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যে ইতিবৃত্ত তাই নতুন সংস্করণের দুই খণ্ডে বিশ্লেষণ সহ আলোচিত হয়েছে।

এটা ভেবে নেওয়া অন্যায় হবে না যে এই দ্বিতীয় সংস্করণ অধিকতর সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছাবে এবং তা আরও আদৃত হবে।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মার্কসীয় দর্শনে শ্রমিকশ্রেণী
ও
ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা

বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা

মানব সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে একদল মানুষ গোড়া থেকেই সমাজের নীচের তলায় থেকে পরিশ্রম করে সম্পদ উৎপাদন করছে যদিও সেই সম্পদ ভোগ করেছে আরেকদল মানুষ। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কখনও ক্রীতদাসরূপে কখনও বা ভূমিদাসরূপে এই নীচের তলার মানুষেরা নিস্পেষিত হয়েছে। মানব ইতিহাসের আরো অগ্রগতিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুদয়। শ্রমিকশ্রেণী জন্মলাভ করেছে এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই। এই নতুন সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমের ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে অফুরন্ত সম্পদ যার মালিক শ্রমিকশ্রেণী নয়—অন্য একদল মানুষ—পুঁজিবাদী শ্রেণী, যাঁদের সঙ্গে উৎপাদনের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই।

এটাই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্ব। শ্রমজীবী মানুষ যারা উৎপাদন করে—আর যারা সেই উৎপাদনের মালিকানা লাভ করে এই দুই এর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মানব সমাজের অগ্রগতি। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে এই পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদী শ্রেণী। পুঁজিবাদী শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতবর্ষেও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনার পর থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে যে সংগ্রাম আজও অব্যাহত।

কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামের সূচনা কবে এবং কিভাবে হয়েছিল এই প্রশ্নটির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। সেই প্রশ্ন আলোচনা করতে গেলে প্রথম আলোচনা করতে হয় ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা কবে থেকে হয়েছিল। ইউরোপে যখন শিল্প-বিপ্লব ঘটে এবং যে শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে

পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং তা ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল ভারতে সেইসময় শিল্প-বিপ্লব ঘটবার কোন সুযোগ ঘটেনি এবং ফলে ভারতীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থারও পত্তন সেই সময় ঘটেনি।

ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ডেই শিল্প-বিপ্লব প্রথম ঘটে। তার কারণ মূলতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডেই প্রথম সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণী বিজয়ী হয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পড়ে এবং ধণতন্ত্র প্রসারের পথ বাধামুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনতন্ত্র প্রসারের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তাও বৃহত্তম ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী প্রধানতঃ ভারত এবং অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে শোষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের ধনসম্পদ জলস্রোতের মত ইংলণ্ডকে প্লাবিত করেছিল।

আর ঠিক এই সময়েই একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটালো। ১৭৬৪ সালে আবিষ্কৃত হল হারগ্রীভসের স্পিনিংজেনী, ১৭৬৫ সালে ওয়াট্‌সের স্টীম এঞ্জিন, ১৭৬৯-এ আর্করাইটের জলশক্তি চালিত চাকা, ১৭৮৫ তে কাটরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত এবং আরও বিভিন্ন রকম আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লবের কারিগরি ভিত্তি স্থাপন করল। এই আবিষ্কার এবং তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে সংগৃহীত ধনসম্পদের যোগাযোগে ইংলণ্ডে স্থাপিত হল কলকারখানা; ব্যক্তিগত কায়িক শ্রম-নির্ভর কারিগরের পরিবর্তে সৃষ্টি হল যন্ত্রচালিত কারখানা শ্রমিক। শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগই এই বিপ্লবের একমাত্র তাৎপর্য নয়—এই বিপ্লবের আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে দুটি মৌলিক সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি—একটি বুর্জোয়া শ্রেণী যারা কলকারখানা ও উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা লাভ করল এবং শ্রমিকদের শোষণ করতে শুরু করল—অপরটি সর্বহারা অর্থাৎ মজুরী-শ্রমিক যারা উৎপাদন করল অথচ উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা লাভ করল না।

এই শিল্প-বিপ্লব একশত বৎসর ধরে চলেছিল। ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তখন ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের এই অগ্রগতির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক বা সামাজিক উন্নতি ঘটল না। তাঁদের অবস্থা ক্রমাগত অসহনীয় হয়ে উঠল। ফলে দেখা দিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর ক্রমবর্ধমান

শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাসের আরেক দিক নির্দেশ করল—ধনতন্ত্রও কোন স্থায়ী সমাজব্যবস্থা নয়। ধনতন্ত্রের মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করেছে যে সর্বহারাশ্রেণী আগামী দিনে পুঁজিবাদীশ্রেণীর শক্তিকে এরাই চ্যালেঞ্জ জানাবে। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০-এর চার্টিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণী যে সংগঠিত, ব্যাপক, গণভিত্তিক এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল আগামীদিনের বার্তাবহ।

ইংলণ্ডে এই সময়ে শুধুমাত্র শিল্পের প্রসার নয় এমনকি শিল্পের সংকটও শুরু হয়েছে। এবং সেই সংকটজনিত অবস্থায় কলকারখানার শ্রমিকদের উপর পুঁজিপতিদের শোষণও তীব্রতর রূপ ধারণ করল। শ্রমিকশ্রেণীও তার জন্মমুহূর্ত থেকেই এই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ইংলণ্ডের এই শ্রমিক আন্দোলন মোটামুটি শুরু হয় ১৭৫২ সাল থেকে।[১] প্রথম যুগের শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলি ছিল মূলতঃ দক্ষ শ্রমিকদের কতকগুলি সংঘ। সেই সময় শ্রমিকদের এই সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে এমন ধরনের হিংস্র আইনকানুন ছিল যে শ্রমিকদের এই সংঘগুলিকে বে-আইনীভাবে কাজ করতে হত। ১৮২৪ সালে এই জঘন্য আইনগুলির আংশিক পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে এই শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কিছু কিছু প্রকাশ্য কাজকর্ম করতে সমর্থ হয়। আন্দোলন আরেকটু অগ্রসর হলে ১৮৩০ সালে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য জাতীয় সমিতি বা ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব লেবার গঠিত হয়। ১৮৩৩-৩৪ সালে যে 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনসলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন' গঠিত হয়, এই সংগঠন ছিল তারই অগ্রদূত। শেষোক্ত সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,০০,০০০।[২]

১৮৩৭ সালে ইংলণ্ডে 'লণ্ডন ওয়ার্কিংমেনস্ এসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে মহান চার্টিষ্ট আন্দোলন শুরু হল। চার্টিষ্ট আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের একটা গণভিত্তিক এবং সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইংলণ্ডে এই সময় শিল্পের সংকট তীব্রতর রূপ ধারণ করে। ফলে শুরু হয় গভীর অর্থনৈতিক সংকট যার বোঝা বহন করতে হয় শ্রমিকদেরই। শ্রমিকেরা তাই পার্লামেন্টের কাছে শ্রমিকদের ৬—দফা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করে গণ-দরখাস্ত পেশের কর্মসূচী গ্রহণ করল। কয়েকবার তারা এই গণ-দরখাস্ত

১। Wiliam Z. Foster, History of the Three Internationals, p 6.

২। Ibid

পেশ করল। একটি দরখাস্তে তারা ৫০,০০,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। দশ বৎসর ধরে এই আন্দোলন চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের সেই সময়কার সাংগঠনিক ও আন্দোলন সম্পর্কিত অনভিজ্ঞাতার জন্য চার্টিষ্ট-আন্দোলন পরিপূর্ণ সফল হতে পারেনি।

কিন্তু চার্টিষ্ট আন্দোলনের দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে এর প্রভাব ছিল অসামান্য। ইংলণ্ডের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনের চাপে শাসকশ্রেণী শ্রমিকদের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮৪৭ সালে নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য দিনে ১০ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রচলন করাতে চার্টিষ্টরা সমর্থ হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের জন্যও ১০-ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল।

লেনিন এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ইংলণ্ড বিশ্বকে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বপ্রথম সত্যিকারের ব্যাপক গণভিত্তিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছ সর্বহারা বৈপ্লবিক আন্দোলন উপহার দিয়েছে।'[১]

এই সময় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শ্রমিক ইউনিয়নবিরোধী বিভিন্নরূপ হিংস্র আইনকানুন চালু ছিল। ফলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, জার্মানী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে অল্পসংখ্যক শ্রমিক ইউনিয়নই অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। শ্রমিকদের সংগঠনগুলি গোপন কায়দায় কাজকর্ম চালাতে বাধ্য হয়েছিল। কেবলমাত্র সমবায় সমিতি ইত্যাদি নামে কিছু সংগঠনের প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার ছিল।

আমেরিকাতে নিগ্রোরা সেই সময়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। নিগ্রোদের বাধ্য করা হত এক বর্বর জীবনযাপনে। অথচ ঠিক একই সময়ে শ্বেতকায় শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল অধিকতর গণতান্ত্রিক অধিকার। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকায় শ্বেতকায় শ্রমিকদের কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং অনেকগুলি ধর্মঘট পরিচালিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের এই সমস্ত আন্দোলনগুলিই ছিল ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন কোন একটা বিশেষ দেশে আবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে এবং একটা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ

১। V. I. Lenin, **Selected works in two Volumes, Vol II, Part 2, Eng. Moscow 1951, p 202.**

করেছিল, ঠিক তেমনি শ্রমিক আন্দোলনও কোন একটা দেশে আবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন দেশে। শ্রমিক আন্দোলন তাই মূলতঃ আন্তর্জাতিক। শিল্প, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বিশেষ দেশের গণ্ডী অতিক্রম করেছে তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা দেশসমূহের গণ্ডী অতিক্রম করে রূপ নিয়েছে আন্তর্জাতিক।

শ্রমিকদের এই আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে গড়ে উঠে কতকগুলি শ্রমিক সংগঠন যেগুলির চরিত্র ছিল মূলতঃ আন্তর্জাতিক। চার্টিষ্ট আন্দোলনে ছিল সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক মনোভাব। সমসাময়িক 'দি একজাইলস লীগ (১৮৩৪-৩৬), ফেডারেশন অব দি জাষ্ট' (১৮৩৬-৩১)' এবং কামউনিস্ট লীগ (১৮৪৭-৫২)'এর চরিত্র ছিল নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক। সদস্যপদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও ছিল এগুলি সর্বহারার শ্রেণী সংগঠন।

শ্রমিক সংগঠনের এই ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই গঠিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে 'ইণ্টার ন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস্ এসোসিয়েশন। লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন হলে ২৮শে সেপ্টম্বর ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই সংগঠন জন্মলাভ করেছিল। কার্লমার্কস স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। এই সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল 'শ্রমিকশ্রেণীকে নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে; একটা শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও একাধিপত্যই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য নয়। এই সংগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে সমান অধিকার ও দায়িত্ব এবং শ্রেণী শাসনের অবসান।'[১] 'দুনিয়ার মজুর এক হও'—এই সংগ্রামী স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এই সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দর্শন

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে শ্রমিক আন্দোলন প্রসার লাভ করছে সেই সময় অর্থনৈতিক দাবির পাশাপাশি শ্রমিকদের বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক তত্ত্বেরও উদ্ভব হল। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হল সাম্যবাদ। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রামের

১। **William Z. Foster, History of the Three International, Book one. P. 42.**

পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্যবাদী দর্শনের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ। ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় ও তার অগ্রগতি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য নিয়ে এসেছিল অশেষ দুঃখকষ্ট। শ্রমিকরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সংগ্রামগুলিতে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শ্রেণী-চেতনা ও সাংগঠনিক বোধের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হয়েছিল।

শ্রমিকদের বিদ্রোহের প্রথমযুগ যখন শ্রমিকরা নতুন যন্ত্রগুলিকেই তাদের শোষণের মূল কারণ মনে করে যন্ত্রগুলিকেই ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিল তখন তারা ঠিক বুঝতে পারেনি শোষণের মূল কারণগুলিকে। তখন তাদের যন্ত্র-ভাঙ্গার কাজ ছিল নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনার ফলশ্রুতি। ১৮৩১ সালে ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ শিল্পাঞ্চল লিয়ঁস-এ শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে দশ দিন যাবৎ কারখানাকে তাদের পরিপূর্ণ দখলে রেখেছিল। কিন্তু তখনও তারা জানত না যে এর পরবর্তী কর্তব্য তাদের কি হবে, তখন তারা, সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি তাদের বিদ্রোহের লক্ষ্য কি? সবচেয়ে বড় কথা হল সেই সময় এমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না যে দল তাদের সংগঠিত করতে এবং বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে পারত। সেই জন্যেই যে বিদ্রোহগুলি এত সফলভাবে শুরু হয়েছিল সেইগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৮৩০-৩২ সালে ইংলণ্ডের ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন সমগ্র ইউরোপে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। রাজতন্ত্রী পার্লামেন্টের কাছে শ্রমিকরাই দাবি পেশ করেছিল গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য। কিন্তু শ্রমিকদের এই সংগ্রামের যে সাফল্য ঘটেছিল তার ফলভোগ করেছিল বুর্জোয়ারাই। শ্রমিকদের অসংগঠিত অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চেতনার অভাবই ছিল এর কারণ। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কারণবশতঃ শাসকশ্রেণী চার্টিস্ট আন্দোলনকেও দমন করতে সমর্থ হয়েছিল, যদিও চার্টিস্ট আন্দোলন তুলনামূলকভাবে অনেকটা পরিপক্ক শ্রমিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছিল। সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেলেও জনগণ বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভোগের কোন অবসান হল না।

মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বে কিছু ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী শোষণের নিন্দা করেছেন এবং ঘৃণার সঙ্গে ধনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক সংকটের উল্লেখ ১ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এর সমাধানে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণীসহযোগিতার প্রচার করেছিলেন।

Part 2.

সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উৎপত্তির এই সময় সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে দুটো পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসাবেই এগিয়ে চলেছিল। ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্টদের পক্ষে শ্রমিক আন্দোলনে শ্রেণী-সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল ইতিহাসের নিয়মকে হৃদয়ঙ্গম ও অনুধাবন করা। এই কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল।

এই কাজ সমাধা করলেন কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস্। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' মার্কস ও এঙ্গেলস্ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। ম্যানিফেস্টোতে তাঁরা বললেন, ইতিহাস মূলতঃ নির্ধারিত হয় উৎপাদনের অগ্রগতির দ্বারা। সমাজের নিম্নতম রূপ থেকে ইতিহাস যাত্রা শুরু করেছে এক উন্নততর রূপের দিকে এবং এই উন্নততর রূপের তাৎপর্য হচ্ছে সেই সমাজের উন্নততর উৎপাদিকা শক্তি। এই প্রক্রিয়ার ফলেই যে দাস-সমাজে দাস-মালিকেরা দাসদের শোষণ করত সেই দাস-সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমিদাসরা নির্যাতিত ও শোষিত হত জমির মালিকদের দ্বারা। আবার এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন ঘটে সৃষ্টি হল ধনতান্ত্রিক সমাজ, যে সমাজে পুঁজিবাদীদের উন্নতি নির্ভর করল শ্রমিকদের শোষণের উপর। অনুরূপভাবে এই ধনতান্ত্রিক সমাজ চিরস্থায়ী হবে না—সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক সমাজকে স্থানচ্যুত করবে।

এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীসমন্বিত এক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সংঘটিত হয় এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীদুটির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং এই সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠে বিপ্লবের মুহূর্তে।

শ্রেণী কি? মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণী হচ্ছে জনগণের একটা সমষ্টি এবং এই জনসমষ্টি উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক কি মালিক নয় এবং সেই উৎপাদনের উপায়ের ধরনটা কি তার উপরই নির্ভর করে সেই সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর চরিত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং এর বিরোধী শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী—এই শ্রমিকশ্রেণীর হাতে উৎপাদনের উপাদানসমূহের কোন মালিকানা নেই এবং এরা শোষিত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা।

এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীসমন্বিত সমাজে এই শ্রেণীগুলি নিরন্তর

সংগ্রামে লিপ্ত এবং এই শ্রেণী-সংগ্রামই সৃষ্টি করে ইতিহাস। শোষিত জনগণ তার মুক্তির জন্য শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে ইতিহাস। মার্কস ও এঙ্গেলস্ এখানেই শেষ করলেন না। তাঁরা এ কথাও ঘোষণা করলেন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী বিজয়লাভ করবে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে এবং এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে যে সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা থাকবে সমগ্র সমাজে থাকবে না কোন শোষণ। এই নতুন সমাজব্যবস্থাই হল সমাজতন্ত্র।

ম্যানিফেস্টোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান দেওয়া হয়েছে—'দুনিয়ার মজুর এক হও'। এই আহ্বানের অর্থ কি? ধনতান্ত্রিক শোষণ কোন একটা বিশেষ দেশের ব্যবস্থা নয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যার শোষণের ক্ষেত্রও আন্তর্জাতিক। তাই শ্রমিক আন্দোলনকেও চূড়ান্তভাবে ধনতন্ত্রের মোকাবিলা করতে হলে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকদের তা একযোগে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই করতে হবে। এখানেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের উৎস। বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এই দুনিয়া-জোড়া প্রতিরোধের পাশাপাশি নিজনিজ দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বহারাশ্রেণীই পুঁজিবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তাই তাকে নিজ দেশে স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্যও সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধার ভূমিকা পালন করতে হবে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকাই সংশ্লিষ্ট দেশের এবং সারা পৃথিবার ভাগ্য নির্ধারক। নিজ দেশকে এবং সারা জগৎকে পরিবর্তনের ও শোষণবিহীন, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর উপর অর্পিত। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিনের বিপ্লবী দর্শনের এই মূল শিক্ষার নিরিখেই বিচার্য বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ।

সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন

ট্রেড ইউনিয়ন কি? কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ শ্রমিকদের সংগঠিত করবার কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শ্রমিকদের যে শক্তি বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাকে সংহত করে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াই মূলতঃ ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্দেশ্য। মার্কস

লক্ষ্য করেছিলেন, যে বিচ্ছিন্ন শ্রমিকরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত তারা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে এবং যুক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুঁজি হচ্ছে কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তি, 'কনসেনট্রেটেড সোশাল পাওয়ার'। কিন্তু শ্রমিকের শক্তি হচ্ছে একমাত্র তার নিজস্ব শ্রম-শক্তি। কাজেই পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিকের মধ্যে যে চুক্তি হয় সেই চুক্তি কখনই ন্যায্য সর্তের ভিত্তিতে হতে পারে না। শ্রমিকরা একমাত্র যে সামাজিক শক্তির অধিকারী তা হচ্ছে তাদের সংখ্যাগত শক্তি। কিন্তু শ্রমিকদের অনৈক্যের জন্য এই সংখ্যাগত শক্তিও অকেজো হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের মধ্যে এই অনৈক্যের কারণ তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তাঁদের এই আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতাই তাঁদের অনৈক্যকে জীইয়ে রাখে। প্রথমযুগে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব হয়েছিল এই প্রতিযোগিতাকে দূর করবার অথবা অন্ততঃ কিছুটা সীমাবদ্ধ করবার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং এর মধ্য দিয়ে এমন একটা চুক্তিবদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল যাতে করে শ্রমিকরা দাসত্বের পরিস্থিতি থেকে অন্ততঃ কিছুটা উপরে উঠতে পারে।

তাই, ট্রেড ইউনিয়নগুলির আশু লক্ষ্য পুঁজির বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল যাতে করে পুঁজির আক্রমণকে কিছুটা ঠেকানো যায়। মজুরী বৃদ্ধি এবং কাজের সময় কমিয়ে আনাই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের এই সংগ্রামগুলির মূল প্রশ্ন।

এভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের অজান্তেই শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করবার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মজুরি-দাসত্বের ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর মতো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যই শ্রমিকদের সংগঠিত কেন্দ্র হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি উন্নীত হয়ে উঠছিল। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কস ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অরাজনৈতিক বা নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচনা করেননি বরং তিনি ট্রেড ইউনিয়নের উপর অসীম রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন।

১৮৬৬ সালে ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেন্স এ্যাসোসিয়েশনের জেনেভা কংগ্রেসের প্রস্তাবে শ্রমিক আন্দোলনের সমসাময়িক অবস্থার পর্যালোচনায় এই তাৎপর্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে,

'ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ যাবৎ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে একমাত্র পুঁজির বিরুদ্ধে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালনার জন্যই, ট্রেড ইউনিয়ন-

গুলি এখনও মজুরি-দাসত্বের ব্যবস্থা ও বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিকে আক্রমণ করবার তার যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। সেইজন্যই তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি থেকে দূরে থেকেছে। কিন্তু তাহলেও সম্প্রতি তারা স্পষ্টতই জেগে উঠছে এবং তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশগ্রহণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কাজকর্মের উন্নততর ধ্যান-ধারণা……[১] এর মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।' কিন্তু মার্কস শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলির অতীত এবং বর্তমান দায়িত্ব সম্পর্কেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ঐ প্রস্তাবেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে বলা হচ্ছে :

'তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এখন অবশ্যই শিখতে হবে যে কিভাবে পরিপূর্ণ মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে শ্রমিকদের সংগঠিত করবার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সচেতনভাবে কাজ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রতিটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তাদের সমর্থন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বুঝতে হবে যে তারাই হচ্ছে সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থের রক্ষক ; এই উপলব্ধি থেকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে সমস্ত বিচ্ছিন্ন শ্রমিককেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সংগঠিত করা যায়। যে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরি পায় সেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের কথা বলা যেতে পারে। একটা বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই শ্রমিকরা প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। ট্রেড ইউনিয়নগুলির দায়িত্ব সমস্ত জগৎকে বোঝানো যে তাদের সংগ্রাম কোনো সংকীর্ণ আত্মস্বার্থে নয়, বরং বিপরীতভাবে সমগ্র নিষ্পেষিত জনগণের মুক্তিই তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য।'[২]

এই প্রসঙ্গে প্রথম আন্তর্জাতিক নিরন্তর বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে শ্রমিক-শ্রেণীর অর্থনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে

১। Resolution of ihe Geneva Congress of First International. Woring Men's Association (1866). Quoted by A Lozovosky in Marx and the Trade Unions, p. 14.

২। Ibid. p. 15.

জড়িত। সেকালে তথাকথিত পণ্ডিতরা সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলমাত্র অর্থনীতির মধ্যে আবদ্ধ রেখে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কার্ল মার্কস এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কটিকে অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করলেন। মার্কস লিখলেন,

'স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। এর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আগে থাকতেই একটা সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই সংগঠনটা কিছুটা উন্নতস্তরেরও হবে এবং এটা গড়ে উঠবে অর্থ নৈতিক শক্তিগুলির মধ্য থেকেই।

'কিন্তু অপরপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং "বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি করে" শাসকশ্রেণীর মাথা নোয়াতে চেষ্টা করে তার প্রতিটিই হচ্ছে "রাজনৈতিক আন্দোলন"। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একটা কারখানা বা একটা শিল্পে একজন পুঁজিপতির কাছ থেকে ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে যদি জোর করে কাজের সময় কমিয়ে আনা যায় তবে সেটা হবে একটা নিছক অর্থ নৈতিক আন্দোলন। অপরপক্ষে যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জোর করে আট ঘণ্টা কাজের বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন করা যায় তা হবে রাজনৈতিক আন্দোলন।

'এবং এভাবেই সর্বত্র শ্রমিকদের খণ্ড খণ্ড অর্থ নৈতিক আন্দোলনগুলি থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনটা হচ্ছে সাধারণ পদ্ধতিতে আপন লক্ষ্য সাধনের জন্য একটা শ্রেণীর আন্দোলন। আবার সাধারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের এই পদ্ধতিটার মধ্যে একটা জোর করে আদায় করে নেবার মত শক্তিও আছে।......'[১]

ইতিহাসের এমনই নিয়ম যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং তাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন শুধু যে প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠে তা নয়, এটা ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্যও বটে। লেনিনের কথায়, 'ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন তাই নয়, শিল্প-শ্রমিকদের সংগঠন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐতিহাসিকভাবেও অনিবার্য।'[২]

১। **Marx's letter to Bolte Marx-Engles Selected work, Vol II, pp. 423—424**

২। **Lenin The Trade Unions, The present situation and Trotsky's mitakes on Trade unions—A collection of articles and speeches P, 375**

ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি কিভাবে গড়ে উঠে, শ্রমিকরা কিভাবে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হয় এবং শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলি কিভাবে দেশব্যাপী শ্রেণী-সংগ্রামে উন্নীত হয় কার্ল মার্কস তা আরো প্রাঞ্জলভাবে অন্যত্র ব্যাখ্যা করছেন। মার্কস বলছেন, 'বিকাশের বিভিন্নস্তর অতিক্রম করে সর্বহারাকে এগিয়ে যেতে হয়' জন্মলগ্ন থেকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথমে শ্রমিকরা এককভাবে এই সংগ্রাম চালায়, তারপর একটা কারখানার শ্রমিকরা একযোগে এই সংগ্রাম পরিচালনা করে। তারপর সংগ্রাম পরিচালিত হয় স্থানীয়ভাবে কোন একটা শিল্পের শ্রমিকদেয় দ্বারা, প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে এমন বিশেষ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেই এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়। শ্রমিকরা বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিকে আক্রমণ করেনি, আক্রমণ চালিয়েছিল উৎপাদনের যন্ত্রের বিরুদ্ধে; যে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতিগুলি ছিল তাদের শ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী সেগুলিকে তারা বিনষ্ট করেছিল, যন্ত্রগুলোকে তারা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছিল, কারখানাগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা তাবা মধ্যযুগের কারিগরদের বিলুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিল।

এই স্তরে শ্রমিকরা তখনও অসংগঠিত জনতা হিসাবেই রয়েছে। সারা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থেকে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে তারা তখনও বিভক্ত···

'কিন্তু শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাদের সংখ্যাগত বৃদ্ধিই হয় না, এরা আরও ব্যাপকতরভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, এদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এরা এই শক্তিকে আরও বেশী করে অনুভব করে।··· ··একজন একক শ্রমিকের সঙ্গে একজন একক বুর্জোয়ার সংগ্রাম আরো বেশি বেশি করে দুটি শ্রেণীর সংগ্রামের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। তারপরই শ্রমিকরা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে জোটবাঁধা শুরু করে। মজুরির হারকে বৃদ্ধি করার জন্য তারা একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। প্রায়শঃই যে বিদ্রোহগুলি ফেটে পড়ছে সেগুলির জন্য পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থাদি করার লক্ষ্য নিয়ে তারা স্থায়ী সমিতি গঠন করে। এই সংগ্রাম ইতস্ততঃ দাঙ্গাহাঙ্গামার রূপে ফেটে পড়ে।

'কখনও কখনও শ্রমিকরা বিজয়ী হয়, কিন্তু তা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে। তাৎক্ষণিক ফলাফল নয়, শ্রমিকদের ক্রমসম্প্রসারণশীল জোটবদ্ধতাই হচ্ছে তাঁদের সংগ্রামের প্রকৃত ফলশ্রুতি। আধুনিক শিল্পের ফলে যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয় তার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এই জোটবদ্ধতা আরও সহায়তা

পায় এবং এক অঞ্চলের শ্রমিকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের শ্রমিকের সংযোগ ঘটায়।। একই চরিত্রের অসংখ্য স্থানীয় সংগ্রামগুলিকে দেশব্যাপী দুটো শ্রেণীর সংগ্রাম হিসাবে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঠিক এই সংযোগেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রতিটি শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম'।[১]

ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে এই শ্রেণী-সংগ্রাম কলে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস্ উভয়েই ধর্মঘটকে শ্রমিকশ্রেণীর তাৎক্ষণিক ও অন্তিম লক্ষ্য সাধনের একটা শক্তিশালী সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এঙ্গেলস্ ধর্মঘটকে বিবেচনা করতেন 'স্কুল অব ওয়ার হিসাবে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে তিনি ধর্মঘটকে মনে করতেন একটা অত্যাবশ্যক এবং বাধ্যতামূলক অস্ত্র। ধর্মঘটের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে এঙ্গেলস্ বলছেন :

'যুদ্ধে একপক্ষের ক্ষতি অপরপক্ষের লাভস্বরূপ। শ্রমিকশ্রেণী মালিকদের সঙ্গে রয়েছে একটা যুদ্ধাবস্থার মধ্যে,.........

'যে অবিশ্বাস্য হারে ধর্মঘটগুলি সংঘটিত হচ্ছে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে কি ব্যাপকভাবে ইংলণ্ডে সামাজিক যুদ্ধ ফেটে পড়ছে।'

এই ধর্মঘটগুলি প্রথমে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের রূপে শুরু হয়ে— অনেক সময়ে অত্যন্ত জোরদার লড়াই-এ পরিণত হয়। এটা সত্য যে এই সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে কিছু নির্ধারিত হয় না কিন্তু এগুলি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার চূড়ান্ত সংগ্রাম আসন্ন। এগুলি হচ্ছে শ্রমিকদের "যুদ্ধ শেখার স্কুল" এবং এর মধ্য দিয়েই তাঁরা অনিবার্য সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্মঘটগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পের বিভিন্ন শাখাগুলি ঘোষণা করে যে তারাও শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়েছে'।[২] তারপর শ্রমিকদের ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়া এবং ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার কথা আলোচনা করতে যেয়ে লেনিন আরও মন্তব্য করলেন, 'লড়াই শেখবার ক্ষেত্র হিসাবে এই ইউনিয়নগুলির ভূমিকা অপূর্ব'।[৩]

এঙ্গেলস্ ধর্মঘটকে এভাবে সামাজিক যুদ্ধের একটা ধরন হিসাবেই গুরুত্ব দিয়েছেন। লড়াই শেখবার জন্য ধর্মঘটকে তিনি অনিবার্য মনে করতেন। মার্কসও এইভাবে ধর্মঘট সংগ্রামের প্রতি এবং শ্রমিকদের সংহতিমূলক কার্যকলাপের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১। **Marx, Communist Manifesto, Selected works vol. I. P.14.**
২। **Engles, Condition of the Working class in England, p.261**
৩। **Ibid.**

পরবর্তীকালে লেনিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী রুশিয়া এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশে সংঘটিত ধর্মঘটগুলির শিক্ষাকে অনুধাবন করে তাঁর 'ধর্মঘট প্রসঙ্গে' নিবন্ধে ধর্মঘটগুলির তাৎপর্য অতি সুচারুভাবে তুলে ধরেন। লেনিন লিখেছেন:

'শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধর্মঘটগুলির অথবা কাজ বন্ধের তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ধর্মঘটগুলিকে একটা পুর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখা দরকার। আমরা দেখেছি, মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে একটি চুক্তিব মধ্য দিয়েই মজুরি নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় একজন শ্রমিক যখন নিজেকে এককভাবে অত্যন্ত অসহায় মনে করে তখন শ্রমিকদের পক্ষে যুক্তভাবে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মালিক যাতে মজুবি হ্রাস করতে না পারে অথবা যাতে মজুরি বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হন। এবং এটা ঘটনা যে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই এবং সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকরা নিজেদের অসহায় মনে করে যখন তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধভাবেই তারা মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে—হয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে অথবা ধর্মঘটের হুমকী প্রদর্শন করে। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় যখন অধিক সংখ্যায় বড় বড কারখানা চালু হয় এবং বড় মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছোট মালিকরা দ্রুত কোনঠাসা হয়ে পড়ে, তখন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত জরুরী আকার ধারণ করে, কারণ এই অবস্থায় বেকারী বৃদ্ধি পায়, পুঁজিপতিদের মধ্যে সস্তায় উৎপাদনের (এবং সস্তায় উৎপাদনের জন্য তারা শ্রমিকদের মজুরি যথাসম্ভব কমিয়ে দেয়) প্রতিযোগিতা তীব্র হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ওঠানামা শুরু হয় ও সংকট তীব্র হয়। যখন শিল্পের প্রসার হয় তখন মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি পায়, এবং তখন তারা সেই মুনাফার কোন অংশ শ্রমিকদের দেবার কথা চিন্তা করে না, কিন্তু যখন সংকট সৃষ্টি হয় তখন মালিকেরা ক্ষতির বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়।…

'এভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের চরিত্র থেকেই যে ধর্মঘটগুলির উদ্ভব হয় সেই ধর্মঘটগুলিই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সূচনা করে। একজন নিঃস্ব একক শ্রমিকের পক্ষে ধনবান পুঁজিপতিদের মুখোমুখি হওয়ার অর্থই হচ্ছে শ্রমিকদের চূড়ান্ত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া। পুঁজিপতিদের কাছে কোন সম্পদেরই কোন মূল্য থাকে না যদি তাদের উৎ-

পাদনের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রীর উপর শ্রমিকরা তাদের শ্রম প্রয়োগ করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি না করে। পুঁজিপতিদের কাছে একজন একক শ্রমিক নিতান্ত ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই ক্রীতদাসের কাজই হবে নিরাবচ্ছিন্নভাবে অপরের মুনাফা বৃদ্ধি করে যাওয়া এবং তার বিনিময়ে সে পাবে মাত্র এক টুকরো রুটি এবং সারা জীবন ধরে তাকে থাকতে হবে অনুগত এবং ভাড়াটে ভৃত্য হিসেবে। কিন্তু যখন শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের দাবি পেশ করবে এবং পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না একমাত্র তখনই তারা আর ক্রীতদাস থাকবে না—তারা মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে পারবে এবং দাবি করতে পারবে যে তাদের শ্রমের ফল দিয়ে একদল পরগাছার ধনবৃদ্ধি করা চলবে না, যারা শ্রম করছে তাদেরও মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে দিতে হবে। ক্রীতদাসরা তখন নিজেরা প্রভু হওয়ার দাবি করতে পারবে এবং আরও দাবি করবে যে জমিদার এবং পুঁজিপতিদের মর্জি অনুযায়ী তাদের জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হবে না, তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ীই জীবনধারণ করবে। তাই ধর্মঘট সবসময়েই পুঁজিপতিদের মনে ভীতির সঞ্চার করে কারণ এর মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করে। শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে একজন জার্মান শ্রমিক গান বেঁধেছেন 'তোমরা বলিষ্ঠ বাহু যখন চাইবে, কারখানার চাকা বন্ধ হবে। এবং বাস্তবেও তাই। কলকারখানা, ভূস্বামীদের জমিজমা, যন্ত্রপতি, রেলওয়ে ইত্যাদি সমস্ত কিছু একটা দানবীর যন্ত্রের চাকাস্বরূপ এবং এই দানবীয় যন্ত্র বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করছে এবং তা যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই যন্ত্রটিতে গতিবেগ সঞ্চার করে শ্রমিক—যে শ্রমিক জমিতে লাঙল দেয়, খনি থেকে সম্পদ উদ্ধার করে, কারখানাব বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে, ঘরবাড়ি, রেলওয়ার্কশপ নির্মাণ করে। যখন শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দেয় তখন ঐ সমগ্র যন্ত্রটিও স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকটা ধর্মঘটই পুঁজিপতিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত ক্ষমতাবান তারা নয়—প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শ্রমিকরাই এবং ঐ শ্রমিকরা ক্রমাগত তাদের অধিকারকে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে চলেছে। প্রত্যেকটা ধর্মঘটই শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের অবস্থা হতাশাজনক নয় এবং তারা একক নন। ......ধর্মঘট কি অপূর্ব নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে যখন শ্রমিকরা দেখে যে তাদের সহকর্মীরা ক্রীতদাসের জীবন স্বীকার করে নিচ্ছে না এবং অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও তারা পুঁজিপতিশ্রেণীর সমকক্ষ হিসেবেই দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। প্রত্যেকটা ধর্মঘটই সমাজতন্ত্রের প্রশ্নটিকে এবং পুঁজির শোষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির

প্রশ্নটিকে শ্রমিকদের মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে কোন বড় কারখানায় বা কোন শিল্পের কোন শাখায় অথবা কোন শহরের ধর্মঘট সংঘটিত হওয়ার পূর্বে শ্রমিকরা কদাচিৎ সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করে। কিন্তু ধর্মঘটের পরে শ্রমিকদের মধ্যে পাঠচক্র, সংগঠন ইত্যাদি গঠিত হতে থাকে এবং শ্রমিকরা ক্রমে অধিক সংখ্যায় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে দাঁড়ায়।'[১]

কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত বিপ্লবী নীতিসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপন করেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা তিনি ব্যাখ্যা করেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণ করেন এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের উপর রাজনৈতিক সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দেন। মার্কস ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের সুযোগ ও পরিধি ব্যাখ্যা করে বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের নীতির উপর ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করেন। শ্রমিকশ্রেণীর চরম লক্ষ্যের সঙ্গে আশু দাবিদাওয়ার সংযোগসাধন করে তিনি এই কৌশলের সার্থক রূপদান করেন। মার্কস দেখিয়েছিলেন, যে ট্রেড ইউনিয়ন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না, তা পরিণামে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। সেই জন্যই মার্কস ও লেনিন যখন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে 'স্কুল অফ কমিউনিজম' সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন তখন তাঁরা ঢালাওভাবে সর্বদেশের সর্বকালের ট্রেড ইউনিয়নকেই এ আখ্যা প্রদান করেননি। তারা কেবলমাত্র সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেই 'স্কুল অফ কমিউনিজম' বলেছেন যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজিপতি এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

মার্কস ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু পরবর্তীকালে লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের কি ভূমিকা হবে তা বিশ্লেষণ করছেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করবে তেমনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা হবে সমাজতন্ত্র গঠনের সক্রিয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ। জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনায় অংশগ্রহণ, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, শক ব্রিগেড গঠন, লেবার ডিসিপ্লিন, জনগণের, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন নির্ধারিত ট্রেড ইউনিয়নের এই সঠিক ভূমিকা

১। Lenin, On Strikes on Trade unions, pp 60-63.

এবং তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞা 'স্কুল অফ কমিউনিজম'-এ যে মূল ধারণাগুলি সন্নিবিষ্ট রয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে চারটি মৌল সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করে বলা যায় '(১) ট্রেড ইউনিয়নগুলি হবে এমন সংগঠন যা সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করবে, (২) ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় রাজনৈতিক-ভাবে শিক্ষিত করবে, (৩) ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমগ্র শ্রেণীর যোগাযোগ সাধন করবে, (৪) সর্বহারার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে'।[১]

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকাশ মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিন নির্ধারিত বিপ্লবী নীতি ও সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। ভারতের শ্রমিক-শ্রেণী তার ইউনিয়নগুলির মধ্য দিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের শিক্ষাকে যতখানি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামও ততখানিই অগ্রগতি লাভ করবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর যে উদ্ভব শুরু হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আজ যে শ্রেণী একটা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে তার ইতিবৃত্ত মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের এই চিরায়ত শিক্ষার আলোকেই বিবেচ্য।

১। A. Lozovsky, Marx and the Trade Unions, Radical Book club. P. 163

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে প্রাচীন অর্থনীতির ধ্বংসসাধন

ভারতে প্রাচীন অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার রূপ

ভারতবর্ষের জনগণের ইতিহাস মসৃণ পথে এগোয়নি। কঠোর ও কঠিন সেই ইতিহাস। ভারতের জনগণ দুঃখ, দুর্দশা, বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে আজকের ভারতবর্ষ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সমুপস্থিত। ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় তা কয়েকটি রাজ-রাজড়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা ভারতীয় জনগণের ইতিহাস নয়। 'ভারতের ইতিহাস ইংরেজ এবং ফরাসীদের যুদ্ধের ইতিহাস নয়—এ ইতিহাস হচ্ছে ভারতের জনগণের ইতিহাস—তাঁদের ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবনের ইতিহাস, তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ইতিহাস।'[১]

এক শতাব্দী পূর্বে ভারতের অত্যন্ত জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সমূহ যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছে তা অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা নিঃসন্দেহ অতি দুরূহ দায়িত্ব। ধনতন্ত্রের এই বিকাশের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ভারতের আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী যা কালক্রমে আজ এক পরিণত রাজনৈতিক শক্তির রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু এই সমগ্র বিষয়টিই এমন জটিল এবং বিভিন্নমুখীন সমস্যা এই বিষয়টির সঙ্গে বিজড়িত যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়ে এর বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু কিছু তথ্য এই প্রক্রিয়ায় মূল ধারাটিকে অনুধাবন করতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারে। এই বিষয়েও তৎকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি সম্পর্কিত মার্কসের বিশ্লেষণ পথপ্রদর্শক হিসেবেই বিবেচ্য। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনর্নবীকরণের সময়ে কার্ল মার্কস নিউইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায় ভারত সম্পর্কে যে নিবন্ধগুলি প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর সুবিখ্যাত

১। R. Dutt, The Economic History of British India, London. 1950, p. 97,

গ্রন্থ 'ক্যাপিট্যালে'র বিভিন্ন অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন তার মধ্য থেকে তৎকালীন ভারত সম্পর্কে মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুসরণ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হল সেই সময়কার ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ মার্কস তাঁর 'ক্যাপিট্যালে' অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ভারত সম্পর্কে মার্কস এই বিশ্লেষণ যখন করেছেন তখন ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে, ধনতন্ত্র প্রসারিত হয়েছে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে তা বিস্তারলাভ করেছে। ব্রিটিশরা ভারত লুণ্ঠনে এসে ভারতের প্রাচীন শিল্প ও কৃষিব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করেছিল এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই রেল এবং অন্যান্য কিছু কিছু আনুষঙ্গিক কল-কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। তার ফলে ভারতের প্রাচীন অর্থনীতির যুগের অবসান ঘটে। ভারতের সেই প্রাচীন অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার রূপ কি ছিল? মার্কস তাঁর 'ক্যাপিট্যালে' বলেছেন,[১]

'সেই ছোট ছোট এবং অত্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজগুলোর কিছু কিছু এখনও বহাল রয়েছে। এই সমাজগুলি জমির সাধারণ মালিকানা এবং কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে শ্রমের বিভাজনও অপরিবর্তনীয়। যখন কোন নতুন সমাজ শুরু হয় তখন তা এই প্রতিষ্ঠিত নক্সা ও পরিকল্পনা-মাফিকই চলে। এই সমাজগুলির আওতায় থাকে একশত থেকে কয়েক হাজার একর জমি। প্রতিটি সমাজেরই রূপ সুসংবদ্ধ ও পরিপূর্ণ এবং প্রতিটি সমাজই সেই সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই উৎপাদন করে। উৎপাদিত সামগ্রীর প্রধান অংশ সেই সমাজকর্তৃকই প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত সামগ্রী পণ্যের রূপ গ্রহণ করে না। কাজেই সমগ্র ভারতীয় সমাজে পণ্যের বিনিময় মারফৎ যে শ্রমের বিভাজন চালু হয়েছে এই সমাজগুলির উৎপাদন সেই শ্রমবিভাজনে নিরপেক্ষ ছিল। একমাত্র উৎপাদিত সামগ্রীর অতিরিক্ত অংশই পণ্যে পরিণত হত এবং তারও একাংশ তখনই পণ্য হত যখন তা রাষ্ট্রের হাতে পৌঁছাত। স্মরণাতীতকাল থেকেই উৎপাদিত সামগ্রীর একাংশ রাষ্ট্রের হাতে কর হিসেবে জমা হত। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই সমাজগুলির গঠন-প্রকৃতির রকমফের ছিল। সরলতম গঠন-প্রকৃতি যেখানে ছিল সেখানে জমি চাষ হত যৌথভাবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভাগ

১। Karl Marx, Capital, Voll, pp, 357-58.

করে দেওয়া হত। সেই সঙ্গে প্রতিটি পরিবারেই সহায়ক শিল্প হিসেবে সুতা ও বস্ত্র বয়ন করা হত। জনগণ যখন এভাবে এক ও অভিন্ন কাজে ব্যাপৃত থাকত তখন তারই পাশাপাশি আমরা দেখি 'প্রধান নাগরিককে' যে একাধারে বিচারক নগরপাল এবং রাজস্ব আদায়কারী। এরই সঙ্গে রয়েছে হিসাব রক্ষক, যে সমস্ত চাষবাস ও তদ্‌সম্পর্কিত সমস্ত হিসাব-কিতাব ও কাগজপত্র রাখে। আরেকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাজ অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া, আগন্তুক ভ্রমণকারীদের রক্ষা করা এবং তাঁদের পরবর্তী গ্রামে পৌছে দেওয়া। সীমান্তরক্ষীর কাজ হচ্ছে প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে নিজ সমাজের সীমান্ত রক্ষা করা। আরেকজন পরিদর্শক সাধারণ পুষ্করিণীগুলি থেকে সেচের জল সরবরাহ করে। ব্রাহ্মণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করে। স্কুলশিক্ষক মাটিতে বসে শিশুদের লেখাপড়া শেখায়। জ্যোতিষী বীজবপন ও ফসল তোলার এবং সর্বপ্রকার কৃষিকার্যের শুভ ও অশুভ দিনগুলি গণনা করে। লোহার এবং কাঠের মিস্ত্রীর কৃষিকার্যের সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরী এবং মেরামত করে। কুমোর গ্রামের সমস্ত মৃৎপাত্র তৈরী করে। আছে নাপিত ও ধোপা। ধোপা কাপড় ধোয়। এ ছাড়া রয়েছে রৌপ্যকার এবং কোথাও কোথাও একজন কবি। কবিরা কোন কোন সমাজে রৌপ্যকারের কাজ করে, কোথাও স্কুল শিক্ষকের কাজ করে। · ··· এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার সারল্য একই আকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনর্জন্ম নেয় এবং কোন আকস্মিক কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ঐ স্থানে এবং একই নামে তা পুনরায় জন্মলাভ করে—এবং উৎপাদন ব্যবস্থার এই সারল্যই হচ্ছে এশীয় সমাজ ব্যবস্থাগুলির অপরিবর্তনীয়তার গোপন চাবি-কাঠি। এই সমাজ ব্যবস্থাগুলির অপরিবর্তনীয়তার একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য হচ্ছে এশীয় রাষ্ট্রগুলির ক্রমাগত বিলোপ এবং পুনঃসংস্থাপন এবং তৎসহ রাজবংশগুলির অবিরাম পরিবর্তন। রাজনৈতিক আকাশের কোন ঝড়ই এই সমাজগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্পর্শ করতে পারেনি।'

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে নতুন সামন্তপ্রথা

কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন ভারতের এই প্রাচীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে ইংরেজ শক্তির জয়লাভের পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যে যে অঞ্চলগুলি দখল করতে লাগল সেই সেই অঞ্চলের পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রমের সামাজিক বিভাজনকেও দলে-মুচড়ে দিয়ে গেল। তৎসহ সেই সেই

দখলীকৃত অঞ্চলের উদ্বৃত্ত সামগ্রীও বিদেশী দখলদারদের হাতে গিয়ে পড়ল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ইংলণ্ডে চালান দেওয়ার কাজ শুরু করল। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসার উপর প্রচণ্ড হারে কর বসিয়ে এবং তার পাশাপাশি ঋণদানকারী মহাজনের ব্যবসা চালিয়ে কোম্পানী প্রভূত অর্থ ভারতের জনগণের কাছ থেকে শোষণ করল। কার্ল মার্কস সরাসরি লুণ্ঠনের এই প্রক্রিয়াকে উল্লেখ করে লিখলেন,

'গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে ভারত থেকে ইংলণ্ডে যে ধনসম্পদ চালান করা হয়েছে তার অতি ক্ষুদ্রাংশই নামমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফৎ করা হযেছে। এই ধনসম্পদের অধিকাংশই ভারতকে সরাসরি শোষণ করে এবং সেখানকার ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে ইংলণ্ডে চালান করা হয়েছে।'[১]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল ভারতের এই ধনরত্ন ইংলণ্ডে চালান দেওয়ার বাহন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ঐ কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টর প্রদত্ত একটি হিসাবে জানা যায় যে, ১৭৫৭-১৮১২ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে ইংলণ্ডের আয়ের পরিমাণ ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রদত্ত এই হিসাব খুবই কম করে দেখানো হয়েছে। শোষণের পরিমাণ বাস্তবে আরো অনেক বেশী।[২]

চক্রান্তমূলক সামরিক বিজয় এবং বিজিত অঞ্চলের ধনসম্পদ লুণ্ঠন চলল কয়েক দশক ধরে, কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য এই প্রক্রিয়া কাজ করতে পারে না। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসকরা উপলব্ধি করেছিল যে ভারতের এই শোষণ যদি একটা নিয়ম ও পদ্ধতি মাফিক করা যায় তবে তাতে একদিকে লাভের অংক বৃদ্ধি পায় অপরদিকে শোষণ পাকাপোক্ত হয়। তাই ভারতকে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের স্বার্থে কাঁচামাল রপ্তানি ও ব্রিটিশপণ্যের বিক্রয়ের একটা লেজুর হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কতকগুলি প্রশাসন পদ্ধতি চালু করল এবং ভূমি ইত্যাদির সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করল। এই পদ্ধতিগুলির মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ পুঁজিবাদীরা তাদের ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য আদিম পুঁজি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

১। Marx, The East India—its History and Results, K. Marx and F. Engels, On Colonialism, p. 5'.

২। A. I. Levkovosky, Capitalism in India—Basic Trends in its Development. p. 10.

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন বা এ্যাক্ট অব পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট চালু করল। এই আইনে পূর্বভারতের জমিদারদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা হল। ১৭৯৩ সালের এই আইন এবং পরবর্তীকালের কয়েকটি সংশ্লিষ্ট আইনের মধ্য দিয়ে জমিতে একমাত্র জমিদারদের অধিকারই স্বীকার করা হল, গ্রাম্য সমাজের সদস্য বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভূ-স্বামীদের জমিতে কোন অধিকার স্বীকার করা হল না। জমিদারী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সাধারণ মানুষ জমিতে তাঁদের পুরুষাণুক্রমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন এবং জমিদার নামে সৃষ্ট ব্রিটিশ সরকারের বেশী কর-সংগ্রাহকরা এই জমির মালিকানা লাভ করল।

এই সমস্ত জমিদাররা জমিতে একধরনের স্বত্ব লাভ করলেও এরা প্রজাদের কাছ থেকে যে খাজনা আদায় করত তার এগার ভাগের দশ ভাগই তাদের জমা দিতে হত ব্রিটিশ শাসকদের হাতে। যদি কোন জমিদার সেই টাকা দিতে অক্ষম হত তবে তার জমি অন্য কোন জমিদারের কাছে বিক্রয় করে দেওয়া হত। ফলে জমিদাররা ব্রিটিশ সরকারকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এবং উপযুক্ত পরিমাণ টাকা তাদেব দেওয়ার জন্য সাধারণ প্রজাদের উপর চালাত অমানুষিক শোষণ ও উৎপীড়ন। তাছাড়া সরকারকে জমিদারের প্রদত্ত খাজনা নির্দিষ্ট হলেও জমিদার কৃষকদের উপর নিজ ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি করতে পারত। পরবর্তী স্তরে সুদব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী, ঔপনিবেশিক আমলা—এরাও অনেকে জমিদার হয়ে বসল এবং জমিদার ও কৃষক এই দুই স্তরের মধ্যেও অনেক পরগাছা মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হল এবং এর ফলে সাধারণ কৃষকদের উপর শোষণ আরও তীব্র হয়ে উঠল। এভাবেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ আক্রমণকারীরা ভারতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সামন্ত-প্রথা জীইয়ে রাখল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে জমির খাজনা আদায়ের অস্থায়ী পদ্ধতি এবং রায়তয়ারী পদ্ধতির মাধ্যমে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করে সামন্ত শোষণকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে বহাল রেখেছিল নিজেদের লুণ্ঠনের স্বার্থে।

এই জমিদারী ও রায়তয়ারী পদ্ধতিই ছিল ভারতের কৃষকসমাজকে শোষণের জন্য একটা পরিবর্তিত সামন্ত প্রথা। ঔপনিবেশিকদের স্বার্থ এর দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল এবং অপরপক্ষে কৃষকরা এর মধ্য দিয়ে আধা-দাসত্বের পর্যায়ে নেমে এল।

দেশী শিল্পের ধ্বংসসাধন—গ্রামীন অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ

এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে মজুরি-শ্রমের উৎপত্তির বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। মজুরি-শ্রমের অস্তিত্ব বাস্তবিক নাফা সমস্ত শোষণমূলক সমাজেই উপস্থিত ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের এটাই বৈশিষ্ট্য যে এই সমাজটা পুরোপুরি মজুরি-শ্রমের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

মার্কস বলেছেন যে মজুরি-শ্রম ব্যতিরেকে উদ্‌বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না এবং উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যতিরেকে কোন পুঁজিপতিও সৃষ্টি হতে পারে না। এর অর্থ উদ্বৃত্ত মূল্য না থাকলে পুঁজিপতিও থাকে না এবং পুঁজিবাদও থাকে না। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করেও এটা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয় যে সামন্তযুগে মজুরি-শ্রম করে শেষ হল এবং ধনতান্ত্রিক যুগের মজুরি-শ্রম করে শুরু হল। ভারতে মজুরি-শ্রমের উৎপত্তির ক্ষেত্রে এই কথা সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য।

মজুরি-শ্রম ভিত্তিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল পতনোন্মুখ সামন্ত-বাদী সমাজব্যবস্থার গর্ভেই। পশ্চিম ইউরোপে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতেই ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। সামন্তযুগেব বিভিন্ন পর্যায়ে মজুরি-শ্রমকে ব্যবহার করা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের এই শেষ পর্যায়েই মজুরি-শ্রম বিক্ষিপ্ত এবং অনিয়মিতভাবে গজিয়ে ওঠা ঐ ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের পক্ষে একটা অপরিহার্য ভিত্তি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। একটা সামন্তবাদী পরিবেশের মধ্যেই স্থানীয়ভাবে এই নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল। তাই এখানে স্মর্তব্য যে ভারতেও যদি স্বাভাবিকভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগ থাকত তাহলেও তা এই ঐতিহাসিক নিয়মানুসারেই সেই বিকাশের অগ্রগতি ঘটত। কিন্তু ভারতে সাম্রাজ্যবাদী দখল সেই স্বাভাবিক নিয়মকে দারুণভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল।

মজুরি-শ্রম ব্যবহার পূর্ব শর্তই হচ্ছে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়। বৃটেনে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে এই 'প্রাথমিক সঞ্চয়' শুরু হয়েছিল এক প্রচণ্ড জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। তারপর থেকে তিন শতাব্দী যাবৎ এই প্রক্রিয়া চলেছিল প্রচণ্ড তীব্রতার সঙ্গে এবং বলা যেতে পারে সামন্তবাদী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে 'ভূমি-বিপ্লবের' পরিপূর্ণ সাফল্য ঐ দেশেই প্রথম সংগঠিত হয়েছিল।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয়েছিল তা হল পূর্বতন উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত হল এবং সাধারণ জনগণের নিঃস্বতা চরমে

পৌছোল। এই নিঃস্বরাই শেষপর্যন্ত মজুরিশ্রমিক হিসাবে পুঁজিপতিদের কারখানায় এসে ভীড় করল।

ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে আরও যা হয়েছিল তা হল উপনিবেশগুলির শোষণের মাত্রা চরম সীমায় এনে সেইগুলিকে নিঃস্ব করে দেওয়া এবং উপনিবেশের লুণ্ঠিত ধন-সামগ্রীর সাহায্যে ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।

এই ভাবেই ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সাফল্যের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ইংলণ্ডে চালান দিল। ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কল-কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ ভারতের বাজারে বিক্রয় করার প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদীরা অনুভব করল। এর সহজ অর্থ হচ্ছে ইংলণ্ড থেকে সরাসরি ভারতের বাজারে মাল প্রেরণ করা ও তা বিক্রয় করার স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের পক্ষে। ফলে ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছিল তাতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের স্বাধীন বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছিল না। এ-যাবৎকাল ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমোদন দেবার একমাত্র অধিকার ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন কারণ কোম্পানীর এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ পুঁজিপতি স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই ১৮১৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার থেকে সরকারীভাবে বঞ্চিত করা হল এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের জন্য ভারতে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের এই একচেটিয়া অধিকারের অবসান ভারতে অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এই কোম্পানী এতদিন মূলত ভারতের সিল্ক, মসলিন ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য ভারত থেকে আমদানী করে ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করত। কিন্তু ১৮১৩ সাল থেকে ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য ভারতের বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেল এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানী দ্রুত বৃদ্ধি পেল। ১৮১৪ সালে ১৬,০০,০০০ পাউণ্ড থেকে রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়ে ১৮২৮ সালে দাঁড়াল ৫৮,০০,০০০ পাউণ্ডে। অর্থাৎ ব্রিটিশের মোট রপ্তানীর এক অষ্টমাংশ। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ জাহাজগুলি

ভারতে যে বাণিজ্যদ্রব্য বহন করে এনেছিল তার পরিমাণ হবে প্রায় ১১০,০০০ টন।'

'১৮১৪ সালে বৃটেন ভারতে ২১৩,০০০ গজ সাদা এবং ৮০০,০০০ গজ রঙিন বস্ত্রাদি রপ্তানী করেছিল, ১৮২৬ সালে এই রপ্তানীর মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬ এবং ২৬ মিলিয়ন গজ।'[১]

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে রেল লাইন স্থাপন করে, বন্দরগুলির সঙ্গে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে রেল লাইনের দ্বারা যোগাযোগ সাধন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে এই ক্রমবর্দ্ধমান রপ্তানী বাণিজ্যকে সফল করে তুলতে চেয়েছিল।

ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা এটাও লক্ষ্য করেছিল যে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের এই রপ্তানী বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারত থেকে ইংলণ্ডে আমদানীকৃত সূতী এবং সিল্ক বস্ত্রাদির উপর প্রচণ্ড হারে শুল্ক ধার্য না করলে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় পণ্যের নিকট ব্রিটিশ পণ্য পিছু হঠতে বাধ্য। কারণ এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে বৃটেনের বাজারে ভারতীয় সূতীবস্ত্র ও সিল্ক ব্রিটিশ বস্ত্রাদির তুলনায় শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কম মূল্যে বিক্রয় করেও যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসা করা যায়। এবং তাই আমদানীকৃত ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে অসমান প্রতিযোগিতার কবল থেকে ব্রিটিশ পণ্যকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সূতী ও সিল্ক বস্ত্রাদির মূল্যের উপর শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ আমদানী শুল্ক ধার্য করেছিলেন। এই মারাত্মক রকমের শুল্ক ধার্য না হলে হয়ত বৃটেনের বস্ত্রকলগুলি পরিণামে বন্ধ হয়ে যেত।[২]

১। A. I. Levkovosky, Capitalism in India, p, 19.

২। 'It was stated in evidence (in 1813) that the cotton and silk goods of India up to the period could be sold for a profit in the British market at a price from 50% to 60% lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70% and 80% on their value, or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decress existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion, even by the power of steam. They were created by the sacrifice of the Indian manufacture,' H. H. Wilson, History of British India, Vol. 1, p, 385.

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সূতী, সিল্ক ও পশম বস্ত্রাদি প্রায় বিনা শুল্কেই অথবা নামমাত্র শুল্কে ব্যাপক হারে রপ্তানী হতে শুরু করল, অপরপক্ষে ভারতীয় দ্রব্যাদির ইংলণ্ডের বাজারে প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধই করে দেওয়া হল। শুল্কের এই বিপর্যয়কারী বৈষম্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চূড়ান্ত আকারে চলল এবং ভারতীয় শিল্পের পক্ষে এর বিষময় ফলাফল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শুধু নয় বিংশ শতাব্দীতেও যথেষ্ট সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এইভাবেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়ে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পকে সজীব করে তুলল ব্রিটিশ সরকার।

তাই লক্ষ্য করা যাবে যে শুধুমাত্র যন্ত্রশিল্পের কারিগরী শ্রেষ্ঠত্বের গুণেই নয় সরকারী সহায়তায় ভারতে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের জোরে এবং অপর পক্ষে ভারতীয় পণ্যের ইংলণ্ডের বাজারে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেই ব্রিটিশরা ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ সাধন করেছিল এবং ব্রিটিশ যন্ত্রশিল্পকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছিল।

কেবলমাত্র বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের ধাতু ও অন্যান্য শিল্পকেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একই রূপে ধ্বংস করেছিল। ১৯১১ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার যে সেন্সাস পরিচালনা করেন তার রিপোর্টেও বলা হচ্ছে যে ভারতে ধাতুশিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা দ্রুত হারে হ্রাস পাওয়ার কারণ ভারতে দেশী পিতল ও তামার বাসনপত্রের পরিবর্তে ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত এনামেল ও এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রাদির ব্যাপক হারে প্রচলন। লোহা এবং ইস্পাত শিল্পেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। ইউরোপ থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে যে লোহা ও ইস্পাত আমদানী করা হচ্ছিল তার ফলে দেশী লোহা-ঢালাই শিল্প প্রায় উঠেই যেতে বসেছিল। বিশেষ করে রেলপথের মাধ্যমে যেসব স্থানে পৌছানো যেত সেইসব স্থানেই ভারতীয় শিল্পের এই সর্বনাশ বেশী ঘটেছিল। সুদূর অঞ্চলে যেখানে ব্রিটিশপণ্য পৌছাতে পারেনি সেখানে দেশী শিল্প তখনও চালু ছিল।[১]

১। এই সম্পর্কে ডি এইচ. বুকাননের সমীক্ষা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন,

'In India steel was used for weapons, for decorative purposes and for tools, and remarkably high grade articles

ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পের বিকাশের জন্য ভারতের কাঁচামাল ছিল অপরিহার্য। ইংলণ্ড যেমন ভারতের বাজারে সেদেশের যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী এদেশে প্রেরণ করত তেমনি ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পের পুষ্টির জন্য ভারত থেকে আমদানী করত কাঁচামাল। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ভারতের কাজ হয়ে দাঁড়াল বৃটেনের যন্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য কাঁচামালের সরবরাহ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের ঐ যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত পণ্যাদি ভারতের বাজারে বিক্রয় করা। ভারতের প্রাচীন অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে শিল্প ও কৃষির যে সমন্বয় ছিল তাকে ধ্বংস করে ব্রিটিশ শাসন এভাবেই ভারতকে কেবলমাত্র কাঁচামাল সরবরাহ ও বৃটেনের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের একটা মৃগয়াক্ষেত্র হিসাবেই তৈরী করে রাখল। স্বাভাবিক গতিতে ভারতের অর্থনীতির বিকাশকে বিদেশী শাসকরা এভাবেই স্তব্ধ করে দিল।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলির কারিগররা, হস্তশিল্পীরা এবং অন্যান্য ছোটখাট শিল্পের কারিগররা তাঁদের আবহমানকালের পেশা থেকে নির্মমভাবে বিচ্যুত হল এবং আপন পেশা থেকে স্থানচ্যুত এই শিল্প ও কারিগররা জীবিকার দায়ে গ্রামে গিয়ে ভিড় করল।

---

were produced. The old weapons are second to none, and it is said that the famous damascus blades were forged from steel imported from Hyderabad in India. The famous iron column, called the Kutub pillar of Delhi, weighs over six tons and carried an epitaph composed about 415 A. D. No one yet understands how so large a forging could have been produced at that time. Remains of old smelting furnaces found throughout India are essentially like those in Europe prior to modern times……

'The Agarias or iron smelting caste, were widely dispersed and the name lohara is applied to a great many districts producing iron ore But the introduction of cheaply made European iron has taken away nearly all their trade, and most Agarias have turned to unskilled labour. A century and a quarter ago Dr. Francis Buchanan found many of these smelters'

D. H. Buchanan, Development of Capitalist Enterprise in India, p. 274.

এর ফলশ্রুতিতে একদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ভারতের প্রাচীন শিল্পশহর ও কেন্দ্রগুলি এবং শহরের মানুষ ভারতের গ্রামগুলিতে এসে এমনভাবে ভিড় করল যে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের প্রাচীন গ্রামীন অর্থনীতি মারাত্মকভাবে আঘাত খেল। শহরের বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প ইত্যাদিগুলো উঠে যাওয়ায় সেই শিল্পসমূহের কর্মচ্যুত শিল্পী ও কারিগররা বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামে চলে এল কারণ এ ছাড়া তাদের কাছে আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। এমনকি যে কারিগররা ধাতুর বাসনপত্র বা মৃৎপাত্র তৈরি করত বা এমনকি চামড়ার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করত তারাও তাদের শিল্পচ্যুত হয়ে গ্রামীন অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত অর্থনীতিকে বলপ্রয়োগে ভেঙে দিয়ে ভারতকে অধঃপতিত করে তুলল ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের ও পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী একটা বৃহৎ উপনিবেশ হিসাবে। এটাও লক্ষণীয়, আজও পর্যন্ত ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে জনসংখ্যার যে প্রচণ্ড চাপ এবং যার বিষময় ফল ভারতের সাধারণ মানুষ আজও ভোগ করছে তার সূত্রপাত ঘটেছিল ঠিক এভাবেই এবং এর জন্য দায়ী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্যামিন কমিশনও স্বীকার করেছিল যে 'ভারতের জনগণের দারিদ্র্যের এবং অভাবের সময় তাঁদের যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয় তার অনেকখানি কারণই হচ্ছে যে কৃষিই হচ্ছে ভারতের জনগণের প্রায় একমাত্র পেশা।'

কৃষি অর্থনীতির উপর এই প্রচণ্ড চাপের এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী স্তরে ভারতের আধুনিক শিল্প বিকাশ ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল সমস্যাসমূহ বিচার করতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব

রেল লাইন ও সর্বপ্রথম শিল্প ১৮৫০-১৯০০

সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভারতের প্রাচীন অর্থনীতি ভেঙে চুরমার করে দেয় কিন্তু তার পরিবর্তে আধুনিক শিল্প ভিত্তিক কোন অর্থনীতি প্রসারে অগ্রসর হয় না। ফলে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙে তার স্থলে ইউরোপে যেভাবে আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার থেকে ভারতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ হয় ভিন্নতর। ইংরেজরা এখানে কোন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রসারে অগ্রসর হয়নি। ফলে ভারতের এই বিশেষ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সহযাত্রী হয়েছিল একটা অদ্ভুত ধরনের দৈন্য এবং তার পরিণামে ভারতীয় জনগণের জীবনে নেমে এসেছিল অসীম দুঃখ দুর্দশা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ফল ফলেছিল। প্রথমটা ছিল ধ্বংসাত্মক—অর্থাৎ প্রাচীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ভেঙে দিয়েছিল বিদেশীরা ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থেই। আবার ঐ ঔপনিবেশিক শোষণকে জোরদার ও স্থায়ী করার জন্য বিদেশীরা যে ব্যবস্থাসমূহ নিয়েছিল তার ফলে বস্তুগতভাবে ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের গতি কখনও রুদ্ধ হয় না প্রাচীনকে ভেঙে দিয়ে এক অনন্ত শূন্য সৃষ্টি করে রাখাও ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই দ্বিবিধ ফলের দ্বিতীয়টি ছিল, খুব ধীরে এবং বাধাগ্রস্থ পথে হলেও, ভারতে আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং তৎসহ পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন।

এই প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ভারতে রেলপথ স্থাপন। ইংলণ্ড থেকে আমদানীকৃত শিল্পজাতদ্রব্য ভারতের বন্দরসমূহ থেকে দেশের অভ্যন্তরে বহন করে নিয়ে যাওয়া, আবার ভারতের কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর পর্যন্ত পৌছানো এবং তারই সাথে ভারতকে সামরিক বলে পদানত রাখার উদ্দেশ্যে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ তথা বলপ্রয়োগমূলক ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক স্বার্থে ইংরেজ শাসকদের পক্ষে ভারতে রেলপথ স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

একই কারণে প্রয়োজন হয়েছিল ভারতে রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সেচব্যবস্থার বিকাশসাধন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এই নতুন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণীতে বলেন,

'আমি জানি ইংরেজ মিল মালিকগোষ্ঠী ভারতে রেলওয়ে স্থাপন করতে চায় একটাইমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হচ্ছে—তাদের উৎপাদনের জন্য কম খরচে তুলা এবং অন্যান্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা। কিন্তু লোহা এবং কয়লা পাওয়া যায় এমন কোন দেশে পরিবহণে একবার যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা চালু করলে বিভিন্ন দিকে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব নয়। রেল পরিবহণের জন্য যখন তখন এবং সবসময় প্রয়োজন হয় এমন সব যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শিল্প স্থাপন না করে একটা বিরাট দেশে রেলওয়ে ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়। এর মধ্য দিয়ে এমন সমস্ত শিল্প ও যন্ত্রপাতি চালু হতে থাকবে যেগুলি রেলওয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। ফলত রেলওয়ে ব্যবস্থা হবে ভারতে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।'[১]

ভারতে রেলওয়ে স্থাপন সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসীর বিখ্যাত প্রতিবেদনে রেলওয়ে স্থাপনে ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্যিক লক্ষ্য এবং ভারতকে একদিকে গ্রেট বৃটেনের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস এবং অপরদিকে ভারতকে গ্রেট বৃটেনের রপ্তানীকৃত শিল্পদ্রব্যের বাজার হিসাবে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট লক্ষ্য উপস্থাপিত হয়েছিল।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রেলওয়ে স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত অন্যান্য শিল্প স্থাপনের জন্যও ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

ভারতে প্রথম রেলওয়ে স্থাপনের কাজ শুরু করে দুইটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্রিটিশ সংস্থা। একটি হল গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী এবং অপরটি হল গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানী। ১৮৫৩ সালে মাত্র ২০ মাইল রেলপথ স্থাপন করা হল। ১৮৫৭ সালে হল ২৮৮ মাইল।[২] কিন্তু ১৮৫৭-৫৯ সালে মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে ব্রিটিশ

১। Marx, The Future results of British Rule in India, on colonialism. p. 87.

২। A. I. Levkovosky, Capitalism in India, p 46.

আধিপত্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অনুভব করল এবং দ্রুত সারা ভারতে রেলপথ নির্মাণ কার্য শুরু করল।

এই রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে উদ্ভব হল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী। রেলপথ নির্মাণে যে শতশত ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হলেন তাঁরাই হলেন ভারতে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রদূত।

রেলওয়ে নির্মাণ কার্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কয়লাখনি শিল্পও দ্রুত প্রসার লাভ করল। কারণ রেল চলাচলের সঙ্গে কয়লাখনির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। খনিতে উৎপাদিত কয়লার এক তৃতীয়াংশই রেল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হত। কয়লাখনির আবিষ্কার ও তা চালু হয় ১৭৭০ সালে। ১৮৪৩ সালে প্রথম 'দি বেঙ্গল কোল কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কয়লাখনিসমূহেরও প্রসার ঘটে। ১৮৯৫ সালে ঝরিয়া অঞ্চলে বৃহৎ বৃহৎ কয়লাখনির কাজ আরম্ভ হয়। এর ফলে ভারতে আরেকটি শিল্পে অর্থাৎ কয়লাখনি শিল্পেও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটল।

ভারতে রেল ও জাহাজ পরিবহণের প্রসারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস হিসাবে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামালের প্রাথমিক পরিশীলনের জন্যও কিছু কিছু ছোট ছোট শিল্পের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। চালকল, ময়দাকল, তুলা, পাট ইত্যাদির জন্য প্রেসিং ও প্যাকিং মিলের সৃষ্টি হল কাঁচামাল রপ্তানীর অত্যাবশ্যকীয় সর্ত হিসাবে। ফলে এই সমস্ত কলকারখানার মারফৎও উদ্ভব হল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী।

এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে চা বাগিচা শিল্পও গড়ে উঠল। 'আসাম টি' নামে প্রথম ব্রিটিশ চা কোম্পানী আবির্ভূত হল ১৮৩৯ সালে। প্রথমদিকে অত্যন্ত অসুবিধা ও বাধাগ্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে এই বাগিচা শিল্পকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজ বাগিচা-মালিকদের প্রভূত সাহায্য প্রদান করে। ফলে এই শিল্পটির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। এই বাগিচা শিল্পের মধ্য দিয়েও সৃষ্টি হল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী। কিন্তু চাকুরীর যে শর্তাবলীর মধ্যে এই শ্রমিকদের কাজ করতে হত তার সঙ্গে দাস শ্রমব্যবস্থার পার্থক্য ছিল খুব সামান্যই। একই সঙ্গে নীল চাষ, রাবার উৎপাদন ও কফি বাগিচা শিল্পও স্থাপিত হল। এই শিল্পসমূহে নিযুক্ত শ্রমিকদের উপর নির্মম শোষণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রভূত মুনাফা অর্জন করল।

রেলপথ নির্মাণ প্রশাসনিক কতকগুলি পদ্ধতি চালু করার ফলে যে অবস্থার

সৃষ্টি হল তাতে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানীর অভূতপূর্ব সুযোগ দেখা দিল। এই ব্রিটিশ পুঁজির অধিকাংশই ব্যয়িত হত বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক স্বার্থে। শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যয় করা হত সামান্যই।

ব্রিটিশ পুঁজির একটা বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয়েছিল পাটশিল্পে। এই পাটশিল্পে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের ছিল একচেটিয়া ব্যবসা। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম পাট আবিষ্কার করে। ইংলণ্ডের ডাণ্ডিতে ১৮৩৫ সালে প্রথম পাট থেকে সুতো তৈরী শুরু হয়। ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হল ১৮৫৪ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে রিষড়াতে। অকল্যাণ্ড সাহেব এই পাটকলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রাশিয়ার উৎপাদিত শণ বিশ্বের বাজার থেকে উধাও হলে ভারতের পাটশিল্পে এক জোয়ার এল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাট শিল্পের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটল। প্রচুর ব্রিটিশ মূলধন এই শিল্পে খাটানো হল এবং বহু চটকল স্থাপিত হল। ১৮৮৬ সালে ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্ এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই শিল্পের উৎপাদনে একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি চালু হল। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের পাটশিল্প বৃটেনের ডাণ্ডির পাটশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ১৯০৮ সালে ভারতের উৎপাদন ডাণ্ডির উৎপাদনকেও অতিক্রম করে গেল।

এরই সঙ্গে আরেকটি যে শিল্প ভারতে বিস্তারলাভ করল তা হচ্ছে বস্ত্রশিল্প। ১৮১৮ সালে কলকাতায় বাউড়িয়ায় 'ফোর্ট গ্লস্টার মিলস্' নামে একটি সুতাকল স্থাপিত হল। এটিই ভারতের প্রথম তাঁতসুতাকল। কিন্তু যেমন বাংলাদেশে পাট উৎপাদনের প্রাধান্যের জন্য পাটশিল্প মূলত বাংলাদেশেই গড়ে উঠেছিল তেমনি মহারাষ্ট্র অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের প্রাধান্যের জন্য বোম্বাই অঞ্চলেই সুতাকল শিল্পের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটল ১৮৫৪ সাল থেকে। ঐ সালে কাওয়াসজী নানাভয় দাভর বোম্বেতে প্রথম সুতাকল স্থাপন করেন এবং ১৮৭৯-৮০ সালের মধ্যে ৫৮টি সুতাকল স্থাপিত হয়। ভারতের প্রথম দুইটি সংগঠিত শিল্প—চটকল ও সুতাকল শিল্প স্থাপিত হওয়ার পর হাজার হাজার শ্রমিক ঐ শিল্পগুলিতে নিযুক্ত হলেন এবং ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগত দিক দিয়ে বৃদ্ধি লাভ করল।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। এই বিদ্রোহের পরই যেমন ব্রিটিশ শাসকরা দেশে দ্রুত রেললাইন ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তেমনি ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের বিরোধিতা এবার সাফল্যের

দিকে এগিয়ে আসে। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা অনুভব করেছিল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতের বাজারকে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের পক্ষে আরও সফলভাবে ব্যবহারের দিক দিয়ে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। অবশেষে বিদ্রোহের পর ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের নিকট হস্তান্তরিত হল।

ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের সরকারের হাতে সরাসরি অর্পিত হওয়ার পর ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটল। ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ এই সময়কার অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেছেন,

'বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতের মোট উৎপাদন ও ব্যবসা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল··· ··কিন্তু এই পরিবর্তন ভারত ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত পরস্পর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করল, এর মধ্য দিয়ে ভারত মূলত কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানী এবং বস্ত্রাদি ও অন্যান্য বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানীর দিকে এগিয়ে গেল।'[১]

কিন্তু ভারতে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইংরেজদের ব্যবসায়ে যে ভারতীয়রা মুৎসুদ্দীর কাজ করত অথবা এদের ব্যবসায়ে যে ভারতীয়রা দো-ভাষী, মুখ্য হিসাবরক্ষক, ব্যক্তিগত সচিব বা মুখ্য দালাল ইত্যাদি হিসাবে কাজ করত তাঁরা এবং ভারতীয় জমিদারদের একাংশ প্রভূত অর্থসঞ্চয়ের মাধ্যমে পরবর্তী স্তরে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে মনোনিবেশ করল। মুৎসুদ্দী বেনিয়া ও জমিদারদের এই অংশই গোড়ার দিকে ভারতীয় বুর্জোয়া হিসাবে জন্ম নিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলিতে দো-ভাষীর কাজ করত যে পার্শীরা, তারাই বোম্বাইয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হিসাবে অবতীর্ণ হল। জামশেদজী টাটার পিতা নুসসার ওয়ানজী বোম্বাইয়ে 'নুসসার ওয়ানজী এণ্ড কালিয়ানদাস কোং'-গড়লেন। জামশেদজী টাটা ১৯০৮ সালে জামশেদপুরে টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস স্থাপন করলেন।

এই যুগে ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি নীল কারখানা স্থাপন করলেন, আখের চাষ চালু করলেন এবং 'কার ট্যাগোর এণ্ড কোং' প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৩৭

১। Dr. Vera Anstey, The Economic Developmenr of India, P. 5.

সালে দ্বারকানাথ চিনাকুরি কয়লাখনি ক্রয় করলেন এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৩৬ সালে দ্বারকানাথ একটি জাহাজও ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের অনেকগুলো শিল্প উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তিনি ইংরেজদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে খেদোক্তি করলেন, 'ইংরেজরা ভারতীয়দের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে এবং সব কিছুই এখন সরকারের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।'[১]

এই নবসৃষ্ট ভারতীয় বুর্জোয়াদের শিল্পোদ্যোগগুলিতে ভারতীয়রা শ্রমিকের কাজ পেলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগত দিক দিয়ে স্ফীত হয়ে উঠল।

অপরদিকে ভারতে অঢেল কাঁচামাল এবং সস্তা মজুরিতে শ্রমিক সুলভ হওয়ায় ব্রিটেনের পুঁজিপতিরাও ভারতে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হল। তারা ভারতে বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ করে পাট, কয়লা, চা শিল্পে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করল। কলকাতা শহর হয়ে উঠল ব্রিটিশ পুঁজির ঘাঁটি। পাশাপাশি ভারতীয় পুঁজিপতিরা বোম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে মূলত তাঁদের পুঁজি বিনিয়োগ করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ভারতে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতিতে বড় বড় শহর ও বন্দর গড়ে উঠল এবং এই শহর ও বন্দরগুলির দ্রুত আধুনিকীকরণ শুরু হল। এই শহর ও বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সুসংহত শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠবার সুযোগ পেল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জাতীয় জাগরণের সূচনার যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনেও একটা পরিবর্তনের সূচনা হল। শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে যে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তাই ক্রমে ক্রমে দেশের

১। Economic Enterprise (1883-1914), Sunil kumar Sen, published Studies in the Bengal Renaissance, P. 545, National Council of Education, Bengal.

অগ্রসর অঞ্চলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও ভারতে এই সময় যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সমাজের সৃষ্টি হল সেই বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন দিকের সমালোচনায় সোচ্চার হলেন। শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায়—ভারতে মধ্যযুগীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে আধুনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করলেন। বাংলাদেশে পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকরা প্রগতিশীল চিন্তার আলোকে জনগণকে আন্দোলিত করলেন। ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিবর্তনের তাৎপর্য সাম্রাজ্যবাদী সরকার উপলব্ধি করেছিল। এই নবজাগরণকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করবার জন্য তাই তাঁরা সচেষ্ট হলেন। অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান এ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম সাহেবকে তাঁরা পেলেন এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে। হিউম সাহেব একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টায় ছিলেন। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন সাহেব তাঁকে অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এমন একটা সংগঠন গড়বার জন্য প্রবৃত্ত করলেন যার কাজ হবে ভারতীয় জনগণের এই ক্রমবর্দ্ধমান বিক্ষোভ.ক সরকারের আয়ত্তাধীন খাতে প্রবাহিত করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে রক্ষা করা। ১৮৮৫ সালে হিউম সাহেবের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল।

কিন্তু ইতিহাসের গতি ও তার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করা সাম্রাজ্যবাদী-দের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে এই কংগ্রেস সংগঠনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছিল এবং ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হয়েছিল। সেই ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু ভারতের শিল্পায়ন, শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি ও তার ক্রম-বিকাশের ক্ষেত্রে যে অধ্যায়গুলি সংশ্লিষ্ট সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিষয়-বস্তুর স্বার্থেই প্রয়োজন।

স্বদেশী আন্দোলন এমন একটি অধ্যায়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের শাসনে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য বাংলাদেশে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি। বুর্জোয়া নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের ক্ষোভকে প্রকাশ করবার জন্য বিলাতী-দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলন বয়কট আন্দোলন নামে খ্যাত। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা আবেদন [illegible] স্বদেশী

দ্রব্য ক্রয় করবার জন্য। এই স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করবার আন্দোলন হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলন।[1] বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হলেও আসলে এই আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী বন্ধ করা এবং ভারতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন হিসাবেই রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই দেখা যায় স্বদেশী আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে। আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের সুতাকল মালিকদের মনেও তীব্র অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করল এই আন্দোলন। এই আন্দোলনের শীর্ষেই ভারতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের পরিচালনায়—কলকারখানা স্থাপন, ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হল দ্রুতগতিতে। টাটার বিখ্যাত ইস্পাত কারখানা ১৯০৮ সালে স্থাপিত হল এই আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যেই। ম্যাঞ্চেস্টারের সুতাকলে প্রস্তুত বস্ত্রের বিরুদ্ধে এদেশে বয়কট আন্দোলনের সহায়তাপুষ্ট হয়ে বোম্বাই, আমেদাবাদ ও কিছুটা বাংলাদেশের সুতাকলগুলি সুসংগঠিত হল। এই স্বদেশী আন্দোলন বুর্জোয়াদের শিল্পোদ্যোগের আকাঙ্ক্ষাকে বেশ কিছুটা সফল করে দিল। কিন্তু পাশাপাশি স্ফীত হয়ে উঠেছিল ভারতের শ্রমিকশ্রেণী—ভারতেব ইতিহাসে যার গুরুত্ব যুগান্তকারী। তাই স্বদেশী আন্দোলন এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ যেমন জাতীয় বুর্জোয়াদের সুসংহত এবং শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল, তেমনি ১৯০৫—০৮ সালের জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার সুসংগঠিত করেছিল মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সমাজের আরো বিভিন্ন স্তরকে। সর্বোপরি জাতীয় সংগ্রামের এই ঢেউ সুসংহত করে গড়ে তুলল শ্রমিকশ্রেণীকে যার বৈপ্লবিক দায়িত্ব ঐতিহাসিক।

১। এই স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও শেষদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অনেকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও দেশে প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয়ের জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন। গোপালহরি দেশমুখ যিনি বোম্বাইয়ে লোকহিতবাদী নামে সুপরিচিত এই বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী ক্রয়ের ভাবধারা প্রচার করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৭৩ সালে এই বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা আরও স্পষ্টভাবে প্রচার করেছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের History of Freedom Movement Vol II দ্রষ্টব্য।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও গঠনের কালে যে মূল প্রক্রিয়াগুলি কাজ করেছিল তার সঙ্গে ইউরোপের অগ্রসর দেশসমূহের পুঁজিবাদী কলকারখানাগুলির সৃষ্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে অবশ্যই যথেষ্ট মিল ছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক পার্থক্যও ছিল যার প্রভাব ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসে ছিল সুদূর প্রসারী।

ইউরোপেও ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পীরা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগররা তাদের পেশাচ্যুত হয়েছিল কারণ বৃহৎ কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঐ সমস্ত শিল্পের অবসান ঘটে। কিন্তু ইংলণ্ডে বা অগ্রসর ইউ-রোপীয় দেশগুলিতে পেশাচ্যুত হস্তশিল্পী বা কারিগররা গ্রামে যেতে এবং গ্রাম্য অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হননি। এই কারিগররা তাদের পুরানো শিল্প থেকে বিচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ কারখানগুলিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের শহর ছেড়ে যেতে হয়নি এবং তাদের কারীগরী দক্ষতাও তারা ভুলে যায়নি। শহরে থেকেই এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বজায় রেখেই তারা আধুনিক শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। ফলে শ্রমিক হিসাবে যেমন তাদের চরিত্রে শহর জীবনের আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তাদের শিল্প-দক্ষতা বজায় রেখেই পুঁজিবাদী কারখানায় তারা প্রবেশ করেছিল তেমনি কারখানায় প্রবেশ করবার পর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তালে তাল রেখে তারা আধুনিক শ্রমিক হিসাবে দ্রুত সংগঠিত হয়েছিল।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতে আবহমানকালের হস্তশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প ইত্যাদিকে বিনষ্ট করা হয়েছিল ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। কিন্তু এর পরিবর্তে ইউরোপের ন্যায় আধুনিক শিল্প গড়ে না তোলার দরুন ভারতের বৃত্তিচ্যুত শিল্পী ও কারিগররা গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভর করে ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষেতমজুর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর যখন ভারতে রেল-লাইন স্থাপিত হল এবং ধীরে ধীরে কয়েকটি অঞ্চলে কিছু কিছু শিল্প স্থাপিত হল তখন কৃষির উপর নির্ভরশীল

মানুষেরাই যারা কৃষিতে নির্ভর করে অশেষ দুঃখ ও দারিদ্রের মধ্যে দিনাতিপাত করছিল তাদেরই একাংশ এই আধুনিক শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হল। প্রথমত, ভারতের প্রাচীন ক্ষুদ্রশিল্প ধ্বংস ও নতুন আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্প গড়ে ওঠার মধ্যে যে দুই তিন পুরুষের ব্যবধান ঘটেছিল তার মধ্যে অবশ্যই প্রাচীন শিল্প থেকে বিচ্যুত কারিগররা ও শিল্পীরা তাদের শিল্পদক্ষতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং পরবর্তীকালে যখন তারা কারখানায় প্রবেশ করল তখন তারা কোন প্রাথমিক দক্ষতা নিয়ে সেখানে হাজির হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, কৃষি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে যে মানুষেরা আধুনিক কারখানায় প্রবেশ করল তারা কৃষিজীবনের নানাবিধ পিছুটান ও কুসংস্কারগুলি সঙ্গে বহন করেই শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হল। ভারতের সমাজজীবনের বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সুযোগই এই মানুষেরা পায়নি এবং এই সমস্ত প্রভাব সঙ্গে বহন করেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী জন্মগ্রহণ করল। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও আন্দোলনের উপর এর মারাত্মক কুফল ছিল সুদূর-প্রসারী। এম এন, রায় এই অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন,

'তা সত্ত্বেও বিগত শতাব্দীর শেষদিকে বোম্বাই এবং বাংলার শিল্প শহর-গুলিতে বেশ কিছুসংখ্যক শ্রমিক কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল অদক্ষ, এরা গ্রাম থেকে নতুন এসেছে, গ্রামের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনে অথবা প্রচণ্ড ঋণভারাক্রান্ত একখণ্ড জমির মোহে তখনও তারা আবদ্ধ। আধুনিক ভারতের শহরে শ্রমিকরা বিধ্বস্ত ক্ষুদ্র কারিগরদের মধ্য থেকে আসেনি, এরা প্রধানত এসেছে কৃষকদের মধ্য থেকে। ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগররা তাদের বৃত্তি হারিয়ে গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আধুনিক শিল্পের আহ্বানে শহরে আসবার পূর্বে অন্তত দুই তিন পুরুষ এদের গ্রামে থাকতে হয়েছে। ভারতে শিল্পায়নের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ ছিল। ..... তাই ভারতের শ্রমিকরা শিল্পে সুশিক্ষিত হতে পারেনি, প্রলেতারীয়তা ট্র্যাডিশনের অভাব এদের ছিল।'[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুতাকল ও চটকলগুলি স্থাপিত হতে শুরু করলেও মোটামুটি একথা বলা যায় যে ১৮৮০ সালের পরই ভারতে শিল্পো-দ্যোগের অগ্রগতি শুরু হয়। কিন্তু নবোত্থিত ভারতীয় বুর্জোয়াদের যেহেতু ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সর্ববিধ বাধার সম্মুখীন হয়েই শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হতে

১। M. N. Roy, India in Transition, Bombay, 1971 p. 113

হয় তাই ভারতের শিল্পায়ন হয়েছিল অত্যন্ত ধীর ও বাধাগ্রস্ত গতিতে। তাই ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতেও যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল। গ্রাম থেকে যে নিঃশেষিত মানুষেরা শহরের শিল্প কারখানাগুলিতে কাজ করতে এলেন তাঁরা গ্রামে তাঁদের আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে তখনও পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রইলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামে একখণ্ড ঋণভারাক্রান্ত জমির সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্কে বজায় রইল। গ্রামের সবচেয়ে দুঃস্থ, সামাজিক বর্ণ ও জাতি বিচারে সবচেয়ে নীচু তলার নিপীড়িত মানুষেরাই ভঙ্গুর গ্রামীন অর্থনীতি ছেড়ে এভাবে শহরের কারখানায় শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্মকালের এই বিশেষ অবস্থার প্রতিফলন পরবর্তী-কালের শ্রমিক আন্দোলনে সুস্পষ্টরূপেই দেখা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর দ্রুত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে এই জন্মগত অবস্থা প্রতিবন্ধক হিসাবেই কাজ করেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগে সামগ্রিক অবস্থার সুযোগ নিয়েই শ্রমিকদের মধ্যে সংস্কারবাদী চিন্তাধারা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবধারা প্রচার করে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল।[১]

ঔপনিবেশিক শোষণে শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তিকালীন সমস্যা

নিদারুণ ঔপনিবেশিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেভাবে ভারতের প্রাচীন সমাজ ও অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল তার ফলে ভারতের শ্রমজীবী মানুষদের এক অবিশ্বাস্যরকমের দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল। বিশেষ করে প্রাচীন অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রক্রিয়া এত দীর্ঘস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল এবং নতুন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা এত বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত ছিল যে দেশের মেহনতী মানুষের জীবনধারণের মান ক্রমাগত অধোমুখী হতে হতে

১। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদী প্রভাব সম্পর্কে পুস্তকের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে কমিউনিস্ট তৃতীয় আন্তর্জাতিকের একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। উপনিবেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদী প্রভাব সম্পর্কে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের স্পষ্ট

দারিদ্র্যের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছিল। ফলে ব্রিটিশরা যখন ভারতে কিছু আধুনিক কলকারখানা স্থাপন করল তখন তারা ভারতের দরিদ্রতম অংশের মধ্য থেকে যাদের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করত তাদের মজুরিও নির্ধারণ করত ঐ গ্রামীন সমাজের প্রচলিত জীবনধারণের মান অনুসারেই। এর অর্থ ছিল অত্যন্ত নীচু মানের মজুরি যা শ্রমিকের শ্রমের মূল্যমান থেকে অনেক কম। কয়েকটি প্রামাণ্য তথ্যের মধ্য দিয়ে অবস্থাটা পরিস্ফুটিত হবে। ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ সংশোধনের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার রাজা রামমোহন রায়ের কাছ থেকে ভারতের শাসন ব্যবস্থা, জনগণের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন তার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন যা বলেছেন তার উদ্ধৃতি এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করবে।

'প্রশ্ন : ভারতের কৃষক ও শ্রমিকদের সাধারণভাবে কি হারে মজুরী দেওয়া হয়?

উত্তর : কলকাতায় ছুতোর ও কামার ইত্যাদির মধ্যে ভাল কারিগররা (যদি আমার স্মৃতিশক্তি সঠিক হয়) মাসে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা মজুরি

কংগ্রেসে গৃহীত উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশসমূহের বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত থিসিসে বলা হয়েছে,

'The working class in the colonies and semi-colonies has characteristic features which are important in the formation of an independent working class movement and proletarian class ideology in these countries. The greater part of the colonial Proletariat comes from the Pauperized village, with which the worker retains his connection even when engaged in industry. In the majority of colonies (with the exception of some large industrial towns such as Sanghai, Bombay & Calcutta etc) we find, as a general rule, only the first generation of a proletariat engaged in large-scale production. The rest is made up of ruined artisans driven from the decaying handicrafts, which are widespread even in the most advanced colonies The ruined artisan, the small property owner, carries with him into the working class the narrow craft sentiments and ideology through which national-reformist influence can penetrate the colonial labour movement'

পায় (অর্থাৎ ২০ শিলিং থেকে ২৪ শিলিং); সাধারণ কারিগর যারা একটু নিম্নমানের কাজ করে তারা মাসে ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা মজুরি পায় (অর্থাৎ প্রায় ১০ শিলিং), রাজমিস্ত্রীরা মাসে ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা (১০ শিলিং থেকে ১৪ শিলিং) পায়; সাধারণ শ্রমিকরা পায় মাসে ৩৷৷০ টাকা থেকে ৪ টাকা, মালী বা হালকর্ষকরা পায় মাসে ৪ টাকার মত এবং পাল্কি-বাহকরাও ঐরকম মজুরিই পায় ছোট ছোট শহরে এই মজুরির হার আরও কিছু কম এবং গ্রামাঞ্চলে তা আরও অনেক কম।

প্রশ্ন : কি ধরনের খাদ্য খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে ?

উত্তর : বাংলাদেশে এরা সাধারণত ভাত খায় এবং তার সঙ্গে সামান্য শব্জী মুন, মসলা এবং মাছ। আমি অবশ্য অধিকতর গরীব শ্রেণীগুলিকে দেখেছি শুধুমাত্র ভাত এবং মুন খেয়ে জীবনধারণ করতে। উত্তরের প্রদেশগুলিতে এরা চালের বদলে গমের ময়দা গ্রহণ করে কিন্তু অপেক্ষাকৃত গরীবরা প্রায়শই জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি খেয়েই জীবন কাটায়।...

প্রশ্ন : কি ধরনের ঘরবাড়ীতে এরা বাস করে ?

উত্তর : বাংলাদেশে এবং উত্তর ও পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে এরা মাটির কুঁড়ে-ঘরে বাস করে। নিম্নবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে এরা খড়, মাদুর ও বাঁশের প্রস্তুত কুঁড়েতে বাস করে; একমাত্র উচ্চশ্রেণীর মানুষরাই পাকা বাড়ীতে বাস করে।

প্রশ্ন : এরা কি ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে ?

উত্তর : ...অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মজুররা লজ্জা নিবারণের জন্য শুধু কোমরের কাছে একফালি কাপড় ব্যবহার করে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে তারা সম্পূর্ণ নগ্ন থাকে,...'[১]

রাজা রামমোহন এই প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন ১৮৩৩ সালে। সাম্রাজ্য-বাদী শাসনে তখন ভারতের প্রাচীন শিল্প ধ্বংসে যাচ্ছে। প্রাচীন অর্থনীতির এবং শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতির এই অবক্ষয় এবং নতুন ধনতান্ত্রিক শিল্প গড়ে ওঠার মধ্যে সময়ের বিশাল ব্যবধান, পুরানো বৃত্তিচ্যুত মানুষের সংখ্যা এবং নতুন

১। Rammohan Roy on India Economy, Rare-book Publishing Syndicate, Calcutta, pp. 64, 65.

কলকারখানায় নিযুক্ত মানুষের সংখ্যার মধ্যে বিরাট পার্থক্য এবং সর্বোপরি শ্রমের মূল্যমান ও মজুরির মধ্যে এক অস্বাভাবিক ফারাক ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অপরিহার্য পরিণতি।

ঔপনিবেশিক শাসন ও তজ্জনিত অমানুষিক শোষণ ও বিরাট সংখ্যক বৃত্তিচ্যুত মানুষের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যের আরেকটি ফল ফলেছিল— তা হচ্ছে ভারত থেকে ব্রিটিশের বিভিন্ন বাগিচা উপনিবেশে শ্রমিক রপ্তানী।

১৮০৭ সালে দাস ব্যবসা এবং ১৮৩৩ সালে ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটলে পর ব্রিটিশ গায়েনা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, মরিশাস প্রভৃতি উপনিবেশে নিগ্রো ক্রীতদাসদের খুব অভাব ঘটে এবং এই দেশসমূহের আখের বাগিচা ইত্যাদিতে শ্রমিকের অভাবের এক প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। তখন ভারত থেকে দলে দলে দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষদের সংগ্রহ করে ঐ সমস্ত দেশে শ্রমিক হিসাবে চালান দেওয়া হত। ভারতের এই দেশত্যাগী শ্রমিকদের কাহিনী বর্বর ঔপনিবেশিক শোষণের আরেকটি ভয়াল চিত্র। এই বিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে কিছুটা বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতের শ্রমজীবী জনগণের দেশত্যাগের প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ভারত থেকে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রেই ঘটেনি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমজীবী মানুষদের একটা বিরাট অংশ নিজ নিজ প্রদেশ ত্যাগ করে যে সমস্ত প্রদেশে চা বাগিচা, কয়লাখনি ইত্যাদি চালু হয়েছিল এবং যে সমস্ত অঞ্চলে নতুন ধনতান্ত্রিক কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল সেই সমস্ত প্রদেশে ও অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেছিল এবং ঐ বাগিচা, খনি অথবা কলকারখানায় মজুর হিসাবে প্রবেশ করেছিল। ভারতবর্ষের মত বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় বিরাট দেশে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে শ্রমিকদের বসবাস এবং স্থানান্তরণও ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্রে ও আন্দোলনে কতকগুলি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

ভারতের বাগিচা শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুরীগত অবস্থা ঔপনিবেশিক শোষণের আরেকটি নির্মম চিত্র। এই সম্পর্কেও পরবর্তী পরিচ্ছেদে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতের এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে শ্রমজীবী জনগণের স্থানান্তরণ ঔপনিবেশিক ভারতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিফলন। এই স্থানান্তরণ

ছিল মোটামুটি একটা স্থায়ী শ্রমের বাজার সৃষ্টির প্রক্রিয়াস্বরূপ। যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) একটি সরকারী দলিলে নিম্নরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

'প্রতি বৎসর এই দেশত্যাগের স্রোত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। এর সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। কিন্তু সম্ভবত বেশী অতিরঞ্জিত না করেই বলা হয়েছে যে একমাত্র বেনারস ডিভিশনের সমস্ত জিলায় (এবং গোরক্ষপুর পূর্ব সাউথ) এমন একটা পরিবারও নেই যেখান থেকে অন্তত একজন সদস্য গৃহত্যাগ করে বাংলাদেশ অথবা অন্যত্র যায়নি। হাওড়া ও কলকাতায় শিল্প-সমূহের অদক্ষ শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ হচ্ছে এই সমস্ত জিলার নিম্নশ্রেণীর মেহনতকারীরা। আর উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিযুক্ত হত এই কারখানাগুলিতে দারোয়ান, পিওন ইত্যাদি হিসাবে। আসামে এই দেশত্যাগী মানুষদের এক অংশ চা বাগানে কাজ করত কিন্তু সেখানে অধিকাংশ কাজ করত সাধারণ কুলি-মজুর, মাঝি বা ছোটখাট ব্যবসায়ী হিসাবে।

অনেকে খনি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংগ্রহ করেছিল। এমনকি এক প্রদেশের মধ্যেও বিশেষ করে চাষের মরসুমে এই মেহনতকারী মানুষদের স্থানান্তরণ ঘটত।'[১]

শুধু যুক্ত প্রদেশ থেকে নয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও মেহনতী মানুষের ব্যাপক হারে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র গমন এই সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় যে এই যুগে গ্রামগুলিতে জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাপ থাকলেও এবং ব্যাপকভাবে মানুষ জীবিকার সন্ধানী হলেও কলকারখানাগুলিতে দক্ষ শ্রমিকের বিশেষ অভাব ছিল। একটা সরকারী দলিলে সমস্যাটাকে এইভাবে তুলে ধরা হয়েছিল,

'বর্তমানে কৃষিকার্য ব্যতিত অন্যান্য কাজে যথেষ্টসংখ্যক শ্রমিক সংগ্রহ করা

১। Resolution on the Administration of Famine relief in the United Provinces of Agra and Oudh during the years 1907 and 1908, Allahabad, 1908 p. 153, quoted from Capitalism in India by A I Levkovosky.

:। A. I. Levkovsky, Develcpment of Capitalism in India, p. 88,

২। B, Foley, Report on Labour in Bengal, 1906, p. 7.

কঠিন হয়ে পড়েছে। কলকারখানাগুলির মত কয়লাখনিগুলিতে এবং চা বাগানসমূহেও সরবরাহের তুলনায় শ্রমিকের চাহিদা অনেক বেশী।'[১]

প্রথম যুগ থেকে শুরু করে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্পগুলিতে শ্রমিকের এই ঘাটতি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই শ্রমিকের ঘাটতির এই সংকট তীব্র হয়ে উঠে। বস্তুতঃপক্ষে তখন পর্যন্ত শ্রমের একটা সংগঠিত বাজার গড়ে ওঠার অভাবের মধ্যেই এক সংকটের মূল কারণ নিহিত ছিল।

নবসৃষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকের এই অভাবের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে এবং অন্যত্র এর ফলে শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল।

১৯০৬ সালে বাংলা সরকার শ্রমিকের অভাবের কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারের জন্য মিষ্টার ফোলে নামক একজন ইংরেজ বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করলেন। তাঁর রিপোর্টটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি একথাই বললেন যে বাস্তবিকপক্ষে শ্রমিকের কোন অভাব নেই এবং এও ঠিক নয় যে গ্রামের মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চাকুরীর সন্ধানে যেতে নারাজ। এই অভাবের প্রকৃত কারণ হচ্ছে যে শ্রমিক সংগ্রহের কোন স্পষ্ট পদ্ধতি নেই।[২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্প কিভাবে গড়ে উঠেছিল এবং শ্রমিকের কি ধরনের চাহিদা ছিল নীচেব তথ্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(১) পাট শিল্প

তালিকা নং ১

বৎসর	তাঁতের সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
১৮৭৯-৮০	৪,৯৪৬	২৭,৪৯৪
১৮৯৫-৯৬	১০,১৬৯	৭৮,১১৪
১৯০২-০৩	১৭,১৮৯	১১৮,৯০৪
১৯০৪-০৫	১৯,৯৯১	১৩৩,১৬৪
১৯০৬	২৩,৫৩৪	১৫৪,৯৬২

(মোটামুটি হিসাব)

(২) কয়লাখনি

তালিকা নং ২

বৎসর	শ্রমিকের সংখ্যা
১৮৯৪	৩০,৭৭৩
১৯০৩	৭৪,৫৩৮
১৯০৪	৭৫,৭৪৯

(৩) চা বাগিচা (আসাম)	তালিকা নং ৩
বৎসর	শ্রমিকের সংখ্যা
১৮৯০	৪,০৬,০৮৯
১৯০০	৫,৬৪,৮৯৭১

সুতরাং শ্রমিকের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যে কম ছিল তার কারণ প্রধানতই ছিল শ্রমিক নিয়োগের সুষ্ঠু পদ্ধতির অভাব এবং শিল্পগুলিতে মজুরীর নিম্নহার ও চাকুরীর প্রতিকূল সর্তাবলী। চাকুরীর সর্তাবলী এমনই ছিল যে গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা এই শিল্পসমূহে চাকুরী গ্রহণ খুব একটা লাভজনক বলে মনে করত না। এরা বরং অনেক ক্ষেত্রেই অন্য ধরনের জীবিকার সন্ধান করত। কয়েকটি তথ্যের মধ্যে দিয়ে অবস্থাটা আরো স্পষ্ট হবে।

তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি জিলা যেমন সারণ, মজফ্‌ফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, উত্তর সাহাবাদ, পাটনা, উত্তর মুঙ্গের এবং বালেশ্বর ও কটক জিলার অংশবিশেষ অত্যন্ত ঘনসন্নিবসিত অঞ্চল বলে ধরা হত। এই হিসাব ১৯০১ সালের। এটাই স্বাভাবিক যে এই জনবহুল জিলাগুলিই হবে কলকারখানার শ্রমিক সরবরাহের উৎস। সারণ জিলা থেকে ১৯০১ সালে বাংলা-দেশের অন্যান্য জিলায় মোট ১,৩৮,৯০২ জন লোক গিয়েছিল। এই দেশত্যাগী লোকদের মধ্যে ৩৫,০০০ পূর্ববঙ্গে গিয়ে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়েছিল, এবং ৪৭,০০০ মানুষ এসেছিল কলকাতার শিল্পাঞ্চলে। মজফ্‌ফরপুর থেকে এ সময় ৬৭,৩২৫ জন লোক দেশত্যাগ করেছিল। এদের মধ্যে মাত্র ২০,০০০ জন কলকাতার শিল্পাঞ্চলে এসেছিল।[১]

এই তথ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে শ্রমজীবী মানুষেরা ব্যাপক হারে আপন বাস্তভিটা ত্যাগ করলেও এরা যে সবসময়েই শিল্পাঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে তা নয়। এর মূল কারণ ছিল এই যে শিল্পাঞ্চলসমূহে বসবাসের ব্যবস্থা যেমন খারাপ ছিল তেমনি খারাপ ছিল কলকারখানাগুলিতে চাকুরীর শর্তাবলী। রয়াল কমিশনে অন্ লেবারের রিপোর্টেও স্বীকার করা হয়েছিল যে হুগলী নদীর

১। Sanat kumar Bose, Labour conditions, Studies in the Bengal Renaissance published by National Council of Education Bengal pp. 537—38.

তীরে যে শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের মজুরী ইত্যাদির ব্যবস্থা শ্রমিকদের পক্ষে আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ১৮৬০-৯০ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরির কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। বিস্তৃত তথ্যে দেখা যায় যে বাংলাদেশের পাটকল শ্রমিকদের বেতন ১৮৬০ সালে যা ছিল ১৮৯২ সালেও তাই ছিল। পরবর্তী সময়েও ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল সেই হারে বেতন বৃদ্ধি ঘটেনি।[২]

এ ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পে এবং এমনকি একই শিল্পেও শ্রমিকদের বেতনের এত তারতম্য ছিল যা শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। বেতনের এই বৈষম্য তৎকালীন ভারতে শ্রমের বাজারের অনুন্নত চরিত্রকেই প্রতিফলিত করে।

শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিকসম্পর্কিত বিষয়ে একটা বিশ্রী ধরনের ঔপনিবেশিক বিশৃঙ্খলার দরুন শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যবর্তী একদল দালালের সৃষ্টি হয়েছিল। এরা সর্দার, মিস্ত্রী, আড়কাঠি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অভিহিত হত। এই দালালেরা গ্রামের দরিদ্র জনগণকে নানারূপ মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে, কোন কোন সময় অতিরিক্ত সুদে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে এবং আরো নানাবিধ উপায়ে এদের কারখানা, বাগিচা, খনি ইত্যাদিতে কাজ করবার জন্য নিয়ে আসত এবং মালিকদের কাছ থেকে এই শ্রমিক সংগ্রহের জন্য অর্থ গ্রহণ করত। অনেক সময় মালিক এই দালালদের মাধ্যমেও শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করত। এর ফলে শ্রমিকরা কলকারখানায়, বাগিচায়, খনি ইত্যাদিতে এক অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হত। এই ধরনের পরিস্থিতি কোন অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে কখনও সৃষ্টি হয়নি। ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণই শ্রমিকদের এই মারাত্মক অবস্থার জন্য দায়ী ছিল।

বহুজাতিক ও বহুধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে শ্রমিকদের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ছিল। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে শ্রমিকদের স্থানান্তরণও ভারতের ধনতন্ত্রের অসমান বিকাশেরই প্রতিফলন ছিল। এত

২। Ibid

৩। D. H. Buchanan, Development of Capitalist enterprises in India, P-317.

বিরাট দেশে তাই মূলত বোম্বাই, কলকাতা, কানপুর, নাগপুর ও মাদ্রাজকে কেন্দ্র করেই শিল্পগুলি সৃষ্টি হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শোষণজনিত উপরোক্ত সমগ্র পরিস্থিতি ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর একটা সুসংহত এবং সচেতন শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠার পথে প্রভূত এবং সুদূর-প্রসারী সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী পরবর্তীকালে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সুসংগঠিত এবং সচেতন শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঐ সমস্যাগুলির জের কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমানকালেও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দুর্বলতা হিসাবে কাজ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতে শিল্পায়নের অগ্রগতি
ও
শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা

ভারতে আধুনিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল মোটামুটি ১৮৫০-৭০ সালে। তাই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের কালও এটাই। এর পরবর্তী বৎসরগুলি ভারতের শিল্পায়নের অগ্রগতির কাল এবং তাই এই সময় শ্রমিকশ্রেণীরও শ্রেণী হিসাবে অগ্রগতির কাল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই অগ্রগতি আরও জোরদার হয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে মূলত এই অগ্রগতিকালীন পরিস্থিতিটাই আলোচ্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশের পাটকলগুলি বিস্তার লাভ করেছিল এবং তারই সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যাও স্ফীত হয়েছিল। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্যত্রও কয়েকটি পাটকল গড়ে ওঠে। ১৯১৩-১৪ সালে ভারতে মোট ৬৪টি পাটকল স্থাপিত হয়েছিল। এই কলগুলিতে মাকুর সংখ্যা ছিল ৭,৪৪,০০০ এবং তাঁতের সংখ্যা ছিল ৩৬,০০০। এই ৬৪টি কারখানায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা সেই সময় ছিল ২,১৬,০০০।[১] এই পাটকলগুলি ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ১৯০৮ সালেই জামশেদজী টাটা বিহারে টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বোম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে বস্ত্রকলগুলি স্থাপিত হতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তা বেশ প্রসার লাভ করে। এই সময়ে যে নতুন মিলগুলি বোম্বাইয়ে স্থাপিত হয় তার সংখ্যা নিম্নরূপ।[২]

১। A. I. Levkovosky, Development of Capitalism in India. P. 53

২। The Bombay Industries : The Cotton Mills, Bombay. 1927 quoted from ibid, P 71

তালিকা নং ৪

বৎসর	নতুন মিল	মাকু	তাঁত	শ্রমিক	নিয়োজিত মূলধন
					হাজার টাকার হিসাবে
১৮৫৫-৭০	৩	২,৯১,০০	৪,১০০	৮,১০০	—
১৮৭০-৭৫	১৫	৪,৬১,৬০০	৩,৬৮০	৫,৪৫০	৩৩,৮৫৮
১৮৭৫-৮৫	২৩	৫,৯৪,৮০০	৪,২৬০	২৮,০০০	১৪,১০৪
১৮৮৫-৯৫	২১	৭,৭৬,৬০০	৮,২১০	৩৪,২০০	৭,৫৮৪
১৮৯৫ ১৯০৫	১৬	৪৩৭,০০০	৭,৮৮০	১৭,২৫০	৫,৪৮৯
১৯০৫-১৫	৮	৪,৩৩,৪০০	২৩,৮০০	১৯,০০০	১৫,৫৬৩

১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে মোট বস্ত্রকলের সংখ্যা হয়েছিল ৯৬টি এবং এই কলগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,১২,০০০।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ভারতীয় শিল্পপতিদের শিল্পোদ্যোগ ব্রিটিশ মূলধনের সঙ্গে কিছুটা বিরোধে লিপ্ত হয়েই অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু এই বিরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমান অবস্থা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী আত্মসমর্পণের মানসিকতা বিভিন্নভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছিল। বর্তমান ভারতের অন্যতম বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি টাটাদের কার্যকলাপ এই বিষয়ে খুবই ইঙ্গিতবহ। জামশেদজী টাটা ১৮৭৭ সালে নাগপুরে একটি সুতাকল স্থাপন করেন। নাগপুর ছিল সেই সময় একদিকে যেমন তুলা উৎপাদনের প্রকৃষ্ট স্থান তেমনি অন্যদিকে সস্তা শ্রমিক সংগ্রহেরও উপযুক্ত ক্ষেত্র। ব্রিটিশ সরকারকে খুশী রেখে নির্বিঘ্নে ব্যবসা পরিচালনা করা ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকট করার জন্য টাটা এই কারখানার নাম রাখেন 'এম্প্রেস্ মিলস্'। এই কারখানাটির পঞ্চাশ বৎসরের অস্তিত্বের মধ্যে টাটা মোট ৯,২২,১৪,০০০ টাকা মুনাফা করেন। কিন্তু এই সময়ে টাটা এবং অন্যান্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের বাজারের প্রতিযোগিতা তীব্র হল। টাটা ঠিক তখন ১৮৮৫ সালে বোম্বাই-এ আরেকটি মিল চালু করলেন। তিনি এই মিলটির এইবার নামকরণ করলেন 'স্বদেশী মিলস্'।

আমেদাবাদকে কেন্দ্র করেও অনেক সুতাকল গড়ে উঠল। আমেদাবাদের মিলমালিকদের সঙ্গে সামন্ত প্রভুদের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ভারতের

অন্যান্য স্থানেও সূতাকল স্থাপিত হল, কিন্তু বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলনায় সীমাবদ্ধভাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতীয় পুঁজির বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রই হয়ে উঠল সূতাকল শিল্প। ১৮৮৬-১৯০৫ সাল, এই বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতে সূতাকলের সংখ্যা দাঁড়াল ৯৫ থেকে ১৯৭টিতে। এই সূতাকলগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা এই বিশ বৎসরে ৭৪,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯৫০০০-এ উন্নীত হল।[১]

এই সময়ে ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে তাঁতশিল্প কিছুটা পুনর্জীবন লাভ করতে শুরু করে। তবে তফাৎ হল পূর্বের ন্যায় গ্রাম্য সমাজের প্রয়োজন মিটাবার তাগিদের চেয়ে বাজার দখলের লক্ষ্য নিয়েই এই তাঁতশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হল। তবে কারখানায় প্রস্তুত সূতোর সাহায্যেই এই তাঁতগুলি কাজ করত।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ১৯০৯-১০ সালে সমস্ত মিলগুলি একযোগে তাঁতে বোনা বস্ত্রের মোট পরিমাণের থেকে বেশীপরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করে.ছ। এই সূতাকলগুলি হয়ে দাড়িয়েছিল তাঁতশিল্পের ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯০১-১১ সালের মধ্যে সূতাকলগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১,৭২,৯০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৩০,৬০০তে পৌছেছিল। ঐ সময়ে তাঁতশিল্পীর সংখ্যা ৩,২৭৯,৭০০ থেকে হ্রাস পেয়ে ২,৯০৭,১০০তে এসে নেমেছিল।[২] সূতাকলগুলির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নিজেদের রক্ষার তাগিদে তাঁতীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। আরও অধিক সময় পরিশ্রম করে এবং পরিবারের আরো বেশী লোককে এই কাজে নিয়োগ করে তাঁতীরা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

আরও লক্ষণীয় যে এই সময় আধুনিক শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করলেও শিল্পশ্রমিকের তুলনায় কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাই আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে প্রয়োজনের তুলনায় শিল্পস্থাপন এত কম ছিল যে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল তা আদৌ হয়নি। বরং কতকগুলি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। নীচের পরিসংখ্যান থেকে পরিস্থিতিটা পরিষ্কার হবে।

১। The Indian Year Book, 1930, Bombay and Calcutta.

২। Indian Cotton Textile Industry, 1851 1951 Bombay.

তালিকা নং ৫

১৯০১ সালে এবং ১৯১১ সালে ভারতের জনগণের পেশাগত বিভাগ
(সহস্রের হিসাবে)[১]

অর্থনীতির শাখা	১৯০১	১৯১১	শতকরা হিসাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস
কৃষি এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম	১,৯১,৯০০	২,২০,২০০	১৪.৭ বৃদ্ধি
শিল্প	৩৪,২৯৬	৩৪,২৪৬	—৪০.৭ হ্রাস

আলোচ্য সময়ের মধ্যে গৃহনির্মাণ ও যানবাহন শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১৮.২ ও ২৯.৪ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও সমস্ত শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ০.৭ ভাগ হ্রাস পায়। বৃটেন থেকে বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প ও ধাতুশিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্য ব্যাপক আমদানীর ফলে ভারতের এই শিল্পগুলির আনুপাতিক বিচারে যে অবক্ষয় ঘটে তার পরিণামে এই শিল্পগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পায়। ভারতে আধুনিক বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠা সত্বেও তাঁত-শিল্পীরা ব্যাপকহারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন মোট হিসাবে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পায়।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প ও ধাতুশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৬, ৩৩.৯ এবং ৬.৬ ভাগ হ্রাস পায়। অবশ্য পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪ সালে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২,৬০,০০০ এবং ১৯১৮ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ২,৮২,০০০।[২] ১৯১৯ সালে ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা হল ১৩,৬৭,০০০। এই শ্রমিকদের মধ্যে ৩,০৬,৩০০ জন নিযুক্ত ছিল ২৭৭টি, বস্ত্রকলে এবং ১,৪০,৮০০ জন নিযুক্ত ছিল তুলা থেকে সুতা প্রস্তুতের শিল্পে। ৭৬টি চটকলে নিযুক্ত ছিল ২,৭৬,১০০ জন শ্রমিক। রেলওয়ে কারখানাগুলিতে কাজ করত ১,২৬,১০০ জন শ্রমিক। হিসাবে দেখা যায় মোট শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশই কাজ করত বৃহৎ শিল্পগুলিতে। এ ছাড়া ঐ সময়ে কয়লাখনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২,০৭,৮০০ জন।[৩]

ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বর্তমানেও নিতান্তই কম।

১। Census of India, 1911.
২। A Pearse, The Cotton Industries in India, p 22
৩। Report of the Indian Fiscal Commission, 1921-22, London, p. 17-18,

অতীতে এই সংখ্যা আরও কম ছিল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনার অন্যতম অসুবিধা হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্বের অপ্রতুলতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধির হারের কোন সুষ্ঠু হিসাবের অভাবে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা চলে যে ভারতে আজ পর্যন্ত কৃষিই অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ রয়েছে। ফলে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের হার তুলনায় অনেক কম।

১৯২২ সালের অক্টোবরে লীগ অব নেশন্‌সের অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড দাবী করেন যে ভারতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা দুই কোটি।[১] ব্রিটিশ সরকারের এই আজগুবী দাবীর পিছনে মতলবটা ছিল ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণকে আড়াল করে বিশ্বের কাছে ভারতকে শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে জাহির করা। ১৯২৭-২৮ সালে ভারতে আগত ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলও দাবী করেন যে ভারতে আড়াই কোটিরও অধিক শ্রমিক আছে যাদের সংগঠিত করা যায়। আসলে এই আড়াই কোটির মধ্যে দুই কোটি পনের লক্ষই ছিল ক্ষেতমজুর যাদের শিল্প শ্রমিক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।[২] এগুলো সবই ব্রিটিশ সরকার ও তার অনুগতদের কারসাজী। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সত্ত্বেও কোন কোন দলিলের সাহায্যে কিছুটা বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সেন্সাস-রিপোর্টগুলি থেকে এই বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯২১ সালে ও ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতের জনগনের বৃত্তিভিত্তিক যে বিন্যাস দেখানো হয়েছে তা এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করবে। তুলনামূলক সংখ্যাতত্ত্ব নীচে দেওয়া হল।

তালিকা নং ৬

১৯২১ এবং ১৯৩১ সালে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত জনগণের বৃত্তিগত বিন্যাস[৩]

(সহস্রের হিসাবে)

পেশা	১৯২১	১৯৩১
কৃষি ও পশুপালন	১,০৪,৯৪৪	১,০২,৪৫৪
মৎস্য ও পশুশিকার	৭৪৮	৮৪০

১। R, Palme Dutt, India To-day, p. 315.

২। Ibid.

৩। Census of India, 1931, Vol. 1. part 1.

পেশা	১৯২১	১৯৩১
খনিজ শিল্প	৩৪৭	৩৪৬
শিল্প	১৫,৭১৫	১৫,৩৫২
যানবাহন	১,৯৭০	২,৩৪১
ব্যবসা	৮,০৪৯	৭,৯১৪
সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি	১,০৪০	৮৪১
প্রশাসন	১,০০৫	৯৯৫
ছোট দোকানদার, গাড়োয়ান ইত্যাদি ও অন্যান্য বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত	২,০৮১	২,৩১০
নিজস্ব অর্থের উপর নির্ভরশীল	১৮৪	২১৬
গৃহকর্মে নিযুক্ত	২,৫৩২	১০,৮৯৮
অন্যান্য অনির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত	৫,৯৪৭	৭,৭৭৯
কয়েদী, ভবঘুরে, ভিখারী ইত্যাদি	১,৮৫৫	১,৬২৬

১৯২১ সালে দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। শিল্পে এবং ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০.৭ ভাগ ও ৭.১ ভাগ মানুষ। ১৯৩১ সালেও অবস্থা অনুরূপই ছিল।

উপরের পরিসংখ্যানে ছোট দোকানদার ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত যাদের বলা হয়েছে তারা প্রধানত গ্রামের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। গৃহকর্মে ও অন্যান্য অনির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত যাদের বলা হয়েছে তারা ছিল মূলত নিঃস্ব কৃষক। ১৯৩১ সালে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বলা হয়েছে প্রায় ১৫,৩০০,০০০। এরা ছিল প্রধানত হস্তশিল্পী, ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ইত্যাদি। এদের অনেকেই গ্রামে বাস করত।

যে সমস্ত শিল্পে ২০ জন অথবা বেশী শ্রমিক কাজ করত এমন সব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৩১ সালে ছিল ৩৫,৮১,০০০ জন। এর মধ্যে ১৫,২০,০০০ জন শ্রমিক কাজ করত কারখানায়, ১০,৮০,০০০ জন বাগিচাসমূহে এবং ৭,৭৭,০০০ জন শ্রমিক কাজ করত রেলওয়েতে।[১]

ভারতবর্ষের শিল্পোৎপাদনের ঔপনিবেশিক চরিত্র বিভিন্নভাবে প্রকটিত এবং এই চরিত্র শিল্পায়নের পথ বাধাগ্রস্ত করে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির পথকেও সংকুচিত করে রেখেছিল। ১৯২১-২২ সালে মোট শিল্পোৎপাদনের মূল্য

১। **A. I Levkovosky, Capitalism in India, p. 187**

ছিল ১৬৮ কোটি টাকা। এটা ছিল কৃষি সহ মোট উৎপাদন মূল্যের এক সপ্তমাংশ। শিল্পের বিন্যাসেও ঔপনিবেশিক চরিত্র সুস্পষ্ট। মূল্য হিসাবে মোট উৎপাদনে বস্ত্রশিল্পের অংশ ছিল ৪০%, ক্ষুদ্রশিল্পে (তাঁত সহ) ২১% খাদ্য ও পানীয় ২৮%, এবং বাকী অন্যান্য শিল্পে ১১%।[১]

উৎপাদন শক্তির এই অবরুদ্ধ অবস্থা ভারতের সমাজে ও অর্থনীতিতে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক চরিত্রের রেশ বজায় রেখেছিল। ঔপনিবেশিক শোষণের এই সামগ্রিক পদ্ধতি জনগণের জীবনে নিয়ে এসেছিল অশেষ দুঃখ-দুর্দশা। পাশ্চাত্য দেশে বেকার সৃষ্টি হয় উৎপাদন শক্তির অধিকতর বিকাশের ফলে। কিন্তু ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজি ভারতে বেকার সৃষ্টি করেছে ভারতের উৎপাদন শক্তিকে অবরুদ্ধ করে। উৎপাদন শক্তির এই অবরুদ্ধ অবস্থা একদিকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং অপরদিকে এক বিরাট সংখ্যক বেকারবাহিনী সৃষ্টি করে সামগ্রিকভাবে ভারতকে অনুন্নত অবস্থায় রেখেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কিভাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নীচের তথ্য থেকে পরিস্ফুটিত হবে।

তালিকা নং ৭

সক্ষম পুরুষ ও বেকারের মোট সংখ্যা ও শতকরা হার[২]

(১০ বৎসর থেকে ৬০ বৎসর পর্যন্ত)

বৎসর	সক্ষম পুরুষ	সক্ষম বেকার	বেকারীর হার
১৯০১	১০,৩১,২১,৭০০	৭৩,০৮,৪৬২	৭ ১
১৯১১	১০,৯৮,৬২,১২৩	৪৩,৩৬,৭০২	৭ ৬
১৯২১	১১,২১,২০,৭৬৭	১,১৫,১০,৯২৪	১০.৩
১৯৩১	১২,৪০,১৫,০০৯	১,৭৭,২০,৩৬৫	১৪.২

[illegible] অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছিল উপরের পরিসংখ্যান থেকে তা সুস্পষ্ট হয়। ১৯৩১ সালে এই হিসাব অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা ১,৭৭,০০,০০০-এর অধিক। অপরদিকে ভারত বিশেষজ্ঞ মিঃ লেড্‌কতস্কীর হিসাব অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকের

১। *Ibid.*

২। **Population, National Planning Committee Series, 1947**

সংখ্যা ঐ বৎসর ছিল প্রায় ৩৬,০০,০০০। অবশ্য এই হিসাবে ২০ জন অথবা ততোধিক শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ধরা হয়েছে। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে ১০ জন অথবা ততোধিক শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বলা হয়েছে মোটামুটি ৫০,০০,০০০। রজনী পাম দত্ত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পূর্বকালে শ্রমিকের সংখ্যার একটা হিসাব দেখিয়েছেন। হিসাবটা নিম্নরূপ।[১]

তালিকা নং ৮

মাঝারী ও বৃহৎ ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত শ্রমিক	২০,৩৬,৭৫৮
(২০ জন বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্প)	
খনি শ্রমিক	৪,১৩,৪৫৮
রেলওয়ে শ্রমিক	৭,০১,৩০৭
জলপরিবহণ শ্রমিক (ডক শ্রমিক, নাবিক)	৩,৬১,০০০
মোট	৩৫,১২,৫২৩ জন

এই ৩৫ লক্ষ শ্রমিক হল আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক। এর সঙ্গে পাম দত্ত আরো ১০ লক্ষের অধিক বাগিচা শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের যোগ করে বলছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বে সংগঠিত হতে পারে এমন শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষের উপর। এরই সঙ্গে পাম দত্ত ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের পরিসংখ্যান থেকে শুধুমাত্র কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যারও একটা তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি নিম্নরূপ:

তালিকা নং ৯[২]

বৎসর	ফ্যাক্টরীর সংখ্যা	দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের গড় সংখ্যা
১৮৯৪	৮১৫	৩,৪৯,৮১০
১৯০২	১,৫৩৩	৫,৪১,৬৩৪
১৯১৪	২,৯৩৬	৯,৫০,৯৭৩
১৯১৮	৩,৪৩৬	১১,২২,৯১২

১। R, Palme Dutt, India To-day, p 317,

২। Ibid, p. 318.

বৎসর	ফ্যাক্টরীর সংখ্যা	দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের গড় সংখ্যা
১৯২২	৫,১৪৪	১১,৬১,০০২
১৯২৬	৭,২৫১	১৫,১৮,৩৯১
১৯৩০	৮,১৪৮	১৫,২৮,৩০২
১৯৩৫	৮,৮৩১	১৬,১০,৯৩২
১৯৩৮	৯,৭৪৩	১৭,৩৭,৭৫৫
১৯৩৯	১০,৪৬৬	১৭,৫১,১৩৭
১৯৪৩	১৩,২০৯	২৪,৩৬,৩১০
১৯৪৪	১৪,০৭১	২৫,২২,৭৫৩

এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৩৯ সালে ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের সংজ্ঞা অনুসারে নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরীগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৭,৫০,০০০-এর অধিক। যাই হোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সংগঠিত হবার যোগ্য মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষের মধ্যে ছিল বলেই ধরা যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত এবং ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্য দিয়ে এই যে ৫০ লক্ষাধিক সংগঠিত হবার যোগ্য শ্রমিক সৃষ্টি হল এদের কি অবস্থায় কাজ করতে হত, এরা কি ধরনের মজুরি পেত এবং এদের জীবনধারণের ব্যবস্থা কি ছিল তার বাস্তব চিত্র ঔপনিবেশিক শোষণের আরেকটি মর্মান্তিক দিক।

শ্রমিকের অবস্থা

শ্রমিকশ্রেণী উদ্ভবের প্রথমযুগে ইংলণ্ডে এবং অগ্রসর অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও শ্রমিকশ্রেণীকে অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হত। মজুরির পরিমাণ, কাজের ঘন্টা, শিশুশ্রমিক নিয়োগ, বসবাসের স্থান ইত্যাদি সমস্ত দিকেই শোষণের মাত্রা ছিল অত্যধিক। কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের যুগে যে শোষণ চলেছিল তা ইউরোপের শ্রমিকদের শোষণের চেয়েও তীব্র ছিল, কারণ ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ। উপনিবেশের শ্রমিকদের শোষণের চরিত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকদের শোষণের চরিত্রের কিছুটা পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই থাকবে।

প্রথমযুগে সর্বত্রই শ্রমিকদের একটানা ১৫।১৬ ঘন্টা পরিশ্রম করানো হত। নারী ও শিশুদের দিয়েও একইভাবে খাটানো হত। এমন কি ৫।৬ বৎসরের শিশুদেরও অমানুষিকভাবে কারখানায় নিয়োগ করা হত। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় কোন সাবধানতামূলক ব্যবস্থা ছিল না যার ফলে প্রায়ই শ্রমিকদের অঙ্গহানি ঘটত এবং তার জন্য শ্রমিকদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত না। যে মজুরি দেওয়া হত তা কোনরকমে প্রাণধারণেরও যোগ্য ছিল না।

ভারতের শ্রমিকরা শ্রমিক হবার পূর্বে গ্রামীন অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সেখান থেকে প্রচণ্ড নিঃস্ব অবস্থায় জীবনধারণের দায়ে শহরে এসে সে মজুর হয়েছিল। তাই ভারতের মিলমালিকরা শ্রমিকদের এই নিঃস্ব অবস্থার সুযোগে এবং গ্রামের কৃষিজীবী মানুষদের স্বাভাবিক নীচুমানের আয় ও জীবনধারণের সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের উপরও এক অমানুষিক শোষণ ও অসম্ভব রকমের নীচুমানের মজুরি চাপিয়ে দিয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য উল্লেখ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক অবস্থা, মজুরি ইত্যাদির কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে। ভারতের আধুনিক কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার পর বিভিন্ন কারখানায় যে মজুরি দেওয়া হত তা যেমন নীচু ছিল তেমনি বিভিন্ন কারখানায় মজুরির হারেরও পার্থক্য ছিল। কিন্তু এই মজুরি সম্পর্কে বিস্তৃত প্রামাণ্য তথ্যের অভাব আছে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে ১৮৯২ সালে ভারতের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের গড় মজুরির একটা চিত্র পাওয়া যায়। সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এই গড মজুরি শ্রমিকের একক নয়। এই মজুরী সমগ্র পরিবারের মজুরি। অর্থাৎ শ্রমিকের পরিবারের অন্যান্যরাও পরিশ্রম করে যে মজুরি অর্জন করতেন তার মোট গড় ধরেই এই হিসাব।

এই হিসাব অনুযায়ী ৮৯২ সালে বস্ত্রকল শ্রমিকরা পেতেন,[১]

তালিকা নং ১০

পুরুষ	মাসিক	১২ টাকা
নারী	মাসিক	৯ টাকা
শিশু	মাসিক	৬ টাকা

শ্রমিকদের হার ৩০ বৎসর ধরে একইরূপ ছিল। ডি. এইচ. বুকানন

১। **Statistical Abstracts for India for 1892,**

দেখিয়েছেন যে ১৮৬০-৯০ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতনের কোনরূপ বৃদ্ধি ঘটেনি।[১] বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থল বোম্বাই-এর চীফ ইনস্‌পেক্টর অব্‌ ফ্যাক্টরীজ মিঃ এম. এ. মুসের একটি মন্তব্য এই বিষয়ে খুব প্রণিধানযোগ্য। ৩০ বৎসর যাবৎ মজুরি বৃদ্ধি না হওয়ার অবস্থা থেকে তিনি বলছেন,

'যখন শ্রমিকদের শিক্ষা বা নৈতিক অবস্থার কোন প্রগতি এই সময় ঘটেনি, যখন টাকার ক্রয় ক্ষমতাও এই সময়ে ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে তখন শ্রমিকদের সুখ এবং কিছুটা প্রাচুর্য এবং আরামের দিক থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রগতির চেয়ে অনেক বেশী অধোগতি ঘটেছে।'[২]

লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই পরিস্থিতি এমন একটা সময়ে সৃষ্টি হচ্ছে যখন শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত এই ২০ বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তা ছাড়া শ্রমিকরা পুরো মজুরি কোন মাসেই পেতেন না। কারণ কাজের ত্রুটির অজুহাতে, যন্ত্রপাতি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার অজুহাতে এবং আরো নানারূপ অজুহাত সৃষ্টি করে মজুরির একটা অংশ কেটে নেওয়া হত। আবার এই কাটা-মজুরিও সব সময়ে মাসিক ঠিকমত পাওয়া যেত না। অনেক সময়ই মজুরি দুই তিন মাস যাবৎ অনাদায়ী পড়ে থাকত।

ব্রিটিশ এবং ভারতীয় মালিকরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে মাত্রাহীন শোষণ করে চূড়ান্ত হারে উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ করত। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী এবং দেশী মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘতম সময় খাটিয়ে লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করত। কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়েও দীর্ঘ সময় শ্রমিকদের খাটানো হত।

১৯৩১ সালে রয়েল কমিশন অব লেবর মন্তব্য করেছিলেন যে ১৯০৮ সালে যখন ফ্যাক্টরী কমিশন তদন্ত কার্য চালাচ্ছিলেন তখন অনেক বস্ত্রকলেই একই শ্রমিককে দিয়ে ১৩ ঘণ্টা থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছিল এবং পূর্বে এই পদ্ধতিই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল।[৩]

১। D. H. Buchanan, Capitalist Enterprises in India, p. 317,

২। British Parliamentary Papers 1892, X X XVI, Vol-I V, Part V

৩। Royal Commisson on Labour reported, 'when the Factory Commission of 1908 made the investgations, many textile mills were working from 13 to 15 hours a day with a single set of workers and before that this practice had been fairly general'

১৯০৮ সালে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করেন তার থেকে শ্রমিকদের খাটানোর ব্যাপারে এক অমানুষিক চিত্র ফুটে উঠে।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী আমেদাবাদে শ্রমিকদের কাজের গড় সময় ছিল ১২ ঘণ্টা, যেসব কারখানায় বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হত সেই সব প্রতিষ্ঠানে কাজের সময় ১৪ ঘণ্টার কম ছিল না। বোম্বাই-এ শ্রমিকরা সাধারণত ১২ ঘণ্টারও অধিক পরিশ্রম করতেন। ৮৫টা বস্ত্রকলের মধ্যে ৬০টা বস্ত্রকলে বিদ্যুৎচালিত শক্তি ব্যবহার করা হত এবং সেখানে শ্রমিকদের কাজের সময় দিনে ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল। ব্রোচ শহরে শ্রমিকদের দৈনিক ১৪½ ঘণ্টা কাজ করতে হত, লক্ষ্ণৌতে শ্রমিকরা দৈনিক ১৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট কাজ করতেন। শোলাপুরে শ্রমিকরা কাজ করতেন দৈনিক ১২½ থেকে ১৩½ ঘণ্টা এবং দিল্লীতে কাজের সময় ছিল ১৩½ থেকে ১৪½ ঘণ্টা। অমৃতসর এবং লাহোরে কাজের সময় ছিল ১৩ ঘণ্টা থেকে ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। কিন্তু কলকাতার পাটকল মালিকরাই এই ব্যাপারে সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করেছিলেন। এই পাটকলগুলিতে শ্রমিকদের ১৫ ঘণ্টা থেকে ১৫½—১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হত।[১]

কলকারখানার বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টাও বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ সালে টেক্সটাইল ফ্যাক্টরীজ লেবর কমিটি তাঁদের রিপোর্টেও বলেন যে ভারতের মিলগুলিতে বিদ্যুতের বাতি প্রচলনের ফলে কাজের সময় মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শ্রমিকদের এত অধিক সময় পরিশ্রম করতে হত যে যখন তাঁরা কাজ থেকে বেরিয়ে আসতেন তখন তাঁরা হয়ে যেতেন একেবারেই অবসন্ন এবং প্রায়ই তাঁরা কাজের পর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন।[২]

যে সমস্ত কারখানায় তুলা থেকে তুলার বীজগুলি পৃথক করে ফেলা হত সেখানে শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ছিল শোচনীয়তম। তুলা রপ্তানী

১। Report of the Indian Factory Labour Commission, London, 1908, Vol I, pp 6, 7, 11.

২। Report of the Textile Factories Committee London, 1907, p 17

The Committee reported 'The introduction of the electric light in Indian Mills has led to excessive hours of running…

The machinery in certain mills is in motion from about 5 a m to 9 p m; in others the hours of running are less, but in busy times they would be increased'

কেন্দ্রগুলিতে এই ধরনের অনেক কারখানা তখন সৃষ্টি হয়েছিল। এই কারখানাগুলির শোষণ সেই সময়কার অবস্থাটাকে প্রকট করে তোলে। বোম্বাই-এর সিনিয়র বয়লার ইনস্পেক্টর মিঃ টম ড্রেওয়েট তাঁর রিপোর্টে এই সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন তা অমানুষিক। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী এই কারখানাগুলি বৎসরে সাধারণত ৮ মাস কাজ করত। এর মধ্যে ৫ মাস সকাল ৫টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কারখানার কাজ চলত। বাকি ৩ মাস সারা দিনরাত্রিই কাজ হত। শ্রমিকরা প্রায় সকলেই ছিল স্ত্রীলোক। একটানা এক সপ্তাহ ধরে সারা দিনরাতই এদের কাজ করতে হত। অনেক শিশুও কারখানাগুলিতে ছিল। এদের দিয়ে কাজ করান হত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা। আরেকজন ওভারসীয়ার তাঁর রিপোর্টে বলছেন 'যখন কাজ বেশী থাকত তখন এরা সকাল ৪টা থেকে রাত্রি ১০টা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পরিশ্রম করত। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক শ্রমিকেরা কখনও কখনও একটানা বিরামহীনভাবে ১০ দিন সারা দিনরাত কাজ করত।' মিঃ আর এফ ওয়াদিয়া তাঁর একটা ফ্যাক্টরীর বিবরণ দিয়েছেন। ফ্যাক্টরীটিতে ৪০টি জিন (তুলা থেকে বীজ ছাড়াই-এর যন্ত্র) ছিল। তাঁর বিবরণে তিনি বলছেন, 'এই ৪০টি জিনে কাজ করার জন্য আমার ৪০ জন স্ত্রীলোক আছে। আমার মাত্র ৮ জন অতিরিক্ত স্ত্রীলোক আছে। আমি এই স্ত্রীলোকদের কখনও জিন ছেড়ে যেতে দিই না। এই ব্যাপারে আমি শুধু একাই নয়, এটাই প্রচলিত পদ্ধতি। একমাত্র খাদ্যগ্রহণের সময় ছাড়া আর কোন সময়েই হাত বদল হয় না যারা এইরকম অত্যধিক সময় কাজ করত তারা প্রায়ই মারা যেত।'[১]

এই ধরনের পরিশ্রম কোন মানুষের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এই বর্বরোচিত শোষণের ফলে যখন কোন একদল শ্রমিক দৈহিকভাবে ভেঙ্গে পড়ত তখন তাঁর বদলে আরেক দল শ্রমিককে ব্যবহার করা হত।

নারী ও শিশু শ্রমিকদের শোষণের ক্ষেত্রে মালিকদের কোন মাত্রাজ্ঞান ছিল না। ৫—৭ বৎসরের শিশু থেকে শুরু করে অপরিণত বয়স্ক বালকদের নির্মমভাবে খাটানো হত সর্বত্র। ১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের তদন্তে দেখা যায় যে কারখানাগুলিতে অর্ধেক সময় কাজের জন্য যাদের নিয়োগ করা হত তাদের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগই ছিল অল্পবয়স্ক শিশু। ফ্যাক্টরী কমিশন বাংলাদেশের একটা পাটকলের কাজের পদ্ধতি

১। **British Parliamentary Papers, 1888, LXXVII, No 321 pp 13-15**

বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে কারখানার তিন চার মাইল দূরে শ্রমিকরা বাস করত। শেষরাত্রি ৩টার সময় কারখানায় সাইরেন বাজত এবং ৭ বৎসরের অনধিক শিশুরা ঐ শেষরাত্রে দুই তিন মাইল হেঁটে কারখানায় কাজ করতে আসত। নারী শ্রমিকদের সম্পর্কেও কমিশন বলছেন যে সারা রাত্রিব্যাপী কাজ করার ফলে নারী শ্রমিকরা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। এই নারী শ্রমিকদের অনেকেই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কোলে করে কারখানায় কাজ করতে আসত।

শিশু শ্রমিকদের উপর পাশবিক শোষণ ও নির্যাতনের এক হৃদয়বিদারক চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন দেওয়ান চমনলাল। বিবরণটি নিম্নরূপ :

'ভারতের শিল্পক্ষেত্রে দাসত্বই হচ্ছে মূল কথা। শিশু-দাসত্বের উদাহরণ খোঁজবার জন্য আমাদের লাইবেরিয়া বা আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশের দিকে তাকাতে হবে না। ভারতের মর্মস্থলেই আমরা এই জিনিস দেখতে পারি। বেশী দিনের কথা নয়। সাধারণ্যে সুপরিচিত একজন ব্যক্তি যখন তিনি স্কুল-শিক্ষক হিসাবে কাজ করতেন সেই সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার পাশের বাড়ীতে বহু শিশুকে রোজ নিয়ে আসা হত। মাঝে মাঝেই রাত্রে তিনি ঐ শিশুদের করুণ আর্তনাদ শুনতেন। ফলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি ভেবেছিলেন যে পার্শ্ববর্তী বাড়ীটি ছিল একটি স্কুল এবং ঐ স্কুলের নির্দোষ শিশুদের উপর যে নিষ্ঠুরতা করা হত একজন শিক্ষক হিসাবে তা কর্তৃপক্ষকে জানাবার তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন। যখন তদন্ত করা হল তখন জানা গেল যে পাশ্ববর্তী বাড়িটি ছিল একটি লেস-ফ্যাক্টরী। ঐ ফ্যাক্টরীতে খুব ছোট ছোট শিশুদের দিয়ে অভূতপূর্ব দীর্ঘ সময় কাজ করানো হত। যখন ঐ শিশুরা ক্লান্ত হয়ে যেত এবং কাজ করতে করতে নিদ্রায় তাদের মাথা ঝুঁকে পড়ত তখন সদয় ফ্যাক্টরী মালিক বেত নিয়ে সেখানে হাজির হত এবং তাদের ঘুম ছুটিয়ে দিত। মালিক হয়ত ভাবত যে শিশুদের আর্তনাদ আর অশ্রু তাদের শিল্প শিক্ষণের সহায়ক। ঐ সুপরিচিত ভদ্রলোকের নাম রাইট্ অনারেল্ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী পি সি.। মিঃ শাস্ত্রী রয়াল কমিশন অন লেবরের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অমৃতসর শহরে একটা কার্পেট ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করেছিলেন। এই ফ্যাক্টরীটি গ্রীক এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মালিকানাধীন ছিল এবং সেখানে অত্যন্ত সুন্দর প্রাচীন কার্পেটের অনুরূপ কার্পেট প্রস্তুত করানো হত এমন সব শিশুদের শ্রমে যাদের বয়স ছিল

খুবই কম—মাত্র ৫ বৎসর। মিঃ শাস্ত্রী অনুসন্ধানের সময় এক ব্যক্তির কাছে একটি লেজার দেখতে পেলেন। লেজারটি পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে, 'আমি চান্নীর পুত্র বুটা অমৃতসরের একজন চৌকিদার ৫৭ টাকা ঋণ করেছি। এর অধিক ২৮॥৹ টাকা আমি তাঁত বুটির কাছ থেকে অগ্রিম হিসাবে ধার নিয়েছি। আমি এতে মত দিচ্ছি যে আমার দুটি পৌত্র এন এবং এফকে কার্পেট বোনার কাজে দেওয়া হবে। এন ৯ টাকা পাবে এবং এফ ৭ টাকা পাবে। আমি প্রতি মাসে মজুরি নিয়ে আসব। আমি এই চুক্তি অমান্য করব না। যদি আমি চুক্তি ভঙ্গ করি তবে যে লোকের কাছ থেকে আমি টাকা ধার করেছি তাকে আমি সমস্ত টাকা ফেরৎ দিয়ে দেব।'[১]

আধুনিক শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের—শিশু ও নারী নির্বিশেষে কাজের সময়ের ক্ষেত্রে যে অমানুষিক শোষণ, চলত—উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে শুধু সেই বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। বলা চলে যে শ্রমিকরা এক আধা-দাসত্বের অবস্থায় কাজ করতে বাধ্য হত।

কিন্তু আধুনিক কারখানা ছাড়াও ভারতের চা বাগিচাগুলিতে শ্রমিকদের যেভাবে কাজ করতে হত তা ছিল আরো অমানুষিক। ভারতের বাগিচা শ্রমিকদের কাহিনী রক্ত ও মাংসের এক মর্মন্তুদ কাহিনী। এই সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম ফ্যাক্টরী আইন

ভারতবর্ষের শ্রম-আইনগুলির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু প্রথমযুগে ভারতের শ্রমিকদের অত্যাধিক পরিশ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ফ্যাক্টরী আইনের আবির্ভাব একটি প্রণিধান-যোগ্য ঘটনা। তেমনি ভারতের শ্রমিকদের শোষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যে সমস্ত শ্রম-আইন চালু করতে বাধ্য হয়েছিল সেগুলিকে উহ্য রাখলে ভারতীয় শ্রমিকদের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই সংশ্লিষ্ট শ্রম-আইনগুলির প্রয়োজনীয় আলোচনা অনিবার্যভাবেই কোন কোন ক্ষেত্রে এসে পড়ে।

শ্রম-আইনের উদ্দেশ্যই হল শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা এবং চাকুরীর অন্যান্য

১। Dewan Chamanlal, Coolie—The story of Labour & Capital in India Vol, I, 1932, p. 16

সর্তাবলী নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের প্রথম যুগে যে আইনগুলি পাশ হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান নয়। বরং মালিকদের জন্য একটা স্থায়ী শ্রমিক বাহিনী সৃষ্টি করাই ছিল এই আইনগুলির উদ্দেশ্য। আসাম প্ল্যান্টেশন লেবর ইমাইগ্রেশন এ্যাক্ট, দি ম্যাড্রাস প্ল্যান্টার্স লেবর এ্যাক্ট, দি মাস্টারস্ এণ্ড সার্ভেন্টস্ এ্যাক্ট, দি ওয়ার্কমেনস্ ব্রীচ অব কণ্টাক্ট এ্যাক্ট এবং সেই সময়ের আরও কয়েকটি আইনের উদ্দেশ্যই ছিল শ্রমিক সংগ্রহে এবং শ্রমিকশোষণে মালিককে সাহায্য করা। একদিকে চলত শ্রমিকদের দিয়ে দৈনিক ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা খাটানো, অপর দিকে এই সমস্ত আইনে এমন বিধান জুড়ে দেওয়া হয়েছিল যে এই অমানুষিক পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচার জন্য শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে দিলে তা হত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনকি ১৮৬০ সালের ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৪৯০ ও ৪৯২ ধারাতেও অনুরূপ বিধানই ছিল।

১৮৬০ সালে এমপ্লয়ার্স এণ্ড ওয়ার্কার্স (ডিসপিউটস্) এ্যাক্ট পাশ হয়েছিল। আইনটি প্রথমে বোম্বাই-এ পাশ হয় এবং পরে মধ্যপ্রদেশ এবং ভারতের অন্যত্র চালু হয়। এই আইনে বিধান ছিল যে কোন শ্রমিক মালিকের অবাধ্য হলে তাকে জরিমানা করা যাবে অথবা কয়েদ করা যাবে।

শ্রমিকরা চাকুরী ত্যাগ করলে তাদের জরিমানা করা হবে অথবা কয়েদ করা হবে—কোন শ্রম-আইনে এই বিধান থাকা আজকের দিনে কল্পনা করা খুবই দুরূহ। কিন্তু সেই যুগের পরিস্থিতিটাই ছিল অন্যরকম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তখন ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত। সস্তায় ভারতের শ্রমিক দিয়ে যথেচ্ছভাবে পরিশ্রম করিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিশেষ করে তখনও শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়নি। দাসত্বমূলক এবং দানবীয় এই বিধানগুলি তাই বুঝতে হবে সেই যুগের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ- ব্রিটিশ রাজশক্তিকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল। তখন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত শাসনকে আরো কঠোরতর করবার ব্যবস্থা করল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর আর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত রাখা সমীচীন বোধ করল না সাম্রাজ্যবাদীরা। তাই ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর সরাসরি ন্যস্ত হল। অপরদিকে মহাবিদ্রোহের পর ভারতে দেখা দিল ঘনঘন দুর্ভিক্ষ এবং

তার পরিণতিতে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ। গ্রামের নিঃস্ব কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে-শহরে এসে ভীড় করতে শুরু করল। ব্রিটিশ সরকারের আশঙ্কা হল নিঃস্ব এবং বিক্ষুব্ধ গ্রামের কৃষকদের শহরে আসবার ফলে শহরাঞ্চলে নানারূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে। ১৮৬০ সালে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের উদ্ভব এই পরিস্থিতিতেই হয়েছিল। এবং ঠিক একই আশঙ্কা ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এমপ্লয়ার্স এণ্ড ওয়ার্কার্স (ডিসপিউটস্) এ্যাক্টও পাশ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য একটাই – ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের কব্জাকে দৃঢ়তর করা।[১]

১৯৩১ সালে রয়্যাল কমিশন অন লেবর ইন ইণ্ডিয়া এই আইনটির প্রত্যাহার সুপারিশ করে। অবশ্য এর পূর্বেই আইনটি মৃত অবস্থায় এসে পৌছেছিল। ১৯৩২ সালে এন. এম. জোশী কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই আইনটি প্রত্যাহারের জন্য একটি বিল আনেন এবং আইনটি অবশেষে প্রত্যাহৃত হয়।

ঠিক একই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রথম ফ্যাক্টরী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতে সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ করে এবং নারী ও শিশু নির্বিশেষে যথেচ্ছভাবে তাদের দিয়ে পরিশ্রম করিয়ে ভারতের বস্ত্রকলগুলিতে যে উৎপাদন হত তার ফলে ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রকল মালিকরা এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর প্রথম শিল্পোন্নত দেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনই হচ্ছে সেই দেশ যেখানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রথম সংগঠিত হয়। প্রথমত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে ইংলণ্ডের শিল্প মালিকদের পক্ষে শ্রমিকদের দিয়ে এবং বিশেষ করে নারী ও শিশু শ্রমিকদের দিয়ে ভারতের ব্রিটিশ ও দেশী শিল্পপতিদের কায়দায় বর-রোচিত শোষণ করার কিছুটা অসুবিধা ছিল। দ্বিতীয়ত ভারতের মত সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত ভারতের বস্ত্রশিল্পের একটা ঐতিহ্যগত সুনামও ছিল। ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্প-পতিরা কিছুটা অসুবিধায় পড়েছিল। এবং ভবিষ্যতের জন্য তারা আশঙ্কিত

১। একজন সরকারী মুখপাত্র উদ্দেশ্যটাকে স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছিলেন। তার মতে 'At this stage the anxiety of the Government seems to have been the protection of the social system from the workmen, rather than to protect workmen from the social system, A Clow, The State and Industry, p 62,

হয়ে পড়েছিল। তাই তারা সোরগোল তুলে দিল যে ভারতে নির্মমভাবে নারী ও শিশুদের কারখানায় দীর্ঘ সময় ধরে কম মজুরিতে খাটানো হচ্ছে। তারা এই 'অমানবিক' পদ্ধতির অবসান দাবী করল। স্বার্থান্বেষীদের এই 'সোরগোলের পাশাপাশি কিছু সত্যিকারের মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ মানুষের আবেদনও এই সময় অবশ্য কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারত এবং ইংলণ্ড উভয় দেশ থেকেই এই মানবতাবাদীরা এই শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার চেষ্টা করেছিলেন।

বিষয়টা তখন ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সে উঠল এবং সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট বিষয়টি পেশ করা হল যাতে ভারতে কারখানাগুলির অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়। এই চাপের ফলে ১৮৭৫ সালে বোম্বাই সরকার বস্ত্রকলগুলির শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করবার জন্য একটা কমিশন নিয়োগ করেন। মজার কথা হল এই কমিশনের নয়জন সদস্যের মধ্যে সাতজনই ছিল মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। ফলে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে এই কমিশন শ্রমিকদের দুর্দশাকে খাটো করে দেখবার চেষ্টা করবে। বাস্তবে হয়েছিলও তাই এবং বোম্বাই সরকার সেই কমিশনের রিপোর্টের অজুহাত দিয়ে শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃত হল।

এই সময় বোম্বাই-এর সোরাবজী সাপুরজী বেঙ্গলী, সি, বি, ই প্রমুখরা মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কারখানায় শিশু শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় মিঃ বেঙ্গলী শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করে আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করলেন এবং ১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে খসড়াটি বোম্বাই সরকারের নিকট পেশ করলেন। তাতেও কোন ফল না হওয়ায় মিঃ বেঙ্গলী ম্যাঞ্চেস্টারের মিঃ জন ক্রফ্‌ট-এর কাছে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন যাতে 'ইংরেজ সাহেবদের প্রভাব খাটিয়ে এই ব্যাপারে কিছু করা যায় কারণ শাসকশ্রেণীর উপর এদের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী।' পরবর্তীকালে চিঠিটি এবং বিলের খসড়াটি লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এরপর এই সম্পর্কে কয়েকটি চিঠিও 'টাইমসের' সাম্পাদকীয় কলমে ছাপা হয়। এই চিঠিগুলিতে ভারতের শিল্পগুলিতে কি অমানুষিকভাবে ৫,৬ বৎসরের শিশুদের খাটানো হয়, কিভাবে নারী শ্রমিকরা স্তন্যপানরত শিশুদের নিয়ে কারখানায় পরিশ্রম

করে তার মর্মভেদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রচারের সঙ্গে ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পপতিদের স্বার্থ যুক্ত হল এবং তারাও তাঁদের ব্যবসায়ের স্বার্থে এই ব্যাপারে সোচ্চার হলেন এবং ভারতের বস্ত্রকলগুলিতে শ্রমিকদের কাজের সময় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন পাশের দাবি করলেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট পাশ হল। এই আইনে ৭ বৎসরের নীচে শিশুদের কারখানায় নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হল এবং ৭ থেকে ১২ বৎসর বয়স্ক শিশুদের দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হল।

অমানুষিক অবস্থা অব্যাহত

কিন্তু প্রথম ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট পাশ হওয়া সত্বেও শ্রমিকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না। এই ফ্যাক্টরী আইনের বিধানগুলি চালু করবার দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হয়েছিল তারা প্রায় সবাই ছিল মালিকদেরই প্রতিনিধি।

এই আইন পাশ হয়েছিল ১৮৮১ সালে, অথচ ১৯০৮ সালেও দেখা গেল ৭ বৎসরের নীচে শিশুদের বিভিন্ন কারখানায় যথেচ্ছভাবে খাটানো হচ্ছে। ১৯০৮ সালে যে ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন বসানো হয়েছিল এই সম্পর্কে তার তদন্তের রিপোর্টের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক নিম্নমজুরি এবং অমানুষিকভাবে দীর্ঘসময়ের পরিশ্রমই শুধু নয় শ্রমিকদের আবাস এবং জীবনধারণের অন্যান্য দিকের অবস্থাও ছিল শোচনীয়তম। সরকার নিযুক্ত কমিটিগুলিও এই শোচনীয় অবস্থাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। টেক্সটাইল ফ্যাক্টরীজ লেবার কমিটি শ্রমিকদের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্টে বলেন,

'অবস্থাটাকে একমাত্র শোচনীয়ই বলা চলে। পরিবারের লোকজনসহ বাস করবার জন্য যে সামান্য জায়গাটুকু পেলে ভারতীয় শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হয় সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে শ্রমিকদের ঘরগুলি ছিল স্পষ্টতই অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে এবং বাতাসহীন। ঘরগুলিতে গাদাগাদি করে মানুষ থাকত...... ঘরগুলির চারপাশে ছিল নোংরা জল ও ময়লা বহন করবার জন্য সরু নালা, এই নালাগুলির দুর্গন্ধ সমস্ত অঞ্চলটাকে ছেয়ে ফেলেছিল। ...যদিও সবদিক

দিয়ে ঠিক একই রকম নয় তাহলেও অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থাই লক্ষ্য করা গেছে।'[১]

ফ্যাক্টরী আইন পাশ হওয়ার পঞ্চাশ বৎসর পরও ভারতীয় শ্রমিকদের চাকুরীগত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়ই ছিল। ১৯৩১ সালে রয়াল কমিশন অন লেবর ইন ইণ্ডিয়ার নিজস্ব তদন্ত রিপোর্টেই এই বিপজ্জনক অবস্থার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলেই শ্রমিকদের অন্তত দুই তৃতীয়াংশ ঋণে জর্জরিত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঋণের পরিমাণ শ্রমিকদের তিনমাসের বেতনের মোট পরিমাণের চেয়েও বেশি। শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, বোম্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে যারা বেশি মজুরি পায় তাদের গড় মাসিক মজুরি ৩৭ টাকা, নারী শ্রমিকদের মাসিক ১৭ টাকা, বোম্বাইয়ের অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি মাসিক ২০ টাকা। ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিকেব গড় মজুরি পুরুষদের মাসে ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা। অন্যান্য কিছু কিছু কারখানায় যেখানে সারা বৎসর কাজ হয় না সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫ আনা থেকে ১০ আনা, নারী শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ৪ আনা থেকে ৮ আনা।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ৮ আনা, নারী শ্রমিকদেব মজুরি দৈনিক ৫ আনা এবং শিশুদের ৪ আনারও কম। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে পুরুষ শ্রমিকদের বেতন দৈনিক চার আনা। কমিশনের রিপোর্টে আরো বলা হল যে ভারতের অধিকাংশ শ্রমিকই এমন সব কারখানায় কাজ করেন যেখানে কোন আইন কানুনের নিয়ন্ত্রণ নেই। এই কারখানাগুলির "কোন কোনটাতে দেখা যাবে যে মাত্র ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুরা প্রায়শই দৈনিক ১০/১২ ঘণ্টা ধরে কাজ করে চলেছে এবং এদের খাদ্য গ্রহণ করবার জন্যও কোন ফুরসত নেই। এদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ছোট শিশু তাদের মজুরি দৈনিক মাত্র ২ আনা।"[২]

শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থাও ছিল অতীব জঘন্য। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রমিকরা পরিবার পরিজন সহ গড়ে একখানা ঘরও বসবাসের জন্য পেত

১। **Report of the Textile Factories Labour Committee, London, 1907, p. 15.**

২। **Report of the Royal Commission on Labour in India, 1931 p. 224.**

না। ১৯১১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় যে বোম্বাই-এর জনসংখ্যার শতকরা ৬৯ জন এক কামরা বিশিষ্ট বাসস্থানে বাস করত, অর্থাৎ গড়ে ৪½ জন মানুষকে এক-সঙ্গে একটা ঘরে বাস করতে হত। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় বোম্বাই এর শতকরা ৭৪ জন মানুষ এক কামরা বিশিষ্ট ঘরে বাস করে। দুই দশকের মধ্যে অবস্থার কি ধরনের অবনতি ঘটেছে এ থেকে তা বোঝা যায়। সেন্সাসে আরও দেখা যায় যে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ গড়ে মোট ৫ জন করে একসঙ্গে একঘরে বাস করে, ২,৫৬,৩৭৯ জন মানুষ গড়ে ৬ থেকে ৯ জন করে এক ঘরে বাস করে, ৮,১৩৩ জন মানুষ গড়ে ১০ থেকে ১৯ জন করে এক ঘরে বাস করে এবং ১৫,৪৯০ জন মানুষ গড়ে ২০ জনের বেশী এক ঘরে বাস করে। সমগ্র জন-সংখ্যা থেকে শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থানের অবস্থা পৃথক ভাবে বিবেচনা করলে আরো ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে।

সেন্সাসে বোম্বাই-এর নাগরিকদের বাসস্থানের সে পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বোম্বাই-এর শ্রমিকরা যে অধিকতর খাবাপ পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হত তা শুধু বোম্বাই এর একক বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য শিল্পাঞ্চল, কলকাতা, কানপুর, হাওড়া ইত্যাদি অঞ্চলেও একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। শিবরাও তাঁর "দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কাস ইন ইণ্ডিয়া" পুস্তকে হাওড়া ও কলকাতার শহরতলীতে চটকল শ্রমিকদের বস্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নরক বর্ণনা বিশেষ।[১]

১। শিবরাও বলেছেন"Nothing can equal, for squalor and filth and stench, the bustees (worker's quarters) in Howrah and the subarbs north of Calcutta······The great majority of the workers in the jute mills are compelled to live in private bustees under the Bengal Municipalities Act. The duty of improving the slum areas is cast on the owners who make very handsome incomes from the poor occupants. But vested interests see to it that these powers under the Act are never brought into operation. It would be impossible to describe the condition of these bustees—'filthy disease-ridden hovels, as they have been called, with no windows, chimneys or fireplaces, and the doorways so low that one has to bend almost on one's knees to enter. There is neither light nor

শুধু মজুরি বা বাসস্থানের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই শ্রমিকদের ছিল না। স্বাস্থ্য, বীমা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, অসুস্থতার জন্য ছুটি ইত্যাদির কোন সুযোগই শ্রমিকরা পায় নি। অবসর গ্রহণের পর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও ছিল না। আর বেকার ভাতা ইত্যাদির তো কোন প্রশ্নই নেই। বেকার ভাতা আজকের ভারতেও নেই। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বেকার ভাতা চালু করা হয়েছে। এক কথায় বলা চলে আধা-দাসত্বের পরিস্থিতিতেই শ্রমিকদের চাকুরী করতে হত এবং বসবাস ও জীবন-ধারণ করতে হত। এ-অবস্থা চলেছে বহুদিন, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও এই অবস্থা পুরোপুরি বজায় ছিল।

শ্রমিকদের কাজের ঘটার বাপারে আরো কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। একদিকে যেমন ল্যাংকাশায়ারের মিলমালিকরা ভারতীয় মিলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভয়ে ভারতের মিলগুলিতে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দাবি তুলেছিল তেমনি আবার ল্যাংকাশায়ারের পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ভারতের শিল্পপতিরা ভারতের শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা আরো বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য উপায়ে শোষণ তীব্রতর করেছিল। এর ফলে বিলেতের

water supply, and of course no sanitary arrangements Access to groups of bustees is usually along a narrow tunnel of filth, breeding almost throughout the year, but particularly during the rains, myrids of mosquitoes and flies......

"Condition in certain parts of Howrah, which is the second biggest municipality in Bengal, are even worse than in the northern subarbs of Calcutta." Shiva Rao, The Industrial Worker in India pp. 113-14.

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের কাছে একজন বিদেশীর সাক্ষ্য খুব প্রণিধানযোগ্য। সেই সাক্ষী বলেছিলেন, "Although I have witnessed a good deal of poverty in my walk through life and in many countries, and although I have read a great deal about poverty......I did not realise the poignancy and its utter wretchedness until I came to inspect the so-called homes of the poorer classes of Bombay......(see the labourer) in his home amongst his

পুঁজিপতিরা আবার শংকিত হয়ে পড়ল এবং ভারতের 'দাসদের' দুর্দশা লাঘবের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট দরবার শুরু করল। ভারত সরকার তখন ভারতের বস্ত্রকল শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্য ফ্রিয়ার স্মিথ কমিটি নিয়োগ করলেন এবং এই কমিটির রিপোর্ট ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হল।

কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের রিপোর্টের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। নতুনভাবে ভারতের শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ করার পরও যে অবস্থা দাঁড়ালো ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের রিপোর্টে তার চিত্র কিছুটা ধরা পড়ে। এই রিপোর্ট থেকে দেখা যায় তখনও তুলা থেকে বীজ ছাড়াইএর কারখানাগুলিতে ১৭ ঘণ্টা থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজ করানো হত। চালকল এবং ময়দাকলগুলিতে ২০ ঘণ্টা থেকে ২২ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হত। ছাপাখানাগুলিতে এক সপ্তাহ একটানা দৈনিক ২২ ঘণ্টা করে শ্রমিকদের কাজ করতে হত। ১৪ বৎসরের কম শিশুরা যতক্ষণ কারখানা চলত ততক্ষণ কাজ করতে বাধ্য হত। ১০ ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ দৈনিক করতেই হত। একেবারে বাচ্চাদের দুভাগে বিভক্ত করে সমস্ত কার্যকালীন সময়ে কাজ করানো হত।

---

family, and one instinctively asks oneself. Is this a human being or am I conjuring up some imaginary creature without a soul from the underworld ?

"In such a room—ten by ten feet—where there is hardly space to move, whole families sleep, breed, cook their food with the aid of pungent cow-dung cakes, and performs all the functions of family life, the common latrine alone being set apart. Some of the rooms so called in the upper stories of the older houses are often nothing more than holes beneath the slopin roof, in which man cannot stand upright, The rear rooms are usually dark and gloomy, and it is only at a closer inspection, when one's eyes have become accustomed to the gloom, that the occupants can be seen at all." A. E. Mirams, Evidence before the Indian Industrial Commission, puoted from India To-day, R. Palme Dutt, p. 36, 37.

এ পরিস্থিতি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য ছিল। কারণ এগুলি ব্রিটিশ সরকারের নিযুক্ত কমিশন বা কমিটিগুলির রিপোর্টেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়। ভারতে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ কাজের ঘণ্টা, অসম্ভব রকমের কম মজুরি, এককথায় অমানুষিক ধরনের শোষণ ভারতের প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় একইরূপ ছিল। কি ব্রিটিশ মালিকানাধীন কারখানা, কি ভারতীয় মালিকানাধীন কারখানা সর্বত্রই শ্রমিকদের মূলত একইভাবে শোষণ করা হত। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতের শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যে তথাকথিত ব্যবস্থাগুলি ঘোষণা করেছিল তা ছিল মূলত ভারতের বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অন্যান্য শিল্প যেমন ব্রিটিশ মালিকানাধীন চটকলগুলিতেও শোষণ ছিল বর্বরোচিত এবং যদিও ডাণ্ডীর চটকল মালিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের চটকল মালিকদের স্বার্থের সংঘর্ষও বিদ্যমান ছিল, তবুও চটকল শ্রমিকদের শোষণ নিয়ে ব্রিটেনে কোন সোরগোল হয়েছে বলে জানা যায় নি। ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রধানত বস্ত্রকলশিল্পেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশের বস্ত্রকলগুলির পুঁজিপতিদের স্বার্থের সংঘর্ষ ছিল খুবই সুস্পষ্ট। তাই দেখা গেল ল্যাংকাশায়ারের পুঁজিপতিরা ভারতের বস্ত্রশিল্পের দাস শ্রমিকদের জন্য সোরগোল শুরু করল। এবং ব্রিটিশ সরকারও বস্ত্রকল শ্রমিকদের চাকরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট পাশ করলেন। এখানেও সেই একই স্বার্থের খেলা প্রকট হয়ে পড়ল। ভারত ব্রিটেনের কলোনী অতএব ভারতে ব্রিটেন যা যা করবে সবই ঔপনিবেশিক স্বার্থেই করবে। ল্যাংকাশায়ারের পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল বোম্বাই-এর বস্ত্রকলশ্রমিকদের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ। এর সঙ্গে কোন মানবিকতাবোধের সম্পর্ক ছিল না, ছিল একমাত্র ঔপনিবেশিক স্বার্থ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতের দেশত্যাগী শ্রমিক ও বাগিচা শ্রমিক

দেশত্যাগী শ্রমিক

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের পর থেকে ভারতের ঐতিহ্যসম্পন্ন হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির ধ্বংস এবং পরিণামে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপের কথা আলোচিত হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের সময় ১৭৫৭ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি এবং সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮১ সালে হয়েছিল ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ। ফলে এক বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও ভূমিহীন অবস্থায় পৌছেছিল। ১৮৩০ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই ভূমিহীন কৃষকদের এক বিরাট অংশ ভারত ত্যাগ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য যায়। প্রকৃত পক্ষে ১৮৩০ সাল থেকেই এই যাত্রা শুরু হয় এবং ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যেই ১৭,০০০ ভারতীয় শ্রমিককে মরিশাস ইত্যাদি দ্বীপে রপ্তানী করা হয়। এইভাবে দলে দলে দেশত্যাগের মধ্য দিয়েই বলা যেতে পারে যে ভারতীয় ভূমিহীন কৃষকরা সর্বপ্রথম সংগঠিত শিল্পে স্থানান্তরিত হয়।[1]

মরিশাস, ব্রিটিশ গায়েনা, ত্রিনিদাদ এবং জ্যামাইকা দ্বীপগুলি চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। দ্বীপগুলির আখের বাগিচাগুলিতে এবং চিনি উৎপাদন শিল্পে ক্রীতদাসদের দিয়ে কাজ করানো হ'ত। কিন্তু ক্রীতদাসপ্রথা বিলোপের পর মুক্ত দাসশ্রমিকরা কার্যত ঐ ধরনের কাজ করতে অস্বীকার করে। এটা ছিল তাদের বৎসরের পর বৎসর ধরে অমানুষিক দাসশ্রমের প্রতিবাদ। ফলে ঐসব দ্বীপে শ্রমিকের প্রচণ্ড অভাব সৃষ্টি হয় এবং চিনিশিল্প এক প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন হয়। তখন চিনি মালিকেরা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সহায়তায় ভারত থেকে ভূমিহীন

১। Dr. Radhakamal Mukherjee, The Indian Working Class, p. I.

নিঃস্ব কৃষকদের ঐ সমস্ত দ্বীপে শ্রমিক হিসাবে আমদানী করে। যদিও শুনসে আশ্চর্য বোধ হতে পারে যে দাসপ্রথা চালু থাকার কালে মরিশাস দ্বীপে যে ক্রীতদাসদের আমদানী করা হত চিনিশিল্পে কাজ করবার জন্য, তা শুধু আফ্রিকা ইত্যাদি স্থান থেকেই আনা হত না—বাংলা থেকেও ক্রীতদাসদের মরিশাসে নিয়ে যাওয়া হত।

যাই হোক, ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের পরও ভারত থেকে যে শ্রমিকদের সংগ্রহ করে এইসব দ্বীপে চালান দেওয়া হত সে শ্রমিকেরা আদৌ স্বাধীন শ্রমিক ছিল না। অর্থাৎ তাদের শ্রম বিক্রয় করা বা না করার ব্যাপারে তাদের পুরোপুরি স্বাধীনতা ছিল না। এরা ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। এই 'চুক্তিবদ্ধ' প্রথাকে দাসপ্রথাও বলা যেত না আবার স্বাধীনতাও বলা যেত না। চুক্তিবদ্ধ প্রথাটি আসলে ছিল দাসত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যবর্তী। শ্রমিকরা সাধারণত পাঁচ-বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। চিনিশিল্পের মালিকরা শ্রমিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করত এবং মজুরি দিত। এই মজুরির পরিমাণ সাধারণভাবে মাসিক ৫ টাকা হিসাবে ছিল।

এই শ্রমিকদের সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি ছিল ভয়াবহ। ইউরোপীয় মালিকরা ভারতীয় সমাজের কিছু দাগী প্রকৃতির লোককে নিয়োগ করত গ্রামাঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্য। এই লোকদের বলা হত 'আড়কাঠি'। এই আড়কাঠিরা নানারকম মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গ্রামের বেকার, ভূমিহীন, অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন শ্রমজীবী মানুষদের ভারতের বাইরে যাবার জন্য প্রলোভিত করত। তারপর এদের দিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে—প্রধানত কলকাতায় এবং তৎসহ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভারতের ফরাসী বন্দর সমূহে নিয়ে আসা হত। এই বন্দরগুলিতে এদের কিছুদিন সশস্ত্র প্রহরায় গুদামজাত করে রেখে যথা সময়ে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। পরবর্তী-কালে শুধু চিনি উৎপাদনের দ্বীপগুলিতেই নয় অন্যান্য স্থানেও এদের প্রেরণ করা হত।

প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৭০ সালের মধ্যেই প্রায় সাড়ে পাঁচলক্ষ ভারতীয় শ্রমিককে ভারতের বাইরে প্রেরণ করা হয়। এদের সংগ্রহ করা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এবং এদের মধ্যে নারী, পুরুষ, শিশু সবরকম শ্রমিকই ছিল। ১৮৪২ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভারতের বাইরে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।[১]

১। Dr. Panchanan Saha, Emigration of Indian Labour, p, 32.

তালিকা নং ১১

উপনিবেশ	পুরুষ	নারী	শিশু	মোট সংখ্যা
মরিশাস	২,৪৩,৮৫৩	৬৩,৪৫৯	৪৪,০৮৯	৩,৫১ ৪০১
ব্রিটিশ গায়েনা	৫৩,৩২৩	১৬,৯৮৩	৯,৩৮৫	৭৯,৬৯১
ত্রিনিদাদ	২৮,০৩০	৯,২৮০	৫,২০৯	৪২,৫১৯
জ্যামাইকা	১০,১৬৯	৩,২৩৩	১,৯১৪	১৫,১৬৯
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্যান্য ছোট দ্বীপ সমূহ				৭,০২১
ফরাসী উপনিবেশ সমূহ				৩১,৩৪৬
দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল				৬,৪৪৮
			সর্বমোট	৫,৩৩,৫৯৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ৭,০০,০০০ ভারতীয় শ্রমিককে এভাবে ভারতের বাইরে চালান দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত চলে যদিও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় শ্রমিককে ভারতের বাইরে রপ্তানী খুবই হ্রাস পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে এই ধরনের শ্রমিক সংগ্রহের জন্য সারা ভারতে বহু কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। এক কেন্দ্রের সঙ্গে অপর কেন্দ্রের শ্রমিক সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা তীব্র হয় এবং ফলে শ্রমিকরা জঘন্য ধরনের মিথ্যাচার ও প্রতারণার শিকার হয়। বহুক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে তাদের সংগ্রহের ডিপোগুলিতে নিয়ে আসা হত এবং সেখান থেকে কলকাতার এবং অন্যান্য মূল ডিপোতে শ্রমিকদের নিয়ে এসে শ্রমিকদের অজ্ঞতার সুযোগে দাসত্বমূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে এদের বিদেশে রপ্তানী করা হত। এর মধ্য দিয়ে আড়কাঠিরা এবং শ্রমিক সংগ্রহের বিষয়ে লিপ্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করত।

শ্রমিক সংগ্রহের হীন কৌশলগুলি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিলে অবস্থাটা পরিষ্কার হবে। হরি বিশওয়াল নামে একজন কুলি তার সাক্ষ্যে বলছে :

"আমি কটকের অধিবাসী। আমরা চারজন চাকুরী সংগ্রহের আশায় কলকাতায় আসছিলাম। পথে বালাসোরে আমরা একটা সরাইখানায় উঠেছিলাম। ঐ একইস্থানে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একজন তকমাধারী লোকও ছিল। পরদিন সকালে যখন আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম তখন সেই তকমাধারী চাপরাশীটি

আমাদের সঙ্গে রাস্তায় এল এবং কথাবার্তা শুরু করল। কথায় কথায় সে বলল যে যদি আমরা তার সঙ্গে কলকাতায় যাই তবে সে কলকাতায় আমাদের চাকরী জোগাড় করে দেবে। সে বলল আমাকে মরিশাসে ১০ টাকা বেতনে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দেবে। সে আরও বলল যে মরিশাস কলকাতা থেকে মাত্র ৪ দিনের রাস্তা এবং আমি যখন ইচ্ছা তখন চাকরী ছেড়েও দিতে পারি।

"আমি লোকটির কথায় বিশ্বাস করে চাকরী গ্রহণ করতে রাজী হ'লাম এবং কলকাতায় এলাম। আমার অন্যান্য সঙ্গীরাও তাই করল। রাস্তায় সে আমাদের নীরব থাকতে বলল এবং আরও বলল যে আমরা কোথায় যাচ্ছি তা' যেন কোন অপরিচিত লোককে না বলি। কলকাতায় পৌছানোর পরে শহরের উত্তর দিকে একটা ঘরের মধ্যে আমাদের সবাইকে রেখে দেওয়া হ'ল। আমরা যাতে বাইরে যেতে না পারি তার জন্য দু তিন জন লোক দরজায় পাহারা দিতে লাগল। কোন অবস্থাতেই আমাদের বাইরে যেতে দেওয়া হয় নি। যদিও কোন সময় তা দেওয়া হয়েছে তা ওদের পাহারাতেই দেওয়া হয়েছে।

"প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমাদের ব্যাংকশালে এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হল যে ঐ ভদ্রলোকের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই যেন আমরা হ্যাঁ বলি। ভদ্রলোকের কাছে যাওয়ার পর তার প্রতিটি প্রশ্নেরই আমি ইতিবাচক উত্তর দিলাম এবং মরিশাসে যেতে রাজী হলাম। যদিও তখনও আমি জানতাম না মরিশাস কোথায় বা কি ধরনের স্থান এবং এও জানতাম না যে ওখানে জাহাজে করে যেতে হবে

"তারপর আমি ওদের কাছ থেকে কিছু জামাকাপড়, একটা টুপি, একটা কম্বল, কিছু পিতলের বাসন এবং ছয় টাকা নগদ পেলাম। ঐ টাকা থেকে চার টাকা দফাদারের লোকজনরা নিয়ে নিল। এক টাকা দিয়ে আমার জন্য একটা বাক্স ক্রয় করা হল এবং বাকী এক টাকা দিয়ে ওরা মিষ্টি ইত্যাদি ক্রয় করল। এর পর ওরা আমাদের একটা ডিঙ্গি নৌকায় চড়িয়ে দিল। আমি প্রতিবাদ করে বললাম যে আমাকে বলা হয়েছিল মরিশাসে জলপথে যেতে হবে না। তখন ওরা বলল যে আমাদের শুধু নদীটা পার হতে হবে। কিন্তু আসলে আমদের আরও অনেক লোকের সঙ্গে মাঝনদীতে একটা জাহাজে উঠিয়ে দেওয়া হল।"[১]

এভাবেই সমস্ত নিয়ম কানুনকে উপেক্ষা করে আড়কাঠিরা শ্রমিক সংগ্রহ করত।

১। Ibid, pp, 89,90

সাধারণ অজ্ঞ গ্রাম্য মানুষদের এই রকম প্রতারিত করে জাহাজে তোলার পর কি অবস্থা এদের হত সেই সম্বন্ধেও বাস্তব তথ্য পাওয়া যায়। শ্রমিকদের সংগ্রহ ও বিদেশে প্রেরণের ব্যাপারে যে সব মারাত্মক অপরাধজনক পন্থাব আশ্রয় নেওয়া হত সেই সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৮৩৮ সালে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। সেই কমিটি যে সব সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল তার থেকে দুই একটি তথ্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে।[১]

"ক্যাপ্টেন জেমস র‍্যাপসনের সাক্ষ্য (সোফিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন):

প্রশ্ন: সোফিয়া জাহাজে কি খুব বেশী রকমের ভীড় হয়েছিল? আপনার মত কি?

উত্তর: আমাব মতে সাধারণ ভাবে খুব বেশী লোক নেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করি ৩০০ লোক নিলেই যথেষ্ট হত...... (প্রকৃত পক্ষে এই জাহাজে ৩৬৬ জন শ্রমিক নেওয়া হয়েছিল, ফলে ১ জন জলে পড়ে মারা যায় এবং ৮ জন জাহাজের মধ্যে মারা যায়)।

ক্যাপ্টেন এ. জি ম্যাকেঞ্জীব সাক্ষ্য (আরেকটি জাহাজের ক্যাপ্টেন)

প্রশ্ন: শ্রমিকদের কতবাব খেতে দেওয়া হত?

উত্তব: তাদেব একবার খেতে দেওয়া হত।

প্রশ্ন: আপনি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন মরিশাসে কুলিদের সঙ্গে কিবকম ব্যবহার করা হত?

উত্তর: আমি শুনেছি ওদেব সঙ্গে সেখানে খুব দুর্ব্যবহার করা হত...ওদের পুরো বেতন দেওয়া হত না। একজন লোক আমার কাছে অভিযোগ কবেছে, সে ওখানে ১৮ মাস ছিল কিন্তু এক ফার্দিং বেতনও পায় নি..."

এ কেবল দুই একটি সাক্ষের উদ্ধৃতি। কিন্তু এই থেকেই কুলিদের উপর নির্যাতন ও প্রতারণার নিদারুণ ছবিটি ফুটে ওঠে। ইউরোপীয় বাগিচা মালিকরা এবং তথাকথিত কুলি ব্যবসায়ীরা এই বর্বর কায়দাতেই ভারতের সাধারণ মানুষদের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ চালাত।

এই নির্মম শোষণ ভারতীয় জনগনের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ইংলণ্ডেও বহুমানুষের মনে এই অমানুষিকতা অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।

১। Correspondence between the Government of India and court of Directors relating to the Hill coolies—*Committee Appointed to Inquire into the Abuses Alleged to Exist in the Exportation of Hill Coolies.* 1838. pp 17-26.

১৮৩৮ সালের ১৫ই জুনে বম্বে গেজেটে লেখা হয় "..... চাকরী দেবার লোভ দেখিয়ে এই হতভাগ্য মানুষগুলিকে ধূর্ত আড়কাঠিয়া ঘর থেকে বের করে নেয়। জাহাজে করে এদের গন্তব্যস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই মুহূর্ত থেকেই তারা তাদের প্রভুর কর্তৃত্ব চলে যায়। এ যেন দাসত্বের থেকেও বেশী। তাদের এমন উপনিবেশে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে দাসত্ব বিলুপ্ত হয়েছে অথচ সেখানে এরাই ক্রীতদাসে পরিণত হয়।"[১]

পত্রিকায় এই ধরনের প্রতিবাদমূলক লেখা ছাড়াও কলকাতা শহরের নাগরিকরা সভ্য করে শ্রমিক সংগ্রহের এই জঘন্য পদ্ধতির নিন্দা করেন। ১৮৩৮ সালের ১০ই জুলাই কলকাতায় নাগরিকদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, "সভা এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে যে পাহাড়ী কুলী এবং অন্যান্য ভারতীয়রা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তা তারা বোঝেও না এবং তাদের তা বোঝার ক্ষমতাও নেই..... "[২]

প্রতারিত কুলিদের জাহাজে তুলে বিভিন্ন উপনিবেশে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের আরও বেশী করে প্রতারিত করা হত। জাহাজে তোলার পর কি ঘটনা ঘটত এক সাক্ষীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার কিছুটা আভাষ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জাহাজে তোলার পর' থেকেই এদের সঙ্গে ক্রীতদাস বা জন্তু জানোয়ারের মত ব্যবহার করা হোত। সাধারণত অতি বোঝাই মালজাহাজে এরা যেত এবং পথে কোন চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকত না। ফলে বহু শ্রমিক যাত্রাপথে জাহাজেই প্রাণ হারাত। উপনিবেশগুলিতে নিয়ে যাওয়ার পরও জীবনধারণ করত শোচনীয় অবস্থায়।

সম্পূর্ণ অবসন্ন এবং পর্যুদস্ত অবস্থায় এরা যখন উপনিবেশগুলিতে পৌছাত তখন ঐ অপরিচিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে আরেকটি অগ্নিপরীক্ষা স্বরূপ ছিল। পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কোন সুযোগ কুলিদের না দিয়েই তাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হত। ফলে কাজে যোগ দেওয়ার পর এদের দেহ এবং মন আরো ভেঙ্গে পড়ত।

এদের দৈনিক কাজের সময় ছিল ১২ ঘণ্টা থেকে ১৩ ঘণ্টা।

এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে সমসাময়িক কাজে বোম্বাই ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়। কলকাতার সন্নিকটবর্ত

১। Bengal Hurkaru, 30 June 1838

২। Bengal Hurkaru, 11 July 1838

অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার এই প্রথার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে লেখা হয়। বিদেশে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যখন ভারত সরকার বিল আনেন তখন 'সোমপ্রকাশে' লেখা হয় :[৩]

"যৎকালে আসামের মজুরদিগের দুরবস্থার বিষয় প্রথম প্রকাশিত হয়, তৎকালে চট্টগ্রাম অবধি পেসোয়ার পর্যন্ত ভারতবর্ষের যাবতীয় লোক যারপরনাই রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মজুরদিগকে ক্ষুদ্র নৌকা ও জাহাজে করিয়া চাউল ও ডাইলের বস্তার ন্যায় লইয়া যাওয়া হইত; তাহারা উত্তম আহার দ্রব্য পাইত না; অনেকে পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিত এবং তাহাদিগের অধিকাংশ কোথায় যাইতে হইতেছে জানিতে পারিত না; সেজন্য বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৮৬৩ অব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ করেন! উহার বিধান অন্য অনেক আইনের ন্যায় বিফল হয় নাই। উহার দ্বারা মজুরদিগের অনেক কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু আজিও সকল স্থানের মজুরের কষ্ট সম্যকরূপে নিবারিত হয় নাই। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, রিউনিয়ন প্রভৃতি উপনিবেশে যে সমস্ত মজুর প্রেরিত হয়, তাহাদিগেরও সম্প্রতি অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে। এতদিন ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশে যত মজুর প্রেরিত হইয়াছে সে সমুদায়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র আইন করিতে হইয়াছিল, মেইন সাহেব সম্প্রতি এতৎসংক্রান্ত একটি সাধারণ আইন প্রস্তাব করিয়াছেন।......

"গবর্নমেণ্টের এই উদ্যোগ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, দুই বৎসরের মধ্যে কেবল ফরাসী গায়েনা ও রিউনিয়ন দ্বীপে প্রায় ১২০০০ মজুর প্রেরিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ লোক ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছে। ইহাদিগের অনেকে পথেই প্রাণত্যাগ করে। যাহারা পথিমধ্যে বহুতর কষ্ট ভোগ করিয়া পরিশেষে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে অনেকস্থলে ক্রীতদাসের ন্যায় থাকিতে হয়। তাহাদিগের দুর্দশা বৃত্তান্ত শুনিয়াও উদাসীন হইয়া থাকতে

৩। সোমপ্রকাশ, ২৭শে আশ্বিন, ১২৭০, ইং ১২ই অক্টোবর ১৮৬৩। এই বাংলা সাপ্তাহিক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর (১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৫) তারিখে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। পত্রিকাটির পরিকল্পনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রথম থেকেই পত্রিকাটিতে রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

কেবল নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষে বিস্তর লোকের বসতি আছে। এখানে আর মজুরদের জীবিকার সংস্থান হয় না। অতএব জীবিকার অর্জনার্থ বা তাহাদিগকে দেশান্তরে প্রেরণ করা উচিত, এ বলিয়া আমরা বিদেশে মজুর প্রেরণের বিলের সহায়তা করিতেছি না। আমাদিগের দেশের যে প্রকার আয়তন তাহাতে বিংশতি কোটি লোক পর্যাপ্ত নহে, অনায়াসে ৫০ কোটি লোকের স্বচ্ছন্দে বাস চলে।'

সাধারণত সকাল ৪টা অথবা ৫টায় কাজ শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কাজ চলত। অবশ্য অন্যান্য পদ্ধতিতেও কাজ চলত। আখের ক্ষেতে বা চিনি কলে কাজ ছিল কষ্টসাধ্য এবং একঘেয়ে। ফলে এদের দৈনিক কাজ শেষ করতে অনেক রাত্রি হয়ে যেত এবং বেশী রাত্রে বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় পরদিন ভোরে অবসন্ন দেহ এবং ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এরা কাজে যেত। ক্রীতদাস-প্রথার ন্যায় মালিকের সহচররা কাজ চলাকালীন শ্রমিকদের উপর কঠোর নজর রাখত। রবিবার দিনও এদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করতে হত। নিয়ম অনুযায়ী রবিবারের কাজ স্বল্পকালীন হওয়ার কথা কিন্তু এই নিয়ম সাধারণ ভাবে কখনই গ্রাহ্য করা হত না। কোন কোন উপনিবেশে এমনকি দৈনিক ১৮ ঘণ্টার বেশী শ্রমিকদের কাজ করতে হত। এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে এই ভারতীয় কুলিদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক।

চুক্তি অনুযায়ী এদের মালিকের কাছ থেকে ৫ টাকা বেতন এবং তৎসহ বাস-স্থান, চিকিৎসা, নির্দিষ্ট দরে রেশন ইত্যাদি প্রাপ্য ছিল। প্রথম দিকে কুলিদের চুক্তি অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হত না। মালিকের মর্জির উপর অনেক ক্ষেত্রেই এদের মজুরি পাওয়া নির্ভর করত। খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদিও চুক্তি অনুযায়ী এরা বহু ক্ষেত্রেই পেত না। অসুস্থ হলেও অসুস্থকালীন সময়ের জন্য এদের কোন মজুরি দেওয়া হত না। কুলিদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মালিকরা এদের মজুরি এবং অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে নির্মমভাবে ঠকিয়ে শোষণ করত।

বাগিচা মালিকরা, এই শ্রমিকদের বাগিচার বাইরে আনতে অনুমতি দিত না। মালিকদের ভয় ছিল পাছে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়। দাসপ্রথাকালে নিগ্রো দাসদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হত ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও মালিকরা সেই ব্যবহারই করত। কোন শ্রমিক অবাধ্য হলে তাকে বেত মারা হত এবং অসুস্থ ও পঙ্গু শ্রমিককে দিয়েও জবরদস্তি করে কাজ করানো হত।

কিন্তু এই অবস্থায় সবসময়েই যে ভারতীয় শ্রমিকরা মালিকদের আনুগত্য

স্বীকার করে চলেছিল তা নয়। কোন কোন সময় যে এরা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল তার কিছু কিছু তথ্যও পাওয়া যায়। এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ব্রিটিশ গায়েনার একটি বাগিচা ডেভনশায়ারে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয় এবং মিছিল করে জর্জটাউনে কর্তৃপক্ষের নিকট রওনা দিয়েছিল তাদের অভিযোগ পেশ করবার জন্য। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেয় এবং পুলিশের গুলি চালনায় ৫ জন শ্রমিক নিহত হয়, ৯ জন আহত হয় এবং বহু শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় শ্রমিকরা নিগ্রোদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হয় নি। ফলে মালিকরা খুব সহজেই ভারতীয় শ্রমিক ও নিগ্রোদের এককে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিল।[১]

দেশত্যাগী এই ভারতীয় শ্রমিকদের শোষণ, নির্যাতন ও জীবন সংগ্রামকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী আলেখ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

বাগিচা শ্রমিক

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারতের বাগিচা শিল্পের সৃষ্টি হতে শুরু করে। বাগিচা শিল্পের মধ্যে ভারতে চা শিল্পই প্রধান এবং ১৮৫১ সাল থেকে ভারতে চা উৎপাদন আরম্ভ হয়। ১৮৫৯ সালে চা শিল্প বেশ ফুলে ফেঁপে উঠে কিন্তু অনতিবিলম্বেই আবার ভাঁটা পড়ে। ১৮৬৯ সাল থেকে বলা যেতে পারে চা শিল্প ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বৃত্ত ক্ষেত মজুরের সৃষ্টি হয়েছিল তাদেরই একটা অংশ এই বাগিচা শিল্পে শ্রমিক হিসাবে যোগদান করে। এই শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি ছিল নিতান্তই বর্বরোচিত। বাগানের সর্দাররা স্থানীয় বিভিন্ন দালালের সাহায্যে শ্রমিক সংগ্রহ করত। চা শিল্পে আসামের স্থানই প্রধান। আসামের চা বাগান সমূহের জন্য বিহারের ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, তৎকালীন যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদি স্থান থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করা হত। ১৯০১ সালের আসাম লেবার এণ্ড ইমাইগ্রেশন এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর নিয়ম হয় যে এই সর্দারদের বাগানের কর্মচারী হতে হবে এবং স্থানীয় দালালদেরও শ্রমিক

১। Report of the Royal Commission on Labour in India 1931 p. 224.

সংগ্রহের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যদিও এর পূর্বেও ১৮৫৯ সাল থেকে বাগিচা শ্রমিকদের সম্পর্কিত আইন কানুন ছিল এবং ১৮৬৫ সালে সেই আইনকে সংশোধন করাও হয়েছিল। কিন্তু বাগিচা শ্রমিকদের সংগ্রহ করার পদ্ধতি প্রায় বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানীর প্রতারণামূলক পদ্ধতিরই অনুরূপ ছিল। ১৯০১ সালের আইনেও শ্রমিক সংগ্রহজনিত অপরাধমূলক কার্যকলাপকে রোধ করা যায়নি। বস্তুত এই আইন পাশ হওয়ার পরও চা বাগানের শ্রমিক সংগ্রহের পদ্ধতি দাস শ্রমিক সংগ্রহ করার মতোই ছিল। প্রথমত দালালেরা বিভিন্ন স্থান থেকে অজ্ঞ এবং নিঃস্ব গ্রামবাসীদের ভুল বুঝিয়ে এবং বিভ্রান্ত করে বাগানে আনত আবার এমন ঘটনা খুব বিরল ছিল না যে দালালরা বিভিন্ন স্থান থেকে পুরুষ, নারী ও শিশুদের জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করত। দ্বিতীয়ত ওয়ার্কমেনস্ ব্রীচ অব কন্ট্রাক্ট এ্যাক্ট এবং ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের কয়েকটি ধারা অনুযায়ী বাগানের মালিকদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে যদি শ্রমিকরা চুক্তিভঙ্গ করে বাগান থেকে চলে আসে তবে তা' শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে এবং বাগানের মালিকরা তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। পরিণামে চা বাগানের শ্রমিকদের জীবন প্রায় দাসত্বের জীবনেই পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯২৬ সালে এই আইনকানুনগুলির কিছুটা পরিবর্তনের ফলে বাগানের মালিকদের শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করা ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হয়েছে।

অন্যান্য যে বাগিচা শিল্পগুলি ভারতে রয়েছে তা' হল রবার ও কফি। দক্ষিণ ভারতেই এ শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত। কফি শিল্পে ১৯০৩ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮২,০০০। রবার শিল্পে সংখ্যা ছিল আরও কম। আসাম ও উত্তরবংগে চা শিল্পেই অধিকতর শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। আসামের চা বাগানে যে পদ্ধতিতে অন্যান্য রাজ্য থেকে শ্রমিক আমদানি করা হ'ত অন্য দুটি বাগিচা শিল্পে ঠিক সেই পদ্ধতিতে শ্রমিক সংগ্রহ করা হ'ত না।

১৮৯৫ সাল থেকে চা শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি পায়।[১]

তালিকা নং ১২

ভারতের চা শিল্পে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের সংখ্যা :

বৎসর	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১৮৯৫	৪,৫০,৯২৬	১,০২,৮৯৫	৫,৫৩,৮১১
১৯১৯	৯,০০,৬৯৫	৭২,৬৬০	৯,৭৩,৩৫৫
১৯২৮	৮,৩১,৪২৮	৭৫,৩৪৯	৯,০৬,৭৮৭

১। Dr. R. K. Das, Plantation Labour in India p. 18

১৯২৮ সালে এই ৯,০৬,৭৮৭ জন শ্রমিকের মধ্যে আসামের বাগানসমূহে কাজ করত ৫,৪৪,১৯৩ জন বাংলাদেশে ১,৮৫,৩৯৯ জন এবং বাকী শ্রমিকেরা দক্ষিণ ভারতে ও অন্যত্র কাজ করত।

এই বিরাট সংখ্যক চা শ্রমিকদের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ। ভারতের ঔপনিবেশিক শোষনের একটি অতি নগ্নচিত্র এই চা শ্রমিকদের জীবন কাহিনী : চা বাগান প্রতিষ্ঠার পর এর পুরা মালিকানাই ছিল বৃটিশ পুঁজিপতিদের। এই চা শ্রমিকদের বাগানে খাটিয়ে যেমন ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা প্রভুত মুনাফা অর্জন করত তেমনি এই শ্রমিকদের সংগ্রহ করাটাও ছিল একটা লাভজনক ব্যবসা। সর্দাররা এবং তাদের স্থানীয় দালালদের সংগ্রহ পদ্ধতি পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের উদগ্র মুনাফার আকাজ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সর্দার ও দালালেরা সরকারের চোখের সামনেই যে নোংরা পদ্ধতি অবলম্বন করত এদের সংগ্রহ করার জন্য তা একমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনেই সম্ভব। যেমন ব্রিটিশ মালিকরা বিবেচনা করত যে শ্রমিক সংগ্রহ করার সময় স্বামী ও স্ত্রীকে একসঙ্গে সংগ্রহ করতে পারলেই বাগানের বেশী মুনাফা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সর্দাররা এমন সব পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের স্বামী স্ত্রী হিসাবে সংগ্রহ করে আনত যারা আদৌ পরস্পর স্বামী স্ত্রী নয়। এদের নানারূপ মিথ্যা ছলনায় প্রতারিত করে বা কোন কোন সময় সুরাপানে বাহ্যিক জ্ঞান লুপ্ত করে এদের নিয়ে আসা হত। এ সব ঘটনা সরকারের বা ব্রিটিশ বাগিচা মালিকদের অজানা ছিল না।

এ-ভাবে সংগ্রহ করে চা বাগানে এদের কার্যত বন্দীশিবিরে রেখে যে মজুরি দেওয়া হ'ত তা' ছিল অত্যন্ত নীচুমানের। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এদের মজুরির যে হার ছিল তার একটা গড় হিসাব নীচে দেওয়া হল।[২]

তালিকা নং ১৩

	১৯৮০-১৪			১৯১৮-১৯		
	টাঃ	আঃ	পঃ	টাঃ	আঃ	পঃ
পুরুষ	৬	২	৩	৬	৫	৯
স্ত্রীলোক	৪	১	৫	৫	১	৫
শিশু	২	১৩	৭	৩	১	৫

শ্রমিকদের রেশন, বোনাস ও অন্যান্য ভাতার সমস্ত হিসাব ধরেই এই মজুরির পরিমাণ দাঁড়ায়।

১। Dr Radhakamal Mukherjee, The Indian Working Class p. 19

২। D. Chamanlal, Coole—The Story of Labour and Capital in India Vol. II p 18.

এই নিম্ন বেতনে এবং কার্যত বন্দী অবস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টারও কোন পরিমাপ ছিল না। ১৮৭০ সালের প্ল্যাণ্টেশন এ্যাক্টে নিয়ম করা হয়েছিল যে শ্রমিকরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দিনে ৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করবে। ঐ আইনে ১৬ বৎসরের কম শিশুদের শ্রমিক হিসাবে চুক্তিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। বাস্তবে আইনের এই কোন বিধানকেই গ্রাহ্য করা হ'ত না। শ্রমিকদের ৯ ঘণ্টার অনেক বেশী যথেচ্ছভাবে খাটানো হ'ত এবং তা' স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে। ১৬ বৎসরের নীচে শিশুদের এ আইনকে উপেক্ষা করেই ব্যাপক-হারে নিয়োগ করা হ'ত এবং তাদের দিয়েও দৈনিক ৯ ঘণ্টার অনেক বেশী পরিশ্রম করানো হ'ত। বিশেষত চা শ্রমিকদের মজুরি পিস-ওয়ার্কের ভিত্তিতে থাকায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে মালিকরা এদের দিয়ে যথেচ্ছভাবে খাটিয়ে নিত।

আসামের চা বাগিচায় শ্রমিকদের এই দাসত্বমূলক অবস্থা সম্বন্ধে দেওয়ান চমনলাল ভয়াবহ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কয়েকটি ঘটনা নীচে তুলে দেওয়া হ'ল।[১]

১৯২০ সালের ২৩শে জুলাই একজন নারীশ্রমিক তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ডেপুটি কমিশনারের নিকট ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করল। ফলে ম্যানেজার তার বিরুদ্ধে পালিয়ে যাবার অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা করল এবং স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করে ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল।

১৯২৮ সালের ১লা জুন ২০ জন কুলি ডেপুটি কমিশনারের কাছে জানালো যে তারা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জিলা থেকে এক বৎসরের চুক্তিতে এসেছে এবং চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়েছে। কিন্তু এদের এত কম বেতন দেওয়া হ'ত যে এদের খাদ্যই ঠিকমত জুটত না এবং এখন চুক্তি শেষে দেশে ফিরে যাবার মত প্রয়োজনীয় অর্থ নেই, অতএব আবেদন মালিকপক্ষ যেন এদের দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে। ফল দাঁড়ালো এই যে তাদের জানানো হলো যে তাদের চুক্তি এক বৎসরের নয় দুই বৎসরের। অতএব তাদের আরো ১১ মাস কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের সেইমত আরো ১১ মাস দাসত্বের জীবন যাপন করতে হ'ল। আসলে এইভাবেই প্রতারণা করে শ্রমিকদের শোষণ করা হ'ত। তারপর শ্রমিকরা পরিবার পরিজন-সহ শূন্য হস্তে ২০০০ মাইল দূরে তাদের দেশের দিকে রওনা হ'ল। পরবর্তী-

১। Ibid.

কালে সরকারী রিপোর্টে বলা হয় যে পরে এই কুলিদের ভাগ্যে কি ঘটল জানা যায় নি।

১৫ই আগষ্ট ১৯২৮, ভেরানা টিলাজা নামে একজন কুলি এক বাগান থেকে আর এক বাগানে যাচ্ছিল তখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে সে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লোক। কুলিটি বিচারের সময় বলল যে সে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নামই জানে না। কিন্তু তা সত্বেও তার ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

একটি বাগানের মধ্যে সখরুমণি নামে একজন নারী শ্রমিককে মালিক পিটিয়ে হত্যা করল। তারপর তদন্ত হ'ল এবং সরকারী রিপোর্টে বলা হ'ল "ইউরোপীয় বাগিচা মালিকের কোমল স্পর্শমাত্রেই" নারী শ্রমিকটির প্লীহা ফেটে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দুইজন প্রতিনিধি পার্সেল এবং হলস্‌ওয়ার্থ ১৯২৮ সালে ভারতে এসে ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন তাতে তাঁরা বলছেন "আমরা একদল নারী পুরুষ এবং শিশু শ্রমিককে কাজ করতে দেখলাম এবং আরো দেখলাম যে ঠিক তার ৫ গজ দূরেই মালিকের এক-জন সহকারী গর্বের সঙ্গে বেত ঘোরাচ্ছে। এর থেকেই চা শ্রমিকরা কত 'সন্তুষ্ট অবস্থায়' আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।" প্রতিনিধিদ্বয় তাঁদের রিপোর্টে বললেন "আসামের চা বাগিচাসমূহের কার্যত ক্রীতদাস শ্রমিকরা হচ্ছে সভ্য জগতের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য মানুষ"।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীতে শুধু নয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে চা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর থেকেই চা শ্রমিকদের উপরে যে নির্যাতন চলে সেই সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশে' ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সালেই 'সোমপ্রকাশ' কুলিদের উপর নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশ করে। 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে 'সোমপ্রকাশ' লিখছে,[১]।

"আমরা গতবারে কাছাড়ে গত যে ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু লিখিয়াছিলাম সে দিবস তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাদের নিকট আত্ম দুরবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।.........ঐ ব্যক্তির নাম রূপচাঁদ বিশ্বাস। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর ইহার বাসস্থান।.........তিনি (রূপচাঁদ) কহিলেন চা-করগণ কুলিদিগকে যৎপরো-নাস্তি প্রহার করিয়া থাকেন। কুলিদিগকে ১০।১২ টাকা বেতন প্রদানের কথা

১। সোমপ্রকাশ, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭০, ইং ১লা জুন, ১৮৬৩।

বলিয়া কাছাড়ে লইয়া যাওয়া হয়, বাস্তবিকপক্ষে শেষে তাহারা ২।১ টাকার অধিক পাইতে পারে না। কুলিদিগকে সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা অতিশয় কদর্য। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তাহা গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণেরও আহারযোগ্য নহে। অথচ এই আহারীয় দ্রব্যের নিমিত্তে কুলিদিগের বেতন হইতে মাসে মাসে দুই টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। কুলিদিগের বাসস্থানগুলিও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অস্বাস্থ্যকর। আহার ও বাসস্থানের ঈদৃশ অপকৃষ্টতা নিবন্ধন কুলিদিগের মধ্যে অনেকেই উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের যথোচিত চিকিৎসা করাও হয় না। যেমন পীড়া হয় অমনি পচিয়া গলিয়া মরিয়া যায়। চা-করগণ যে সকল অত্যাচার করেন, তাহার আর বিচার হইতে পারে না।

"কিছুদিন বিবিধ সংবাদপত্রে কাছাড়ের চা-করদিগের দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গ বিলক্ষণ আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন চা-করগণ একটুকু প্রশান্ত সাধুভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আবার দিন দিন অপেক্ষাকৃত অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিতেছেন।"

এছাড়া ১৮৬২ সালেই 'সোমপ্রকাশ' তীব্রভাষায় মন্তব্য করেছে, [১]

"আসামের চা-করেরা পূর্বে প্রত্যেক মজুরকে প্রতিমাসে ২॥० টাকা করিয়া বেতন দিতেন; ক্রমশ বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪॥० হয়। এক্ষণে পরিশ্রমের যে প্রকার মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে ৪॥० টাকা মাসিক বেতন অধিক নয়। এ বেতনে এখন মজুর পাওয়া যায় না।..........যাহারা অধিক বেতন পাইবার যোগ্য, তাহাদিগকে অল্প বেতন দিয়া বলপূর্বক খাটাইয়া লওয়া কি অত্যাচার নহে? ঢাকা প্রকাশের কাছাড়ে সংবাদদাতা এতদিন-চা—করদিগের অত্যাচারের বিষয়ে যে লিখিয়া আসিতেছেন তাহা কি মিথ্যা?..........
নীল প্রধান প্রদেশের কৃষকদের সহিত চা ক্ষেত্রের মজুরদের বহু প্রভেদ আছে। নীল প্রদেশের প্রজারা নীলকরদিগের অল্প ভূমির লোভে অধিককাল অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, চা ক্ষেতের মজুরদিগের অত্যাচার সহ্য করিবার যে কারণ নাই। কণ্ট্রাক্ট বিল বিধিবদ্ধ (দুঃখের বিষয় এই মেজর হপকিনস এই আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক বলেন) হইলেও চা-করদিগের অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। মজুরেরা কণ্ট্রাক্ট লইয়া কখনই অত্যাচার সহ্য করিবে না।

"আমরা চা-করদিগকে পুনর্বার সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন কখন নীলকরদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করেন। ল্যাণ্ড হোলডার্স সভা তাঁহাদিগকে ক্রমশ পথে আনিয়া দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন। চা-

১। সোমপ্রকাশ, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৯, ইং ৯ই জুন ১৮৬২।

করেরা যেন সাবধান হন, তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস না করেন। তাঁহারা যদি আর কিছুকাল নীলকরগণের ন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে।"

এই সময় সোমপ্রকাশ পত্রিকার ন্যায় 'সঞ্জিবনী' এবং 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতেও নিয়মিতভাবে আসামের কুলিদের উপর নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশিত হত। এই কাহিনীগুলি বাংলার চিন্তাশীল মানুষদেব মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি করে। ১৮৮০ সাল নাগাদ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহসম্পাদক দ্বাবকানাথ গাঙ্গুলী ঐ এসোসিয়েশন কর্তৃক চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা তদন্তের জন্য আসামে প্রেরিত হন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আসামে তদন্তকার্যের পর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় এই সম্পর্কে এক গুচ্ছ প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধগুলি আসামের কুলিদের মর্মস্পর্শী অবস্থা এবং তাদেব উপর ঔপনিবেশিক শোষকদের অমানুষিক নির্যাতনের জলন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ।[১]

১৯২১ সালে এই শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্য লেবার এনকোয়ারী কমিটি বসেছিল। রয়াল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান লেবাব নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটাই ছিল শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তেব জন্য একটি কমিটি। এই কমিটিব সদস্যদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন বাগিচা মালিক, ১ জন চিকিৎসক এবং ২ জন সরকারী প্রতিনিধি। এই কমিটির চেহারাতেই বোঝা যায় যে কমিটি কি ধবনের তদন্ত করেছিল। মজার কথা এই, শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তেব জন্য এই কমিটি শ্রমিকদের কাছ থেকে কোন সাক্ষ্য নেয় নি কারণ ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের একটি শাখা প্রস্তাব নিয়েছিল যাতে তদন্ত কমিটির সদস্যরা কোন কুলির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ না করেন! ১৯১০ সালের ডুয়ার্স কমিটিব তদন্তের পদ্ধতিও ঐরূপই ছিল।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা এত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শ্রমিকরা একসময় কাজ বন্ধ করে দিল এবং ব্যাপক আকারে বাগান ত্যাগ করে দেশের দিকে রওনা হল। অভাব ও নির্যাতনের তাড়নায় দলে দলে শ্রমিকদের বাগিচা ত্যাগ করে যাওয়ার ঘটনাগুলি ছিল মর্মান্তিক।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চা শিল্পের মালিকরা প্রচণ্ড মুনাফা অর্জন করে। এদের মুনাফার অংক বহুক্ষেত্রেই শতকরা ৪৫ ভাগে গিয়ে পৌঁছায়। মালিকরা যখন এই হারে মুনাফা অর্জন করল তখন শ্রমিকদের বেতন এক আনাও বৃদ্ধি করে নি। কিন্তু যুদ্ধের পরে যখন বাজার মন্দা হল তখন

১। প্রবন্ধগুলি 'Dwarkanath Ganguly—Slavery in British Dominion গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

মালিকরা শ্রমিকদের জানিয়ে দিল যে মন্দার দরুন শ্রমিকদের একমাত্র কিছু ভাতা ছাড়া কোন মজুরি দেওয়া যাবে না। পুরো মজুরি পেয়েই শ্রমিকদের গ্রাসাচ্ছাদন চলত না অথচ এখন তাদের মজুরি হ্রাস করে দৈনিক তিন পয়সা হিসাবে ধার্য করা হল! এই অবস্থায় ১৯২১ সালে কুলিরা সিদ্ধান্ত করল যে বাগানে তারা আর কাজ করবে না এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করবে। সারাদেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার। তিন আনা দৈনিক রোজগার করেও তাদের সংসার চলে নি উপরন্তু তারা স্ত্রী পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে মালিকদের কাছ থেকে পেয়েছে বেত্রাঘাত ও অকথ্য বর্বর নির্যাতন, তাই দেশে প্রত্যাবর্তনই তারা সিদ্ধান্ত করল।[১]

কুলিদের এই কাজ বন্ধ করা এবং দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অমৃত-বাজার পত্রিকা লিখল "আসামের চা বাগানের কুলিদের এই ধর্মঘট তাদের উপর অনুষ্ঠিত দীর্ঘকালের স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকারের বিদ্রোহ! যে সময় থেকে কুলিরা, চলতি ভাষায় যাকে বলে, সেই ধূর্ত আড়কাঠির ফাঁদে পড়ে তার দেশ থেকে বহু দূরে কবরের মধ্যে বিশ্রামের স্থান গ্রহণ করে সেই থেকেই এদের জীবনের দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশা শুরু হয়। এবং শুধু পুরুষ নয়, নারী ও শিশুদেব ভাগ্যেও একই অবস্থা ঘটে। যেই মুহূর্ত থেকে কুলিরা বাগানে প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত থেকেই এরা সভ্যতা ও মানবসমাজের কাছ থেকে হারিয়ে যায়। এরা এমন একটা অবস্থায় পড়েছে, যে মনে হয় কোন পার্থিব শক্তিই একে এর থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। আসামের কুলিরা খ্রীষ্টান মিশনারী বা রাজনীতিকদের উদ্ধার কর্মসূচীর বাইরে। কিন্তু এদের মুক্তি এখন এসেছে। কাদের দ্বারা? কোন বাইরের শক্তির কাছ থেকে নয় বরং নিজেদের কাছ থেকেই। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, চির জীবনের মত তার শৃঙ্খল ভাঙবে অথবা প্রাণ দেবে।"[২]

ডঃ রজনী কান্ত দাস চা বাগানের কুলিদের এই ধর্মঘটের পশ্চাৎপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ইউরোপীয় অফিসারদের লাথি, ঘুসি এবং কুলিদের উপর নানারূপ দৈহিক নির্যাতন প্রায়শই বাগানগুলিতে সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি করত। তিনি হিসাব দিয়েছেন যে ১৮৯১ সালে আসামের চা-বাগানগুলিতে মোট ১০৬টি দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনা ঘটে।[৩]

১। Dewan Chamanlal, The Coole : The Story of Labour Capital in India, Vol II P 15.
২। Amrita Bazar Patrika, 20 May, 1921.
৩। Dr R K Das, Plantation Labour of India, p. 95

এগুলো হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় বাগিচামালিকদের নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধ। ১৮৮৪ সাল থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রতিরোধের স্পৃহা দেখা দেয়। প্রথম দিকে যেগুলো আসলে ছিল শ্রমবিরোধ সেগুলিই কুলিদের মধ্যে সংগঠিত নেতৃত্বের অভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পর্যবসিত হত। ১৯০২-০৩ সালে এইরূপ "দাঙ্গাহাঙ্গামার অপরাধে" ৮২ জন শ্রমিককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। একদিকে কুলিদের এভাবে তথাকথিত অপরাধজনক কার্যকলাপের জন্য সাজা দেওয়া হয়েছে, আবার পাশাপাশি সরকারী রিপোর্টে শ্বেতকায় অফিসারদের অমানুষিক ব্যবহারেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৮৯৯ সালের রিপোর্ট অন লেবার ইমাইগ্রেশন ইনটু আসাম নামক সরকারী দলিলে বলা হয়েছে: "চীফ কমিশনার নিশ্চিতরূপে সেইদিনের আশা করতে পারছেন না যখন ইংরেজরা শ্রমিকদের ঘুষি লাথি অথবা বেত্রাঘাতের নিন্দনীয় অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করবে।" পরবর্তী বৎসরের সরকারী রিপোর্টে এটাও স্বীকার করা হয়েছিল যে বাগানের অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামাই এই দৈহিক নির্যাতনের জন্য ঘটেছে। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে: "ত্রুটিপূর্ণ কাজ করা অথবা কাজ করতে অস্বীকার করার জন্য ম্যানেজার অথবা সহকারী ম্যানেজাররা কুলিদের যে মারধর করেছে, চলতি বৎসরের হাঙ্গামাগুলির জন্য সেই মারধরই দায়ী।" তারপর ১৮৯৯ সালের 'লেবার ইমাইগ্রেশন ইনটু আসাম' নামক সরকারী দলিলে মন্তব্য করা হয়েছে: "কুলিদের মধ্যে আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাতের একটা ক্রমবর্দ্ধমান ঝোঁক দেখা যাচ্ছে এবং ফলে অবস্থা গুরুতর পরিণতির দিকে যাচ্ছে। কারণ কুলিরা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে এবং মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। তাদের কাজ করবার যন্ত্রগুলিকেই তারা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু এই ঝোঁক মাথা-গরম এবং বদমেজাজী ইউরোপীয়ান সহকারীদের গায়ে হাত তোলার অভ্যাসের বিরুদ্ধে ভাল প্রতিষেধকের কাজ করে।"[১]

চা-বাগানের শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন অবস্থার দরুন, অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং নিজ দেশ থেকে বহু দূরে থাকার দরুন এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক ও ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের ঢেউ বাগানগুলিতে পৌছানোর অসুবিধা, বাইরের রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের বাগানগুলিতে প্রবেশের বাধা এবং যে কোন রকমের সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে বাগিচা মালিকদের প্রখর সতর্কতা ও প্রতিহিংসা-মূলক কার্যকলাপের দরুন চা-শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন চেতনা ও সংগঠন গড়ে উঠতে অনেক দেরী হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দৈহিক নির্যাতন এবং

১। Dr R. K. Das Plantation Labour in India p. 100

ব্যক্তিগত নানারূপ অসুবিধার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধের মনোভাব কালক্রমে নিজেদের স্বার্থকে যৌথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার উন্নত মনোভাবে পরিণত হয়।

শ্রমিকদের এই উন্নত চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯২০ সালে। শ্রমিকরা এই সময় বিভিন্ন বাগানে কাজ বন্ধ করে দেয় এবং ১৯২১ সালের মে মাসে দলবদ্ধভাবে বাগান ত্যাগের মধ্য দিয়ে তাদের বিক্ষোভের চূড়ান্তরূপ নেয়। চমনলাল এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার যে মন্তব্য পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা ১৯২১ সালের মে-মাসের এই সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছিল। প্রায় ৮ হাজার শ্রমিক এই সময় বাগান ত্যাগ করে। এই সময় কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামাও ঘটেছিল যার পরিণতিতে ১৯২১-২২ সালে ৯৬ জন কুলিকে এবং ১৯২৫-২৬ সালে ২৪ জন কুলিকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কুলিরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে দলবদ্ধভাবে নিজ নিজ দেশ অভিমুখে রওনা হল। তাঁদের গন্তব্যস্থান ছিল যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশ। কিন্তু তারপর যে ঘটনা ঘটল তা অতি নির্মম ও পাশবিক কাহিনী।

কুলিদের দলে দলে বাগান ত্যাগের ফলে বাগিচা মালিকরা অতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং শেষমুহূর্তে তাঁরা বাগানত্যাগ বন্ধের ষড়যন্ত্র করল। করিমগঞ্জে রেলওয়ের ইউরোপীয় অফিসাররা নির্দেশ দিল যে কুলিদের রেলের টিকিট দেওয়া হবে না। কুলিরা তখন পদব্রজেই দেশাভিমুখে যাত্রা করবে ঠিক করল। সেই সময় তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা এবং কলকাতার মেয়র জে এম. সেনগুপ্তের হস্তক্ষেপের ফলে কুলিদের কাছে টিকিট বিক্রয় করা হল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চাঁদপুরের পথে কুলিদের বেআইনীভাবে আটক করা হল। ১৭ই মে, ১৯২৩ প্রায় ১০০০ কুলি গোয়ালন্দ স্টেশনে ট্রেনে উঠল কিন্তু ফরিদপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট উপরওয়ালার নির্দেশের অজুহাতে কুলিদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দিল। রাত্রে প্লাটফর্মে তাদের পুলিশ প্রহরায় রেখে পরদিন ভোরে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। পরদিন অবশ্য জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কুলিদের কুষ্টিয়া পর্যন্ত যেতে দিতে রাজী হল। কিন্তু পথে কলেরায় অনেক কুলি প্রাণ হারাল। করিমগঞ্জে তখন সরকারী এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ মালিকদের হয়ে কুলিদের কাছে মজুরি বৃদ্ধি করে দৈনিক ৬ আনা করার প্রস্তাব দিল। কিন্তু কুলিরা প্রত্যাবর্তন করতে রাজী হল না যদিও পথে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় এবং কলেরা ইত্যাদি রোগে বহু কুলি মৃত্যুমুখে পতিত হল।

কিন্তু চাঁদপুর রেলস্টেশনে যে ঘটনা ঘটলো বর্বরতার মাপকাঠিতে তা

নজীর বিহীন। চাঁদপুর ষ্টেশনে প্রায় ৩০০০ কুলি আটক হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ যখন এদের বাগানে ফিরে যেতে কোনরকমেই রাজী করাতে পারলো না তখন নৃশংস অত্যাচারের আশ্রয় নিল। প্রায় মধ্য রাত্রে ইংরেজ অফিসাররা গুর্খা সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে কুলিদের উপর জঘন্য আক্রমণ শুরু করল। আটক কুলিদের আক্রান্ত অবস্থা জানতে পেবে যখন চাঁদপুর শহরের সাধারণ মানুষেরা কুলিদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল তখন তাদেরও বাধা দেওয়া হল।

বস্তুত এটা ছিল একটা পাশবিক ষড়যন্ত্র। ২০শে মে, ১৯২১ রাত্রে কুলিদেব চাঁদপুর ষ্টেশন থেকে যাত্রা করবার কথা ছিল। এদিকে কর্তৃপক্ষ বিভিন্নস্থান থেকে ব্যাপক সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করে ষ্টেশন ছেয়ে ফেলল। তারপর রাত্রে ৩০০০ কুলি যখন প্লাটফর্মে নিদ্রামগ্ন ছিল তখন ডিভিশনাল কমিশনারের আদেশে গুর্খা সৈন্যারা উন্মুক্ত বেয়নেট নিয়ে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে নিদ্রিত কুলিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই নৃশংস আক্রমণে বহু কুলি আহত হল। মাতৃক্রোড়ে শিশু থেকে শুরু করে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ কাউকেই বেয়নেটের আঘাত থেকে রেহাই দেওয়া হল না। অনেককে নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিল।

কুলিরা ক্রীতদাসের জীবন ত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিল। তার বদলা ঔপনিবেশিক সরকাব এভাবেই নিয়েছিল, কিন্তু জনগণ সেই সময় নীরব থাকে নি। চা শ্রমিকদের উপর এই নৃশংস অত্যাচার ও বর্বর হত্যাকাণ্ডেব প্রতিবাদে চাঁদপুরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হল। জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। ধর্মঘট এত সফল হয়েছিল যে কর্তাব্যক্তিদের বাংলো ইত্যাদি পরিষ্কার করবার জন্য কোন ঝাড়ুদারও পাওয়া যায়নি। ধর্মঘট দ্রুত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈশ্বরগঞ্জের উকিলরা ধর্মঘট করেছিলেন, নেত্রকোণার উকিলরাও কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শিলচর এবং খালিয়াতে সাধারণ ধর্মঘট হল। গোয়ালন্দে রেলওয়ে এবং স্টীমারের শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘট করলেন। বরিশাল, সিলেট এবং ঢাকায় বিক্ষুব্ধ জনগণও প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত করলেন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিক কর্মচারীরা। তাঁরা এই নারকীয় অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং কুলিদের দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধাদানের প্রতিবাদে রেলের চাকা বন্ধ করে দিলেন। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে পরিপূর্ণ, সফল ধর্মঘট হল।

ব্রিটিশ সরকার কুলিদের এই বাগান ত্যাগের কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছিল

যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবেই এই কুলিরা বাগান ত্যাগ করে। তৎকালীন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দেওয়ান চমনলাল সরকারের এই বক্তব্য খণ্ডন করে বলেছিলেন যে শ্রমিকরা অর্থনৈতিক কারণেই বাগান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। অনাহার ও নির্যাতনই তাদের বাগান ত্যাগে বাধ্য করেছিল। তিনি বলেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবের কথা নেহাতই ধনিক শ্রেণীর সংবাদ পত্র ও ভাড়া করা দালালদের অপপ্রচার।[১]

ব্রিটিশ সরকার চা-বাগানের শ্রমিকদের সংগ্রামকে রাজনৈতিক আখ্যা দিয়ে তাদের উপর অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক শোষণ ও দৈহিক নির্যাতনের অমানুষিক ঘটনাকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। এটা ব্রিটিশ সরকারের কারসাজী। কিন্তু চা শ্রমিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ যে প্রতিরোধের স্পৃহা জাগ্রত হচ্ছিল অস্বীকার করার কিছু নেই যে ১৯২০—২১ সালে দেশের একটা রাজনৈতিক ভাবে অনুকূল পরিস্থিতিতে তা ব্যাপক আকারে ফেটে পড়েছিল।

এই সংগ্রাম ছিল চা শ্রমিকদের শ্রেণীগত চেতনার উন্মেষ ও যৌথ সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। কালক্রমে ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আসাম, বাংলা এবং অন্যত্র চা বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠে এবং তাদের উপর অনুষ্ঠিত বর্বর নির্যাতনের অনেকখানিই পরিবর্তন ঘটে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে।

কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে পরম্পরাগতভাবে চা-বাগিচার শ্রমিকদের পশ্চাদপদ অবস্থা এবং আধুনিক শিল্পাঞ্চলের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের অবস্থান, তাদের শ্রেণীচেতনা তীব্রতর হওয়ার পথে দুস্তর বাধাও সৃষ্টি করেছিল। ফলে এই শ্রমিকদের মধ্যে সুবিধাবাদী এবং সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। বাংলার চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে এই অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটলেও চা শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশ আসামের বাগিচা গুলিতে এখনও বহুলাংশে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের প্রভাবাধীন।

১। D. Chamanlal said, "The causes were not political—all the loud mouthed blusterings of officials and of the Capitalist press and of the hired scribes could not make it so. The causes were purely economic, in a word, starvation and ill treatment."

Coole: The story of Labour and Capital in India. Vol. II p. 17.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা

১৮৫০—১৯০০

পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার সূচনা, ১৮৮০ সালের পরবর্তী সময়ে বস্ত্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব এবং ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির দ্বন্দ্ব—এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে ডব্লিউ. সি ব্যানার্জী ও দাদা ভাই নৌরজীর মত উচ্চবিত্ত মানুষেরা এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন। নবোত্থিত ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরাই এই কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে যোগদান করছেন এবং এর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতেন। ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির দ্বন্দ্ব এবং তারই পাশাপাশি ভারতের নবসৃষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের চালিকাশক্তি ছিল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আইনব্যবসায়ে নিযুক্ত এমন প্রতিনিধির সংখ্যাই ছিল অর্ধেকের বেশী। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৮৮ সাল এই চার বৎসরে কংগ্রেসের চারটি অধিবেশনে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের পেশাগত বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ :

তালিকা নং ১৪

১৮৮৫—৮৮ কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের
পেশাগত বিন্যাস[১]

	১৮৮৪	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮
মোট প্রতিনিধির সংখ্যা	৭২	৪৩৪	৬০৭	১২৪৮
আইন ব্যবসায়ী	৩৯	১৬৬	২০৬	৪৫৫
চিকিৎসক	১	১৬	৮	৪২
সাংবাদিক	১৪	৪০	৪৩	৭৩

১। Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism, Cambridge University Press, 1968.

প্রথম কংগ্রেস এবং পরবর্তী কয়েকটি কংগ্রেসে যে প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয় সেগুলি ছিল মূলত লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সংস্কার এবং ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব, ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতেও সিভিল সার্ভিস ইত্যাদির জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থার পৃথকীকরণ ইত্যাদি।

১৮৮৫ সালে দাদাভাই নৌরজী উপরোক্ত দাবীগুলিকেই ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। হোমরুল সম্পর্কে দাদাভাই বলেছিলেন যে তিনি অথবা ভারতের কেউই হোমরুল চান না।[১]

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে জাতীয়তার সূচনা ভারতের উচ্চশিক্ষিত এবং বিত্তবান মানুষদের কেন্দ্র করেই হয়েছিল। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে কৃষকদের সংগঠিত করবার কোন কর্মসূচী ছিল না যদিও কৃষিজীবীর সংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগের অধিকই ছিল। এই সময় নতুন যে শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হতে শুরু করল তাদের কথাও কংগ্রেসের কর্মসূচীতে ছিল না।

মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের কবর খননকারীরাও সৃষ্টি হয়। শ্রমিকশ্রেণীই পুঁজিবাদের এই কবর খননকারী। কাজেই কংগ্রেসের প্রস্তাবে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যা স্থান না পেলেও ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব কায়দায় নিজস্ব সমস্যা নিয়ে সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রামকে সংগঠিত রূপ দিতে সময় লেগেছিল সন্দেহ নেই। নিঃস্ব গ্রামীণ জনতার মধ্য থেকে যে শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি, অশিক্ষা কুসংস্কার যার ছিল দৈনন্দিন জীবনের সহযাত্রী এবং যারা ছিল সংখ্যায় খুবই কম তাদের পক্ষে সচেতন এবং সংগঠক শ্রেণী হিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সময় লাগবে এটা ছিল ঔপনিবেশিক ভারতের একটি অনিবার্য ঘটনা। ফলে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল যার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাসে সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিপীড়িত কৃষক সমাজের বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ফেটে পড়েছিল। বাংলাদেশের নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রের কৃষকদের অভ্যুত্থান, মালাবারের

১। Ibid ; With regard to Home Ruler', Dadabhi explained in London, '..... I am a warm Home Ruler for Ireland, but neither myself nor any other Indian is asking for any such Home Rule for India......'

মপ্পালা বিদ্রোহ ভারতের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষের মধ্যেও এই বিদ্রোহগুলি সাড়া জাগিয়ে ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'নীল দর্পণ' নাটকে ঔপনিবেশিক নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন অসীম দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে। তাঁর নাটকে ভারতের কৃষকের যে চরিত্র রূপায়িত করেন তার বলিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা স্বভাবতই জনজীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী জন্মগ্রহন করে এবং বলা যায় জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবাদের পথে অগ্রসর হয়। যদিও ভারতেয় সচেতন এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালেই শুরু হয়েছিল। রজনী পাম দত্ত বলেছেন, "১৯১৪ সালের পূর্ববর্ত্তী সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা পিছনেই পড়েছিল, জাতীয় আন্দোলনেব পুরোভাগে থাকার বদলে শ্রমিক শ্রেণী জাতীয় আন্দোলনকে ববং অনুসরণ করত; ... ."[১] কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যে জাগবণ দেখা দেয় এবং শ্রমিক শ্রেণীর যে ধর্মঘটে সংগ্রামগুলি ফেটে পড়ে তাতে অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়।

জন্মলগ্নের পর থেকে শ্রমিকশ্রেণী যে সংগ্রামেব পথ ভ্রমণ করে প্রথম পর্বে তা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং অসংগঠিত। প্রথম পর্বের এই সংগ্রামের সময় ট্রেড ইউনিয়ন বলতে যা বোঝায় শ্রমিকদের সে রকম কোন সংগঠন ছিল না। পরবর্তীকালে সংগ্রামের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু তখন শ্রমিকদের চেতনা ছিল প্রাথমিক স্তরের। প্রথম মহাযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীতে শ্রমজীবী জনগণের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা পৃথিবীতে শোষিত মানুষের মনে যে জাগরণের সৃষ্টি করে তার প্রভাবে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনেরও গুনগত বিকাশ ঘটে। সেই সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন চেতনায় উন্নীত হয়ে অগ্রসর হয়। তারপর ১৯৪৭ সালে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের আরেকটি পর্বের শেষ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলনের আরেকটি পর্বের শেষ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলন চরিত্র ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে আরও উচ্চতর ধাপে উন্নীত হল এবং বর্তমান সময় শ্রমিকশ্রেণীর সেই দ্রুত বিকাশমান সংগ্রাম ও নেতৃত্বের যুগ।

ক্রমবিকাশের এই ধারা অনুযায়ী ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে মোটামুটি চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথম স্তরে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা

১। **R. Palme Dutt, India To-day, p. 314**

১৮৫০—১৯০০, দ্বিতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের যুগ ১৯০১—১৯১৪, তৃতীয় স্তরে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও সংগ্রামের যুগ ১৯১৫—১৯৪৭। এই পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের ধারা অগ্রসর হয়েছে রাজনৈতিকভাবে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। চতুর্থ স্তরে স্বাধীনতা উত্তর শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের যুগ, ১৯৪৭ থেকে বর্তমান পর্যায়।

সংগ্রামের প্রথম পর্ব

ভারতের নবসৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর হৃদয় বিদারক অবস্থা কিছু কিছু শিক্ষক মানবতাবাদী ও সমাজসেবী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরা কেউ আন্দোলনকারী ছিলেন না বা আন্দোলনের কোন ধ্যানধারণাও এঁদের ছিল না। কিন্তু সমাজসেবী হিসাবে বা শ্রমিকদরদী হিসাবে শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা এরা জনসমক্ষে এবং সরকারের নিকট তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সমস্যাকে প্রচার করবার জন্য দুই একটি সাময়িক পত্রের প্রকাশ করেছিলেন। শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার করবার জন্য এরা কিছু নাইট স্কুল ইত্যাদিও পরিচালনা করেছিলেন। এসব ঘটনা জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব থেকেই ঘটে চলেছিল।

বাংলার শিক্ষিতশ্রেণীর একাংশ এই কাজে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে শশীপদ ব্যানার্জীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৭৪ সালে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে শ্রমিক শ্রেণীর বক্তব্য প্রকাশের জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তাতে মনে হয় এই পত্রিকাটিই ভারতের শ্রমিকদের স্বার্থে পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র। বোম্বাই-এর-নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডেও 'দীনবন্ধু' নামে শ্রমিকদের জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ সালে।

শ্রমিকদের জন্য প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশ এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় তাদের ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা শশীপদ ব্যানার্জী করেন তাতে এঁকেই ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রথম সক্রিয় ভাবে অগ্রণী মানুষ বলা যেতে পারে। শশীপদ ব্যানার্জী শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮৮০ সাল নাগাদ কলকাতার উপকণ্ঠে 'বরানগর ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭৮ সালে 'ওয়ার্কিং মেনস্ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক এবং অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি

প্রচার। এর মধ্যে অবশ্য শ্রমিকদের সমস্যা লাঘবের কোন উদ্যোগ ছিল না। ১৮৭৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে এবং শশীপদ ব্যানার্জীর পরিচালনায় বরানগরে চটকল শ্রমিকদের জন্য নৈশ স্কুল এবং সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। পরবর্তী স্তরে চটকলগুলি সেই নৈশ স্কুল ও সেভিংস ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম সমাজের আর একজন প্রচারক পি. সি. মজুমদার ১৮৭২ সালে বোম্বাইতে শ্রমিক অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৮টি নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[১] এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে শ্রমিক সংগঠন গড়া নয়, শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ সেবার লক্ষ্যই পরিস্ফুটিত হয়।

বাংলায় এই উদ্যোগের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রেও বিভিন্ন মানব দরদী ও সমাজ সেবীকে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। শাপুরজী বেঙ্গলীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকদের দুর্দশাকে জনসমক্ষে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরে তা লাঘবের প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে ছিলেন। বস্ত্রকল শ্রমিকদের সমস্যাকে সরবে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে বোম্বাই এর নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৪ সালেই বোম্বাই-এর মিলশ্রমিকদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে স্মারকলিপি প্রস্তুত করার জন্য তিনি শ্রমিকদের এক সভা আহ্বান করেন এবং ১৮৯০ সালে তিনি 'বম্বে মিলহ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। কেউ কেউ লোখাণ্ডেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংগঠক এবং 'বম্বে মিলহ্যাণ্ডস এসোসিয়েশনকে' ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বলে আখ্যায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই আখ্যা আদৌ সঠিক নয়। বস্তুতপক্ষে লোখাণ্ডে ছিলেন সমাজসেবী ও শ্রমিকদরদী এবং সেই হিসাবেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। আর 'বম্বে মিলহ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন'ও কোনক্রমেই ট্রেড ইউনিয়ন বলতে যা বোঝায় সেইরকম কোন সংগঠন ছিল না। এই এসোসিয়েশনের কোন সদস্য সংখ্যাও ছিল না, কোন গঠনতন্ত্র বা কোন তহবিলও ছিল না। এই সম্পর্কে বোম্বাই-এর রেভিনিউ কালেক্টর মিঃ জে. এম. ক্যাম্পবেলের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন, "বোম্বাই-এর মিলশ্রমিকদের কোন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেই। মিঃ এন. এম. লোখাণ্ডে ফ্যাক্টরী কমিশনে কাজ করেছিলেন এবং নিজেকে বম্বে মিলহ্যাণ্ডস

১। Dr. Radhakamal Mukherjee, The Indian Working Class, P. 352.

এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন সংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঐ এসোসিয়েশনটির অস্তিত্ব ছিল না, এর ছিল না কোন সদস্য সংখ্যা বা গঠনতন্ত্র। আমার ধারণা মিঃ লোখাণ্ডে যে শ্রমিকরা তার কাছে আসে কেবলমাত্র তাদের উপদেষ্টা হিসাবেই কাজ করেন।"[১] অবশ্য লোখাণ্ডে এই সম্পর্কে বলেছিলেন, "অনেক মিলশ্রমিক চাকরী হারাবার ভয়ে আমাদের এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে শ্রমিকদের একত্রিত করার বিরুদ্ধে মালিকরা এত ঈর্ষান্বিত।"[২] আবার এই সম্পর্কে বোম্বাই-এর চীফ ইনস্পেক্টার অব ফ্যাক্টরীজ যা বলেছেন তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন "মিলশ্রমিকদের এই তথাকথিত এসোসিয়েশনটির সাধারণ শ্রমিকদের উপর এমন প্রভাব ছিল না যাতে করে আগামীদিনে মালিকদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য এদের শক্তিশালী আকারে সংহত করতে পারে। এটা এমন একটা এসোসিয়েশন যা অন্তত বর্তমান মুহূর্তে শ্রমিক মালিক সম্পর্ককে কোনরকমে প্রভাবান্বিত করতে পারে না"[৩]

যাই হোক লোখাণ্ডে এবং সমসাময়িককালের সরকারী কর্তৃপক্ষের মন্তব্য পাল্টা মন্তব্যগুলি থেকে এটা বোঝা যায় যে, লোখাণ্ডে বোম্বাই এর শ্রমিকদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রমিকদের একত্রিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং বোম্বাইএ তদানীন্তনকালে তিনিই ছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার সবচেয়ে অগ্রণী মানুষ। তাঁর এই ভূমিকা ছিল সমাজসেবী হিসাবে, শ্রেণীসচেতন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বম্বে মিল্-হ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন ও কোন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। যদিও একে ট্রেড ইউনিয়নের ভ্রূণাবস্থা বলা অসঙ্গত হবে না।

বাংলাদেশের শশীপদ ব্যানার্জির ভূমিকা এবং বোম্বাইএর এন এম. লোখাণ্ডের ভূমিকার মধ্য দিয়ে তৎকালীন শ্রমিকশ্রেণীর মুখপাত্রদের মানবদরদী ও সমাজসেবী ভূমিকাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে, শ্রেণীসচেতন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর ভূমিকা নয়। এই সম্পর্কে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই।

১৮৮৪ সালের ২৩শে এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর লোখাণ্ডের আহ্বানে শ্রমিকদের যে সভা হয় তাতে নিম্নলিখিত দাবীর ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা হয়।[৪]

১। **British Parliamentary Papers, XXXVI. Vol, II. Part v., 1892,**
২। **Ibid.**
৩। **Ibid.**
৪। **Dr. R. K Das, The labour movement in India, pp. 9, 10.**

শ্রমিক-৮

১। রবিবার প্রত্যেক শ্রমিককে পুরা ছুটি দেওয়া হোক

২। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আধঘটা বিশ্রাম দেওয়া হোক

৩। কারখানার কাজ সকাল সাড়ে ছয়টায় শুরু করে সূর্যাস্তের সময় বন্ধ করা হোক।

৪। চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বেতন প্রদান করতে হবে।

৫। কর্তব্যরত অবস্থায় কোন শ্রমিক আহত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়লে তার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত পুরা বেতন দিতে হবে এবং যদি কোন শ্রমিক চির জীবনের মত পঙ্গু হয়ে যায় তবে তার জীবন ধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

এই স্মারকলিপিটিতে ৫,৫০০ জন শ্রমিক স্বাক্ষর করেন এবং তা ১৮৮৪ সালে বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের নিকট পেশ করা হয়।

১৮৯০ সালের ১৪শে এপ্রিল লোখাণ্ডে যে সভা আহ্বান করেন সেই সভায় প্রায় দশ হাজার শ্রমিক যোগদান করেন এবং দুইজন নারীশ্রমিক সেই সভায় ভাষণ দেন। ঐ সভায় সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবী করে স্মারকলিপি প্রস্তুত করা হয় এবং বোম্বাই মিল ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের নিকট পেশ করা হয়। ১০ই জুন ১৮৯০, মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভায় দাবিটি আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্জুর করা হয়, কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করা হয় না।[২]

১৮৯২ সালে এন. এম. লোখাণ্ডে গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল কমিশন অন লেবার কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নাবলী'র উত্তরে একটি পত্র লিখেন। সেই পত্রে তিনি তৎকালীন বোম্বাই-এর শ্রমিকদের অবস্থা ও সরকারের মনোভাব প্রকট করে তোলেন। পত্রটিতে লোখাণ্ডে ভারতীয় শ্রমিকদের চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও লক্ষণীয়। ঐ ব্যাখ্যার সঙ্গে স্বভাবতই সহমত পোষণ করার কোন প্রশ্ন নেই। পত্রটিতে লোখাণ্ডে তথা তৎকালীন শ্রমিকদরদীদের চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৩]

১। Ibid, p 14

২। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৯২ লোখাণ্ডে পত্রটি বোম্বাই এর চীফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরীজ মারফৎ রয়াল কমিশন অন লেবরের নিকট প্রেরণ করেন। পত্রটির উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। "The Association I represent is composed solely poor millhands, The day seems distant when from these poor operatives many employers are likely to arise and find establishment for the class to which

১৮৯৫ সালে বোম্বাই-এ রেভাঃ ফাদার হক্‌কিন্‌স এবং জে. হেনলন্‌ সীমেন্‌স্‌ ক্লাব নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠাতা দুই ভদ্রলোক গ্রেট ব্রিটেনের ও আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল সেইলার্স এ্যাসোসিয়েশন ও ফায়ারমেনস্‌ এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১] এই সংগঠনটিও শ্রমিক-

they owe their opulence, Many minhands are unwilling to be known as connected with our Association for fear of losing their employment, so jealous are the employers of labour here of any combination among the workers for their mutual benefit.

"The Strikes are of frequent occurrence in every one of the mills in the city. The chief cause in the reducation of wages on the day of payment without—

"(a), (b), Any provious intimation to workmen of the contemplated change. These strikes sometimes last for four days ……"The Indian mill-hands are a law-abiding and peaceable ..ce, and as a rule, more prone to suffer patiently under wrong than to seek it righted or to dispute the authority of their employers. If, therefore, the employers observed strictly the factory laws, and only paid them regularly exactly the the sum due for their labour and reduced their wages only when necessary, and that after a proper timely notice before hand, and conceded some of the points touched in my replies above, there is no reason why the most cordial relationship should not subsist between the employers and the employed in his country.

The mill-hands of the country, not withstanding the roseate accounts given by interested parties of their prosperity are as a class, not at all thriving, owing to their extreme ignorance and addiction to the vices of a city life, specially drink. Primary education assisted by occasional payment of honorariums for good behaviour and efficiency in service. will go a good way forward ameliorating their condition …An uniform 11 hours work per diem is another much needed reform for the consideration of the Commission." British Parliamentary Papers, House of Commons, XXXVI Vol. II Part V. 1992.

১। Sukhbir Chowdhury, Peasants' and Workers' Movement in India, 1905-1929. p. 41.

দের সমস্যাগুলি নিয়ে প্রচার ইত্যাদি চালাত তবে নিঃসন্দেহে এটাও কোন ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। পরবর্তীকালেও শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে সমাজসেবামূলক আরো প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা, তাঁদের উপর অনুষ্ঠিত বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের একাংশের সোচ্চার হওয়া, শ্রমিকদের সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া, শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি সমাজসেবা-মূলক কার্যকলাপ আরম্ভের পাশাপাশি শ্রমিকদের বাস্তব সংগ্রামও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের সূচনা থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফেটে পড়তে শুরু করে। এই সংগ্রামগুলির পিছনে কোন সংগঠন বা সংগঠিত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। নিঃস্ব ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর ইত্যাদির মধ্য থেকে যে মানুষেরা শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসেছিল তারা স্বভাবজাত প্রবণতার বশবর্তী হয়েই প্রথম দিকে নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কারখানায় একসঙ্গে কাজ করার দরুন তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা পারস্পরিক সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন সময় একই বর্ণের বা একই অঞ্চল থেকে আগত হওয়ার দরুন তাদের মধ্যে বর্ণগত বা অঞ্চলগত ভিত্তিতেও পারস্পরিক ঐক্য বা সহানুভূতি গড়ে উঠত এবং তারা শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমবেত-ভাবে রুখে দাঁড়াত।

ডি. এইচ বুকানন ঐসময়কার সংগ্রামগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন, 'শুরুতে ছিল ঢিলে-ঢালাভাবে কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া।'[১] কল-কারখানা স্থাপনের প্রথমযুগে শ্রমিকরা সাধারণত যে সর্দার ইত্যাদিদের মাধ্যমে সংগৃহীত হ'ত তারা ঐ কারখানারই কর্মচারী হিসাবে কাজ করত এবং আবার ঐ কারখানার জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করে অর্থ উপার্জনও করত। এরা সাধারণত ছিল খুব দুর্নীতিপরায়ণ ও দুষ্টপ্রকৃতির লোক। কারখানা মালিকের সঙ্গে এদের স্বার্থের কোন বিরোধ হলে মালিক অনেক সময়েই এইসব লোকদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিত অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি দিত। বুকানন বলছেন যে প্রথম দিকের ধর্মঘটগুলিতে শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে এই লোকদের প্রভাবে অংশগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কোন কারণে মালিকরা এই সর্দার ধরনের লোকদের বরখাস্ত ইত্যাদি করলে পর তার প্রতিবাদে শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করে দিত। এর কারণ একদিকে ছিল, শ্রমিকরা চাকুরীতে টিকে থাকা বা প্রমোশন

১। D. H. Buchanan, Development of Capitalist Enterprise in India. Newyork, (1934), p 416.

ইত্যাদি হওয়ার ক্ষেত্রে এই সর্দারদের উপর খুব নির্ভরশীল ছিল, আবার শ্রমিকদের সঙ্গে এই সর্দারদের অঞ্চলগত আত্মীয়গত বা বন্ধুগত সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ।

প্রথমযুগে শ্রমিকদের ধর্মঘটে যোগদানের কারণ সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য ঠিকই কিন্তু এটাই প্রধান কারণ নয়। শ্রমিকরা নিজস্ব দাবিদাওয়ার ভিত্তিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছিল। তবে এখন প্রশ্ন, তদানীন্তনকালে যে 'ধর্মঘটগুলি' হয়েছিল তার প্রকৃতি কি ছিল? এই ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যুগে ধর্মঘটের প্রকৃতির সঙ্গে সেই যুগের ধর্মঘটের প্রকৃতির পার্থক্য ছিল। এই ধর্মঘটগুলি ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী। একদিন, দুদিন বা চারদিন বা ঐরকম স্বল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মঘটগুলির পরিসমাপ্তি ঘটত। কোন কোন সময় ধর্মঘট পুরো একটা কারখানায় না হয়ে কারখানার কয়েকটা বিভাগেও হত। ধর্মঘটগুলির অসংগঠিত চরিত্রের জন্য এগুলি দীর্ঘস্থায়ী বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক হতে পারত না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমদিকে ধর্মঘট সত্ত্বেও শ্রমিকদের সমস্যাগুলি মালিকরা সমাধান করত না। তা ছাড়া শ্রমিকদের মনোভাবও কিছুটা অন্যরকম ছিল। শিল্পে মজুর হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেও শিল্প শ্রমিকের পেশাকেই জীবনের স্থায়ী পেশা হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তখনও তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। কৃষিজীবন ত্যাগ করে শিল্প-শ্রমিকের জীবনে প্রবেশ করেও কৃষিজীবনের প্রতি নির্ভরতার ঝোঁক তখনও তাদের মধ্যে ছিল। ফলে শিল্প-শ্রমিক হিসাবে জীবন শুরু করে অত্যন্ত নিম্ন মানের মজুরি এবং পাশাপাশি দৈনিক অত্যধিক সময়ের খাটুনির যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে অনেক সময়েই তারা শিল্প-শ্রমিকের জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ত এবং তাদের ফেলে আসা গ্রাম্যজীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত। তাই দেখা যায় প্রথমযুগে শ্রমিকরা নিম্ন মজুরি এবং অত্যধিক খাটুনির বিরুদ্ধে স্বভাবজাত প্রতিবাদের সুরে রুখে দাঁড়িয়ে দুচার দিনের জন্য কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তারপর এদের অনেকে হয়ত শিল্পাঞ্চল ত্যাগ করে পুনরায় গ্রামে ফিরে এসেছে।

প্রথমযুগে চাকুরীজীবনের যে সমস্যাগুলি শ্রমিকদের কাছে সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ছিল সেগুলি ছিল প্রধানত দৈনিক অত্যধিক কাজের ঘণ্টা এবং অত্যন্ত নিম্ন মজুরি। লক্ষণীয় যে ভারতের প্রথম ফ্যাক্টরী আইন মূলত শিশুশ্রমিকদের খাটানোর ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল যদিও সেই বিধিনিষেধগুলি কাগজপত্রেই ছিল। কারণ এই ব্যাপারে না ছিল সরকারের কোন আন্তরিক আগ্রহ না ছিল এগুলি কার্যকর করার

জন্য কোন বাস্তব ব্যবস্থা। বোম্বাই-এর সোরাবজী শাপুরজী বেঙ্গলী শ্রমিকদের অত্যধিক খাটানো, বিশেষ করে শিশুদের অমানুষিক শোষণ করার বিরুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮৯০ সালের ২৪শে এপ্রিল বোম্বাইয়ে এন এম লোখাণ্ডেও শ্রমিকদের সভা থেকে সপ্তাহে একদিন বাধ্যতা-মূলক ছুটির দাবি করেছিলেন এবং ফ্যাক্টরী এ্যাক্টে এই সম্পর্কে প্রস্তাবিত সংশোধনকে সমর্থন করেছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০, ভারত সরকার ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন নিযোগ করলেন। এই কমিশনে চারজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। এঁরা হলেন বোম্বাই-এর সোরাবজী শাপুরজী বেঙ্গলী, এন এম লোখাণ্ডে, কলকাতার বাবু রসিকলাল ঘোষ এবং ইউরোপীয় মালিকানাধীন কানপুর উলেন মিলের ফোরম্যান ফ্রামজী ম্যাকেঞ্জী।

এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৮৯১ সালের ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনে প্রধানত যে বিধানগুলি ছিল তা হল ৯ বৎসর থেকে ১৪ বৎসরের শিশুশ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৭ ঘণ্টা ও নারী শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ১১ ঘণ্টা নির্ধারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক অর্দ্ধঘণ্টা খাদ্যগ্রহণের জন্য বিশ্রাম ও একদিন সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই আইনেও পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক কাজের কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা হল না। তা ছাড়া এই আইনের বিধানও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবে কার্যকর করা হয়নি। পুরুষ শ্রমিকদের কাজের সময় সম্পর্কিত সুপারিশ একমাত্র ১৯১১ সালের ভারতীয় ফ্যাক্টরী এ্যাক্টেই করা হয়েছিল। ঐ আইনে বস্ত্রকল শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ১২ ঘণ্টা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কমিটি-কমিশন ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়নি। অপর দিকে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় উভয় গোষ্ঠীর মালিকরাই অতি স্বচ্ছন্দে শ্রমিকদের যথাসম্ভব কম মজুরি দিয়ে যথাসম্ভব বেশী শোষণ চালিয়ে যেতে লাগল। এই অবস্থায় এটা অস্বাভাবিক মোটেই নয় যে প্রথমযুগে শ্রমিকদের সংগ্রামগুলি মূলত দুটি দাবিকে কেন্দ্র করেই ফেটে পড়েছিল—একটি হচ্ছে দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমানো এবং অপরটি মজুরি বৃদ্ধি।

ভারতের শিল্প শ্রমিকদের প্রথমযুগের সংগ্রামগুলি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের একান্ত অভাব। ঐ যুগের শ্রমিকদের সংগ্রামগুলির কাহিনী বর্তমানে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তথ্যের স্বল্পতা একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক।

তা ছাড়া ভারতের নব গঠিত শিল্পগুলি একটি বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল না। প্রধানত একদিকে কলকাতা এবং তার শহরতলী এবং অপরদিকে বোম্বাইকে কেন্দ্র করেই এ শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ ছাড়াও নাগপুর, কানপুর, মাদ্রাজ ইত্যাদি অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলেও কিছু কিছু কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকদের যে স্থানীয় সংগ্রামগুলি ঘটেছিল তার অনেকগুলির লিখিত বিবরণই সেই বিশেষ স্থানের স্থানীয় পত্র-পত্রিকা বা দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিবরণগুলি সেই স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থানের কোন পত্র-পত্রিকা বা দলিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন স্থান পায়নি। তদানীন্তন সরকারের পক্ষ থেকেও সেই সংগ্রামগুলি সম্পর্কে কোন কেন্দ্রীয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়নি। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্মলগ্নের সংগ্রামী কাহিনী লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি একটা বাস্তব অসুবিধা।

বিভিন্ন সূত্র থেকে যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা যায় তাতে দেখা যায় যে ভারতের শিল্প-শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল নব-গঠিত রেলওয়েতে। ১৮৬২ সালের এপ্রিল-মে মাসে হাওড়া স্টেশনে ১২০০ রেল শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভারতের প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে বোম্বাই-এ এবং বাংলায় রেলপথ স্থাপিত হয় তার পর বৎসর ১৮৫৪ সালে। রেলপথ স্থাপনের মাত্র ৭।৮ বৎসর পরই ভারতের রেল শ্রমিকদের এই ধর্মঘট যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

কলকাতার সন্নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'সোম-প্রকাশে' এই ধর্মঘট সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়:

'সম্প্রতি হাওড়ার রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিভ (গাড়ি) ডিপার্টমেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানী মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক পাইবেন না।'[১]

এই ধর্মঘটের আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে যে আমেরিকার শিকাগোতে ১৮৮৬ সালে ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে ঐতিহাসিক মে দিবসের ঘটনাবলী সংঘটিত হবার ২৪ বৎসর পূর্বেই ভারতের রেল শ্রমিকরা খুব বিচ্ছিন্ন-ভাবে হলেও দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। এই তাৎপর্য আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

এই রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদ ছাড়াও শ্রমিকসংক্রান্ত অন্যান্য যে

১। সোমপ্রকাশ, ২৩শে বৈশাখ ১২৬৯, ইং ৫ই মে, ১৮৬২

সংবাদ সমূহ সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয় তাতে ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় গরুর গাড়ীর গাড়োযানদের এক ধর্মঘটের তথ্য পাওযা যায়। এই সম্পর্কে সোমপ্রকাশে লেখা হয়।

'পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা অনেক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের জরিমানা করাতে যাবতীয় গাড়োয়ান এক ধর্মঘট করিয়া গাড়ি বন্ধ করিয়াছে। তাহারা বলে কিছুদিন চালাইলে গরুর স্কন্ধে ক্ষত হয়, অতএব প্রতি বৎসর এক এক জোড়া গরু ক্রয় করা অসাধ্য। তাহারা কেহই গাড়ি চালায় নাই। সুতরাং বণিকদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।'[1]

পত্রিকাটি কিন্তু ঐ ধর্মঘট সমর্থন করে নাই। তাই পত্রিকাটি মন্তব্য করেছে, 'গবর্ণমেণ্ট ইহাতে ভীত হইয়া ঐ উৎকৃষ্ট নিয়মটি রহিত না করেন। দুই এক দিন সহিয়া থাকিলেই উহাদের ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।'[2]

সোমপ্রকাশে এর পরবর্তী সংবাদ, 'আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের চৈতন্য হইয়াছে। শনিবার অবধি তাহারা কার্য আরম্ভ করিয়াছে .....'[3]

অশিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘট এই সময়ে বোম্বাই শহরেও প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৮৬৬ সালে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন মাংস বিক্রেতারা ধর্মঘট করে এই রকম আমেদাবাদেও ইট শিল্পের শ্রমিকদের এবং দর্জিদের ধর্মঘটের সংবাদ পাওয়া যায। এই ধর্মঘটগুলি সংঘঠিত হয় ১৮৭৩ সালে।

১৮৬২ সালে হাওড়ার রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের পরে আরেকটি যে বৃহৎ শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘটের নজির পাওয়া যায় তা হচ্ছে ১৮৭৭ সালে নাগপুরে এম্প্রেস মিলে শ্রমিকদের ধর্মঘট। শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ছিল মজুরি সংক্রান্ত দাবিতে। কিন্তু এই ধর্মঘটের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৮৮০ সালের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রামের ব্যাপক বিস্তারের তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে শ্রমিকদের সংগ্রাম পর্যালোচনা করে ডঃ আর কে দাস লিখেছেন, "১৮৮২ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটের নজীর পাওয়া যায়। কিন্তু ছোটখাট ধরনের ধর্মঘট আরও

১। সোমপ্রকাশ ২৪শে ভাদ্র, ১২৬৯, ইং ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬২

২। ঐ ঐ ঐ

৩। ঐ ৩১শে ভাদ্র ১২৬৯, ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬২

ঘন ঘন সংগঠিত হত।"[১] বোম্বাই এর চীফ ইনস্পেক্টর অব ফ্যাক্টরীজ মিঃ এন এ. মস সাক্ষ্য দেন, "অনেকগুলো ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে। প্রতিটি কারখানায় বৎসরে অন্তত দুবার ধর্মঘট হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মঘটই স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরাই সবক্ষেত্রে হার স্বীকার করেছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জরিমানা দিতে হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বকেয়া বেতন হারিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে যাওয়ার কারণ সাময়িক, যেমন পূর্বাহ্নে কোন রকম বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে মজুরি হ্রাস করে দেওয়া ......।"[২] বোম্বাই সরকারের আরেকজন মুখপাত্র মন্তব্য করেন, ইংলণ্ডে ধর্মঘট ও লক আউট বলতে যা বোঝা যায় সে রকম কিছু এখানে ঘটেনা। মজুরি হ্রাস করে দেওয়া বা জরিমানা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নর্দার্ন ডিভিশনে প্রায়ই এক দিন দুদিনের জন্য কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত শ্রমবিরোধগুলির দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে সাধারণত পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। সেণ্ট্রাল সাদার্ন ডিভিশনে শ্রমবিরোধ দেখা যায় নি। বোম্বাইএ যে ধর্মঘটগুলি হয়েছে সেগুলি কারখানাভিত্তিকভাবে বা কারখানার কোন কোন ডিপার্টমেণ্ট সংঘটিত হয়েছে। এই ধর্মঘটগুলি তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় নি। মজুরি হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টাই এই ধর্মঘটগুলির কারণ বলে জানা যায়।[৩]

রয়েল কমিশনের কাছে প্রদত্ত এই সাক্ষগুলি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে এই সময় ধর্মঘট ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয়েছে, তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন। আধুনিককালের কায়দায় সংগঠিত ধর্মঘট সে যুগে সম্ভব ছিল না সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মজুরি হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে শোষণ তীব্র করার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা অসংগঠিতভাবে এবং স্বল্পকালের জন্য হলেও রুখে দাঁড়িয়েছে এটাই বাস্তব সত্য। শুধু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে নয় বাংলার পরিস্থিতিও ছিল অনুরূপ।

বাংলা সরকারের একজন মুখপাত্র তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, "খুব গুরুত্বপূর্ণ বা সাধারণ দাবিদাওয়া সম্পন্ন কোন ধর্মঘট বা লকআউট সংঘটিত হয় নি। যখন কোন ডিপার্টমেণ্টে অন্য ডিপার্টমেণ্টের তুলনায় বেশী মজুরি থাকার দারুন অথবা কোন মিলে পার্শ্ববর্তী কোন মিলের তুলনায় বেশী মজুরি থাকার দরুন সংশ্লিষ্ট

১। Dr. R. K. Das, The Labo'ır Movement in India, p. 65
২। British Parliamentary Papers, xxxvl, vol, II, part v. 189?.
৩। Ibid.

ডিপার্টমেন্ট বা মিলের শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তখন সেই ডিপার্টমেন্ট বা মিলে শ্রমবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সমবেতভাবে বাজে প্রকৃতির ওভারসীয়ারদের অধীনে কাজ করতে অস্বীকার করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক নাগাড়ে এক সপ্তাহ যাবৎ কাজ বন্ধ থেকেছে। এই রকম ভাবে ঘুসুরী কটন মিলে ১৮৮১ সালে এবং ১৮৯০ সালে দুবার ধর্মঘট হয়েছে, প্রথম ধর্মঘটটি ১০ দিন স্থায়ী ছিল এবং দ্বিতীয়টি চলেছিল ৩ দিন পর্যন্ত। ধর্মঘটের কারণ ছিল মজুরি হ্রাস করে দেওয়া, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা মালিকদের সর্ত মেনে নিয়েছিল, যদিও কোম্পানী জানিয়েছে যে তাদের দুটো ধর্মঘটের ফলে ২০০০ লোকসান হয়েছে। কোন শিল্পভিত্তিক সংগঠিত ধর্মঘট বা কোন একটা মিলের সমস্ত শ্রমিকের সংগঠিত ধর্মঘট কখনও হয়নি। যেখানেই মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছে এবং সংঘর্ষে এসে অধ্যবসায়ের সঙ্গে সমস্ত বিকল্প ব্যস্থাগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করে গেছে, এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে সেখানেই মালিকরা সাফল্য লাভ করেছে।"[১]

এই বক্তব্য থেকেও দেখা যায় বাংলাদেশে সরকারী কর্তৃপক্ষ কমিশনের কাছে ধর্মঘটের গুরুত্ব যতই ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন ১৮৮০ সালের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বহুসংখ্যক ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি অনুযায়ী ১৮৮১ সালে ঘুসুরী কটন মিলস্ এর ধর্মঘট ১০ দিন ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। তখনকার দিনের অবস্থায় শ্রমিকদের এই প্রতিরোধ-সংগ্রাম শ্রমিকদের সহজাত সংগ্রামী মনোভাবেরই দ্যোতক। লক্ষণীয় যে সরকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি অনুযায়ীই ধর্মঘটগুলির কারণ ছিল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করে দেওয়া। এই মজুরি হ্রাসের কারণ মালিকরা যাই দেখাক না কেন এটা বোঝা যায় যে ভারতে আধুনিক শিল্প সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই কি ব্রিটিশ মালিক বা কি ভারতীয় মালিক, শ্রমিকদের মজুরির হার হ্রাস করে, তাদের উপর যথেচ্ছভাবে জরিমানা আরোপ করে শ্রমিকদের আরো বঞ্চিত করা এবং শোষণকে আরো তীব্রতর করার অপচেষ্টায় মত্ত ছিল। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ মালিক বা ভারতীয় মালিকের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য ছিল না। শ্রমিকদের শোষণের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের কোন দেশভেদ বা জাতিভেদ নেই, এই সত্যকেই আরো নগ্নভাবে প্রকট করে তোলে ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ ও ভারতে পুঁজিপতিদের শোষনের ইতিহাস।

১। **British Parliamentary Papers, xxxvi. vol II Part v, 1892.**

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে ১৮৮০ সালের পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের বিভিন্ন ধর্মঘট সংগ্রামের কথা সরকারী বক্তব্যেই দেওয়া হয়েছে। যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ধর্মঘটগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায়।

[এক] ১৮৮১ সালের শেষদিকে সুরাটের গুলাম বাবা স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলে দুবার ধর্মঘট হয়। প্রথম ধর্মঘট হয় ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর। দ্বিতীয় ধর্মঘটটি হয় ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর। দুটো ধর্মঘটই ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধের ফলে সংগঠিত হয় বলে জানা যায়।[১]

[দুই] কুর্লা স্বদেশী মিলে ১৮৮৭ সালে একবার ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট তিন দিন স্থায়ী হয়। শ্রমিকদের কম মজুরিই এই ধর্মঘটের কারণ বলে জানা যায়।[২]

[তিন] বাংলায় ঘুসুরী কটন মিলে ১৮৮১ সালে একবার এবং ১৮৯০ সালে আরেকবার ধর্মঘট হয়। প্রথম ধর্মঘটটি দশদিন এবং পরবর্তী ধর্মঘটটি তিনদিন স্থায়ী হয়। এই সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

[চার] ওয়ার্ধা হিংগনঘাট মিলের কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে জানা যায় যে ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯১ সাল, এই দশ বৎসর ঐ মিলে চার বার ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটে মিল কর্তৃপক্ষের দৈনিক এক হাজার টাকা লোকসান হয় বলে জানা যায়।[৪]

মিলে প্রথম ধর্মঘট হয় ১৮৮৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ২৮শে ডিসেম্বর। দ্বিতীয় ধর্মঘট হয় ১৮৮৭ সালের ২৭শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল। তৃতীয় ধর্মঘট হয় ১৮৮৮ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ এবং চতুর্থ ধর্মঘট হয় ১৮৮৯ সালের ২৫শে নভেম্বর থেকে ২৮শে নভেম্বর।[৫]

১। British Parliamentary Papers, xxxvi. Vol II, Part V, 1892,

২। Ibid.

৩। Ibid

৪। Ibid.

৫। Ibid

[পাঁচ] কয়েম্বাটোর স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলে ১৮৯১ সালে ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট ১০ই মে থেকে ১২ই মে পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ৩৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০০ জন শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। জানা যায় যে কর্তৃপক্ষ একজন শ্রমিককে প্রহার করে এবং তার বিরুদ্ধেই এই ধর্মঘট হয়।[১]

[ছয়] মাদ্রাজের সাদার্ন ইণ্ডিয়া স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ জানায় যে ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত তাদের মিলে ৫ বার ধর্মঘট হয় এবং প্রতিটি ধর্মঘটে মিলকর্তৃপক্ষের ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা লোকসান হয়।[২]

[সাত কুলা স্পিনিং এবং উইভিং মিলের কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ঐ মিলে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে একটি ধর্মঘট হয়েছে।[৩]

[আট] বোম্বাই এর নাওরোসজী ওয়াদিয়া এণ্ড সন্‌স্‌-এর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ঐ মিলে দুইবার ধর্মঘট হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরো জানায় যে মজুরি হ্রাসই এই ধর্মঘটের কারণ।[৪]

[নব] বোম্বাই এর হীরামানেক এণ্ড কোং পরিচালিত ৩টি মিলে ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসে ধর্মঘট হয়। মজুরি হ্রাসের আশঙ্কাতেই এই ধর্মঘট সংগঠিত হয় বলে জানা যায়। ধর্মঘট কয়েকদিন স্থায়ী হাওয়ার পর আপনা থেকেই ভেঙে যায়। কিন্তু অচিরেই ঐ মিলগুলিতে আবার শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রবণতা দেখা দেয় এবং ১৮৯৩ সালে মিলগুলিতে শ্রমিকদের বৃহত্তম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাবকে 'স্ট্রাইক ম্যানিয়া' বলে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।[৫]

[দশ] ১৮৯২ সাল এবং ১৮৯৩ সালে বোম্বাই-এ বস্ত্রকল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাসের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালায় মালিকরা। এর ফলে বোম্বাই-এর বিভিন্ন মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং পরে একসঙ্গে একাধিক মিলেও ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট

১। Ibid.

২। Ibid

৩। Ibid.

৪। Ibid

৫। S D. Mehta, The Cotton Mills of India, p 82

পরিচালিত হয়। এই সময়ে এটাই ছিল শ্রমিকদের বৃহত্তম ধর্মঘট এবং এই ধর্মঘট সমূহে ১২,০০০ থেকে ১৪,০০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে।[১]

[এগার] সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেদাবাদের শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। আমেদাবাদ মিল ওনার্স এসোসিয়েশন শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে পাক্ষিক বেতন দানের নিয়ম প্রচলন করে। শ্রমিকরা এই নতুন নিয়মের বিরুদ্ধেই ধর্মঘট করে। প্রথমে মিলগুলির তাঁতীরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে এবং পরে অন্যান্য শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। ১৮৬৯ সালে আমেদাবাদে প্রথম মিল প্রতিষ্ঠাতাব পর থেকেই শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন দানের নীতি চালু ছিল। এই পুরাতন নীতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যে ধর্মঘট করেন আমেদাবাদের প্রেসিডেন্সী ইন্‌স্‌পেক্টার তাকে আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মঘট বলে অভিহিত করেন। ধর্মঘট ১০ দিন স্থায়ী হওয়ার পর এর অসফল পরিসমাপ্তি ঘটে বলে জানা যায়।[২]

[বার] ১৮৯৫ সালে এবং ১৮৯৬ সালে কলকাতার সন্নিকটস্থ বজবজ জুট মিলে দুইবার ঐ সময়কার অন্যতম বৃহত্তম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ সালের ধর্মঘট ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং কোম্পানীর ৮০,০০০ টাকা ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। ১৮৯৬ সালের ধর্মঘট ৮ দিন যাবৎ স্থায়ী হয়। এছাড়াও এই দুই বৎসরে ঐ মিলে আরও কয়েকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।[৩]

বজবজ জুট মিলের প্রথম ধর্মঘটটি অত্যন্ত ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয় এবং এই ধর্মঘট চলাকালে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই ধর্মঘট সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করা হয় :

'মঙ্গলবার রাত্রি ৮ টার সময় বজবজে এক গুরুতর দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে। ইউরোপীয় কর্মচারীরা যে বাংলোতে বাস করে, বজবজ জুটে মিলের প্রায় ৯ হাজার শ্রমিক সেই বাংলোর নিকট সমবেত হয়। জানা যায় যে শ্রমিকদের সঙ্গে সর্দারের বিরোধ হয় এবং শ্রমিকরা ঘোষণা করে যে সর্দারকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা না হলে ধর্মঘট করা হবে। মিল কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং শ্রমিকরা দলবদ্ধ হয়ে বাংলোতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে জানালার কাঁচ ইত্যাদি ভেঙে দেয়। ইউরোপীয়রা শ্রমিকের উপর গুলিবর্ষণ করে। দুই জন হাঙ্গামাকারী গুরুতর রূপে আহত হয় এবং আলিপুর

১। Ibid. p. 133.
২। Annual Factory Report of Bombay, 1895, pp 5-6.
৩। D H. Buchanar, Capitalist Enterprise in India, p 421

হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হয়। জনতার প্রহারে আহত দুই জন পুলিশ কনেষ্টবল এবং মিলের একজন দারোয়ানকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জেলার পুলিশ সুপারকেও তার করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আসবার আগেই জনতা প্রস্থান করে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'[১]

উপরোক্ত কয়েকটি ধর্মঘটের তথ্য থেকে উপলব্ধি করা যায় যে শ্রমিকরা তখনও ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত না হওয়া সত্বেও মজুরি হ্রাস ও বিভিন্নপ্রকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিল। মিল মালিকরাও নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। বজবজের ধর্মঘটের রিপোর্ট থেকে অনুমান করা যায় যে শ্রমিকরা ঐ সময়েই কি প্রচণ্ড দৃঢ়তা, সাহস ও জঙ্গী মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম করতে শিখেছিল। বজবজের ধর্মঘট নিঃসন্দেহে সেই যুগের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।

বজবজ জুটমিলের এই ধর্মঘট এবং অন্যান্য জুটমিলের শ্রমিকদের সংগ্রামের কিছু তথ্য পাওয়া যায় ১৮৯৫-৯৬ সালের বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে। ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন বাংলার এই মিলগুলির শ্রমিকদের প্রতি ইউরোপীয় মালিকদের আচরণ, শ্রমিকদের সংগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে এই রিপোর্টে। রিপোর্টের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল:

'২৪ পরগণা জেলায় শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি হাঙ্গামা ঘটেছিল। প্রথম হাঙ্গামা ঘটে এপ্রিলের প্রথম দিকে টিটাগর জুটমিলে। বকরঈদ উৎসবের সময় কিছু মুসলমান কাজে অনুপস্থিত ছিল এবং তাদের মজুরি না দেওয়ার পরিণামেই এই ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনমূলক বিক্ষোভ সংগঠিত করে এবং যখন পুলিশ দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে আসে তখন হাঙ্গামা ঘটে এবং পুলিশের সঙ্গে উগ্র ব্যবহার করা হয়। তিনজন লোককে গ্রেপ্তার করে সাজা দেওয়া হয়। অনুরূপ অসুবিধাজনক ঘটনা ঘটে কামারহাটি মিলে মহরমের সময়। কিন্তু ছুটি প্রদান করে ঐ সমস্যার সমাধান করা হয়। এই হাঙ্গামাগুলির প্রতিকূল দিকটা ছিল এই যে ইউরোপীয় কর্মচারীরা আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল। টিটাগড়ের ঘটনায় গুলি চালনা করা হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেনি। কামারহাটি মিলের ঘটনার সময় কর্মচারীরা (ইউরোপীয়—লেখক) স্বেচ্ছাবাহিনীর অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ছিল সম্ভাব্য হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য। কাঁকিনাড়া মিলে আরেকটি ঘটনা

১। Amrita Bazar Patrika, June 26, 1895

ঘটে। ঐ মিলে ম্যানেজার স্পিনার্সদের মজুরি সাড়ে তিন টাকা থেকে সোয়া তিনটাকায় নামিয়ে দেয়। নদার অপর পারে এবং শ্যামনগরে নতুন মিল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় স্পিনার্সরা বর্দ্ধিত মজুরি দাবী করে। ম্যানেজার দলের নেতাদের আটক করার চেষ্টা করে। এর ফলে কিছুটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়, কিন্তু কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে না। পুলিশ দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করে এবং শান্তি রক্ষার জন্য এদের আটক রাখা হয়। জানা যায় যে সবসময়ে এক সপ্তাহের বেতন হাতে রাখার পদ্ধতি এই হাঙ্গামার অন্যতম কারণ। এতে সন্দেহ নেই যে শ্রমিকরা এর ফলে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, কারণ এই পদ্ধতির দরুন এক সপ্তাহের মজুরি উৎসর্গ না করে শ্রমিকদের পক্ষে মিল ছেড়ে অন্য ভাল চাকুরীতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কমিশনার ম্যানেজারদের কাছে এই দিকটা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়নি। জুলাই মাসে গার্ডেনরীচে একটা চটকলে স্পিনার্সরা মজুরিবৃদ্ধির দাবী করেন। কিছু দাবি-দাওয়া মিটিয়ে ধর্মঘট এড়ানো হয়। আগস্ট মাসে বজবজ মিলে গুরুতর হাঙ্গামা ঘটে। জানা যায় যে ম্যানেজার শ্রমিকদের কাছে অবাঞ্ছিত একজন ওভারসীয়রকে কাজে পুনর্বহাল করেন এবং এর বিরুদ্ধে স্পিনার্সরা ধর্মঘট করেন। মিলের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ম্যানেজার কারখানায় লকআউট ঘোষণা করেন এবং সেই সঙ্গে এক সপ্তাহের বেতনও আটক রেখে দেন। ফলে বিরাটসংখ্যক শ্রমিক ইউরোপীয়দের আবাসস্থলের নিকট বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে পুলিশ এসে যাওয়াতে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সাজা দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ইউরোপীয় কর্মচারীরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে কিন্তু কোন গুরুতর পরিণতি হয়নি। ম্যানেজিং এজেন্টস্ ঘটনার তদন্ত ক'রে শ্রমিকদের বেতন না দিয়ে লকআউট করে দেওয়ার নিন্দা করেন। কারখানায় কোন ম্যানেজার না থাকার ব্যাপারটাকেও নিন্দা করেন। কলকাতা থেকে টেলিফোনে কারখানার কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকত। মিলের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বিক্ষোভকে দমন করবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারকে লেফটেনান্ট গভর্ণর নিন্দা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সত্যই প্রয়োজন হবে এমন ঘটনা বাস্তবে কদাচিৎ ঘটবে। ভারতীয়দের মধ্যে সামান্য কিছু লোকই আছে যারা ইউরোপীয় ম্যানেজার ও তার সহকারীদের ন্যায়সঙ্গত ও দৃঢ় সমঝোতামূলক প্রচেষ্টাকে মেনে নেবে না।'[১]

উপরের উদ্ধৃতিটি সরকারী রিপোর্টের একটি অংশ। ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই

১। **Bengal Administration Report for 1895-96.**

অনেক রেখে ঢেকে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দমনপীড়নমূলক কার্যকলাপকে অনেক মোলায়েম করে দেখানোর চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু এই রিপোর্ট থেকেই সমসাময়িক বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে।

১৮৯৭ সালে বোম্বাইতে শ্রমিকরা ব্যাপকহারে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হন। ঐ সময় বোম্বাই শহরে বুবনিক প্লেগের মারাত্মক প্রাদুর্ভাবের দরুন শহরের মানুষেরা গ্রামের দিকে ছুটেছিল। শ্রমিকদেরও একটা বিরাট অংশ কারখানা ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেয়। ফলে শহরে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। সেই সময় মালিকেরা মাসিক বেতন দানের পরিবর্তে দৈনিক মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ শুরু করে। প্লেগ মহামারী দূরীভূত হলে পর যখন শ্রমিকরা আবার শহরে ফিরে যায় এবং চাকুরীর সন্ধান করে তখন মালিকরা দৈনিক মজুরি বন্ধ করে পুরাতন মাসিক বেতনের প্রথা চালু করে। তখন শ্রমিকরা মাসিক বেতনের প্রথা চালু করে। তখন শ্রমিকরা মাসিক বেতনের প্রতিবাদে এবং দৈনিক মজুরির দাবীতে ধর্মঘট করেন। প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা যায় যে ঐ ধর্মঘট সফল হয়নি। মালিকেরা শ্রমিকদের উপর পাল্টা আক্রমণও চালায়। তারা সিদ্ধান্ত করে যে শ্রমিকদের কনট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে এবং শ্রমিকদের মজুরিও কনট্রাক্টরের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। মালিকরা এটাও সিদ্ধান্ত করে যে তারা শ্রমিকদের একটা বিকল্প তালিকা প্রস্তুত করে রাখবে এবং কর্মরত শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে বিকল্প তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের কাজে লাগানো হবে।

এ ছাড়াও আরো অনেক ছোটখাট ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে এবং শ্রমবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আরো অনেক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই সব ধর্মঘটের বা সংগ্রামের কোন লিখিত বিবরণী রাখার কোন নজীর সমসাময়িককালে না থাকায় সেই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যে সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তাতে আরো কিছু কিছু কারখানায় ধর্মঘট ইত্যাদির তথ্য পাওয়া যায়।

মাদ্রাজের বিন্নি এণ্ড কোং-এর কর্তৃপক্ষ জানায়, 'আমরা অনেকগুলো ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। প্রায়ই ধর্মঘট হচ্ছে। কারখানার আকার এবং প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত লোকসান যাচ্ছে।'[১] মাদ্রাজের হায়ডে এণ্ড কোং-এর কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্য অনুযায়ী, 'প্রায়ই বিরোধ ঘটছে তবে এই বিরোধগুলিকে ধর্মঘটের মত উচ্চ পর্যায়ের বলা

১। British Parliamentary xxxvi vol II, Part v, 1892.

যায় না।'[১] নাগপুর এম্প্রেস মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলেন, 'জরিমানা আরোপ করা বা মজুরি হ্রাসের জন্য উত্তর ডিভিশনে প্রায়ই একদিন বা দুদিনের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি শ্রমবিরোধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।'[২]

আরো জানা যায় যে জি. আই. পি. রেলওয়ের সিগনালিং স্টাফরা ১৮৯৯ সালে ধর্মঘট করেন। টেলিগ্রাফী জানা স্টেশন মাস্টার ও সহকারী ষ্টেশন মাষ্টাররাও এই ধর্মঘটে যোগ দেন। দাবি ছিল কাজের ঘন্টার পরিবর্তন, বেতন বৃদ্ধি, ইউরোপীয় ও ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ। ধর্মঘট শুরু হলে কর্তৃপক্ষ বরখাস্তের হুমকী দেয় এবং আরও বিভিন্ন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে। ২৭ দিন ধর্মঘট চলার পর কর্মচারীরা কাজে ফিরে আসেন।

এই সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৮৯৭ সালে এমালগামেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া এণ্ড বর্মা নামে রেলওয়ে কর্মচারী-দের একটি সংগঠন সৃষ্টি। এই সংগঠনটি ১৮৮২ সালে কোম্পানিজ্ এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হয়। রেলওয়ে সমূহের ইউরোপীয় এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কর্মচারীদের নিয়েই এই সোসাইটি গঠিত হয়। এই স্তরের কর্মচারীরা বাস্তবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অঙ্গীভূত অংশ আদৌ ছিল না। তা ছাড়া এই সোসাইটির কার্যকলাপও মোটামুটি পারস্পরিক সাহায্য সহায়তার ভিত্তিতেই ছিল। কোন ট্রেড ইউনিয়নগত ভিত্তিতে এর কাযকলাপ পরিচালিত হয়নি, যদিও এই সোসাইটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চালু ছিল। কাজেই এই সোসাইটিকে কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না।

১৮৬২ সালে হাওড়া স্টেশনে রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে আরম্ভ করে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার এই শৈশবেই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলেও প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রেই প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। স্পষ্টতই সমসাময়িককালের প্রধানতম দুইটি সমস্যা—অত্যধিক কাজের সময় এবং অত্যন্ত নিম্ন মজুরির বিরুদ্ধেই এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়েছিল। সংগ্রামগুলি কোথাও সফল হয়েছে, কোথাও হয়েছে আংশিক সফল। আবার কোথাও সংগ্রামগুলি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। নিঃসন্দেহে এই সংগ্রামগুলির চরিত্র ছিল পুরোপুরি অর্থনৈতিক। কিন্তু এই

১। Ibid

২। Ibid.

সংগ্রামগুলির চরিত্র ও ধরন থেকে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে পুঁজিবাদী শোষণ ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার শৈশবেও মেনে নেয়নি এবং এই সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হলেও শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রেণী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সচেতনতার ভিত্তিতে লড়াই চালিয়ে গেছে। শ্রেণীসচেনতার উন্নয়ন সেই যুগে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ কথা বলা যায় শ্রেণীসচেনতার প্রাথমিক বিকাশ সেই প্রথম যুগের লড়াইগুলির মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই ঘটতে শুরু করেছিল

সংগঠিত এবং সচেতন শ্রেণী হিসাবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীব গড়ে উঠতে বিলম্ব ঘটেছিল একথা ঠিক। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। সেই কারণগুলি আলোচনার যোগ্য এবং এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছদে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকাটাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকা
জনগণের প্রতি অবিশ্বাস

প্রথম দিককার জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাই ছিল এর সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম-গ্রহণের সময় ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মানুষদের দিয়েই এই সংগঠনের কাঠামো তৈরী হয়েছিল। কংগ্রেস সংগঠনের মাধ্যমে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের নিকট যে দাবিদাওযা পেশ করেছিলেন তাও ছিল একমাত্র নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষদের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে তাঁদের আন্দোলনের আবেদন আদৌ প্রসারিত ছিল না। শহরের শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। আইনবিদ, চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, জমিদার এঁরা ছিলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে। দেশের ব্যাপকতর কৃষক জনগণ বা যে শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টি হতে শুরু করেছে তাঁদের সমস্যার প্রতি এই নেতৃত্বের কোন দৃষ্টি ছিল না। বিশেষ করে জমিদার এবং ভারতীয় পুঁজিপতিরা এই কংগ্রেসের আর্থিক দায়িত্ব অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন এবং এদের অর্থে যে সংগঠন পরিচালিত তার পক্ষে কৃষকদের বা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া এই বুর্জোয়া নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল খুবই সীমাবদ্ধ।

জনগণের উপর তাঁদের কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল না। তাঁদের ধারণা ছিল ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম পরিচালনার উপযুক্ত ছিল না। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল মনে করতেন যে ভারতবর্ষ ভৌগোলিকভাবে এত বিভক্ত এবং দেশের জনগণের অধিকাংশ এত অজ্ঞ এবং পুরানো অভ্যাস ও সংস্কারের প্রতি তারা এত মোহগ্রস্ত যে তারা যে কোন পরিবর্তনেরই বিরোধী। তদানীন্তনকালের এই নেতৃবৃন্দ জনগণের অশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানের অভাবটাই দেখেছিলেন, কিন্তু জনগণই যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা এই সত্যটি বুঝতে পারেননি।

কংগ্রেসের এই সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তির জন্য এবং বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন শ্রমজীবী মানুষের কাছে এই নেতৃত্ব তখন যেতে পারেনি। সঠিক বিশ্লেষণ করলে এককথাই বলতে হয় যে এই পরিস্থিতি ছিল তৎকালীন শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্বেরই বাস্তব প্রতিফলন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হল এবং সরকারী চাকুরী ইত্যাদি মধ্য ও উচ্চবিত্ত মানুষের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে দরবার শুরু করল, ঠিক সেই সময়ে ভারতের শ্রমিকরা দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমানো এবং মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

এই আন্দোলনগুলির তথ্য এই পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে যে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি বা কাজের ঘণ্টা কমানোর আন্দোলনের বিরোধিতা শুধুমাত্র ভারতের ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাই করেনি, ভারতীয় পুঁজিপতিরাও সমভাবে এর বিরোধিতা করেছে। ভারতের শ্রমিকরা কেবলমাত্র ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দিয়েই শোষিত হয়নি, ভারতীয় পুঁজিপতিদের দিয়েও শোষিত হয়েছে। টাটারা বোম্বাই শহরে 'স্বদেশী মিল' নাম দিয়ে কারখানা খুললেও এবং কারখানার নামের মধ্যে দেশপ্রেমের ছোঁয়াচ দেবার চেষ্টা করলেও ঐ মিলের ভারতীয় শ্রমিকদের শোষণ করবার ব্যাপারে কিন্তু টাটাদের বিবেকে কোন কিছুই বাধেনি বা তখন দেশপ্রেমের কথাও মনে হয়নি। এটাই ছিল ভারতীয় সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব পরবর্তী সময়ে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিনিধি ছিল এবং তাই শ্রমিকদের সংগঠিত করা বা তাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করতে কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই সময় আদৌ আগ্রহী ছিল না।

এই সময়ে ভারতে যে দুইটি ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয় তাকে বানচাল

করবার চেষ্টা ভারতীয় বুর্জোয়ারা দৃঢ়ভাবেই করেছিল। ফলে ভারতীয় শ্রমিকরা ঔপনিবেশিক দেশের শোষিত শ্রমিক হিসাবে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোমুখী হয়েছিল, তেমনি আবার কারখানায় তার ভারতীয় পুঁজিপতিদের মুখোমুখীও হয়েছিল।

১৮৮১ সালের প্রথম ফ্যাক্টরী এ্যাক্টে ৭ বৎসরের নীচে শিশুদের কারখানায় নিয়োগ বন্ধ করার বিধান ছিল এবং ৭ বৎসর থেকে ১২ বৎসরের শিশুদের জন্য মাসে ৪ দিন ছুটি দেবারও বিধান ছিল। ১৮৯১ সালের ফ্যাক্টরী আইনে আরও কিছু নতুন বিধান ছিল। শিশুদের কাজের বয়স সীমা ৭ থেকে ৯ বৎসরে তোলা হয়েছিল। ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের কাজের সময় দৈনিক ৭ ঘণ্টা করা হয়েছিল। নারী শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ১॥ ঘণ্টা বিশ্রাম ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ½ ঘণ্টা বিশ্রামের বিধান ছিল। ১৮৯১ সালের আইনে রবিবার ছুটির অধিকারও স্বীকৃত হয়েছিল। শ্রমিকদের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই আইন-গুলি পাশ হয়েছিল। এই সামান্য বিধি-নিষেধগুলিও ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকরা সমভাবেই লঙ্ঘন করে চলেছিল।

ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে চিত্রটি ফুটে উঠে তা হল শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ এবং ভারতীয় নির্বিশেষে পুঁজির আক্রমণ এবং এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধ। জাতীয় কংগ্রেসের যে আর্থসামাজিক ভিত্তি ছিল তাতে তার পক্ষে এই সংগ্রামে শ্রমিকদের স্বার্থ তুলে ধরার ক্ষমতা ছিল না।

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজের এই দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার বস্তুগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার বিকাশে যে ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য-গুলি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল সেই দিকটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য

উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের কোন পরিসীমা থাকে না এবং এই শোষণ চালানো হয় অত্যন্ত কুৎসিৎ ও বীভৎসরূপে। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ভারতীয় জনগণের অংশ হিসাবে কেবলমাত্র সামাজিক ও জাতিগত উৎপীড়নেরই স্বীকার হয়নি শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে এর উপর ধনতান্ত্রিক শোষণের অতিরিক্ত বোঝা চেপেছিল এবং আবার উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে এই বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছিল মারাত্মকভাবে।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী সরাসরি ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং বস্তুগতভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইটাই তার প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থই হচ্ছে অত্যন্ত নগ্নরূপে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী একনায়কত্ব। রাজনৈতিক এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের শর্তাবলী এবং ধনতান্ত্রিক শোষণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সফল অর্থনৈতিক সংগ্রাম নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। মুনাফার জন্য পুঁজিবাদের অন্তহীন ক্ষুধাকে এই অর্থনৈতিক সংগ্রামই কিছুটা বাধা দিতে পারে।

অপরদিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সমগ্র কাঠামোটাই শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাকে ক্রমাগত অবনতির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসন উপনিবেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং পাশাপাশি জাতীয় বুর্জোয়ারাও শ্রমিকদের উপর নগ্নতম শোষণ চালিয়ে বিদেশী শক্তির আরোপিত বিধিনিষেধের মোকাবিলা করার চেষ্টা করে এবং অত্যধিক মুনাফা অর্জন করে। এর ফলে শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রার দিক থেকে স্বাধীন দেশে ও পরাধীন দেশে কিছুটা পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ভারতের ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রী কার্যত কোন বিধিনিষেধ ব্যতিরেকেই বিক্রয় করে কিন্তু ভারতে প্রস্তুত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী এমনকি ভারতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও বহুবিধ বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ভারতের শ্রমিকদের উপর বর্বরতম কায়দায় শোষণের অন্যতম কারণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির এই সামঞ্জস্যহীন চরিত্র।

অধিকন্তু ঔপনিবেশিক শাসন সর্বহারাদের সংগঠিত হবার ক্ষেত্রে নানারূপ বাধার সৃষ্টি করে এবং ফলে সর্বহারাদের সংগ্রাম গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য হয়। অথচ এই বর্বর শোষণকে খর্ব করার ক্ষেত্রে এই সংগ্রামই হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। ভারতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বহারাদের সংগঠিত হওয়া এবং সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে।

ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের আরেকটি মারাত্মক প্রতিফল হচ্ছে শিল্পে ব্যাপকহারে নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ। ভারতের শ্রমিকরা তাদের শ্রম-শক্তির প্রকৃত মূল্যের একটা ভগ্নাংশ মাত্রই তারা মজুরি হিসাবে অর্জন করত। আবার এই উপার্জনের একটা অংশ চলে যেত মজুররা যে সুদখোরদের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিতে বাধ্য হত তার সুদ হিসাবে এবং মজুরির আরেকটি অংশ যেত সর্দারের নিয়মিত কমিশন হিসাবে। ফলে যে মজুরি তারা ঘরে নিয়ে

যেত তাতে কেবল একজনের জীবনধারণই কোনক্রমে সম্ভব হতো। এই অবস্থাতে শ্রমিকের পরিবারের নারী শিশুরাও কিছু না কিছু রোজগার করতে বাধ্য হতো।

শ্রমিকদের এই শোচনীয় রকমের কম মজুরি প্রথম আঘাত করত পরিবারের স্ত্রীলোকেদের। পুঁজিবাদী শিল্পায়ন সর্বত্রই স্ত্রীলোকদের চাকুরীর ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের চাকুরীতে প্রবেশেরও একটা পদ্ধতি আছে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে এমন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই স্ত্রীলোকেরা চাকুরীতে প্রবেশ করেছে যে এর ফলে তাদের সামাজিক জীবন, শিশু লালন পালন ইত্যাদি বিপর্যস্ত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অগ্রসর পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে এবং বিশেষ করে ইংলণ্ডে পরিবারের অবিবাহিত স্ত্রীলোকেরাই প্রধানত কারখানার চাকুরী গ্রহণ করত। বিবাহের পর তারা সাধারণত চাকুরী ত্যাগ করত এবং পরিবারের দেখাশুনার কাজেই ব্যস্ত থাকত। তৎকালে কিণ্ডারগার্টেন, ক্রেচ, ক্যাণ্টিন, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদির অভাবের ফলে স্ত্রীলোকরা কারখানায় কাজ করলে পরিবারে বিশেষ ক্ষতি হতো। পরে আস্তে আস্তে এই সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাশ্চাত্ত্য দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকতর হারে কল কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে পরিবারের কোন অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু ভারতে একজন শ্রমিক যা রোজগার করত তার দ্বারা পরিবারের স্ত্রীলোকদের গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব ছিল না। তাই ইংলণ্ডে যা ঘটেছে তার ঠিক বিপরীতভাবে বহু শ্রমিকের পরিবারের বিবাহিত স্ত্রীলোকরা কাজে যেতে বাধ্য হতো। বলাই বাহুল্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে কিণ্ডারগার্টেন, ক্রেচ ইত্যাদির কোন অস্তিত্বই ছিল না। বিবাহিত স্ত্রীলোকদের এভাবে কাজে যাওয়ার ফলে ভারতে শ্রমিকদের পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে এই শোচনীয় অবস্থা বরদাস্ত করতেই হয়েছিল কারণ এর একমাত্র বিকল্প ছিল পরিবার পরিজন নিয়ে উপবাস করা।

১৯০৪-০৫ সাল নাগাদ বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের যে তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাতে দেখা যায়, যে বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ ছিল নারী শ্রমিক। অবশ্য বিভিন্ন নির্মাণকার্যে নিযুক্ত কুলিদের মধ্যে নারী শ্রমিকের অনুপাত আরও বেশী ছিল। এই নারী শ্রমিকদের উপর শোষণও ছিল পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় তীব্রতর। ১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বস্ত্রশিল্পে নারী শ্রমিকদের মজুরি ছিল মাসে ৫ টাকা থেকে ১২ টাকা, যেখানে পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি ছিল মাসে

১২ টাকা থেকে ২০ টাকা। নারী কুলিদের দৈনিক মজুরি ছিল ৪।৫ আনা সেখানে পুরুষ কুলিদের মজুরি ছিল ৬।৭ আনা।[১]

নারী শ্রমিকদের মজুরি কম হলেও অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় তার কাজের বোঝা আদৌ কম ছিল না। উপরন্তু কারখানায় প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর তাকে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজও করতে হতো।

নারী শ্রমিকদের এভাবে কাজ করার ফলে শুধু যে ঐ নারীদের স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতো তা নয়। নারী শ্রমিকরা কারখানায় কাজে আসবার সময় শিশুদেরও সঙ্গে করে কারখানায় নিয়ে আসত এবং শিশুরা সারাদিন কারখানায় অপরিচ্ছন্ন এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকত। তা ছাড়া বহু শিশু কারখানায় শ্রমিক হিসাবেও কাজ করত। সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় শিশুরা কারখানায় নোংরা পরিবেশে থেকে তাদের মৃত্যুকেই ত্বরান্বিত করত।

এই ঔপনিবেশিক শোষণ শুধুমাত্র শ্রমিক ও তার পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করে তা নয়। এই শোষণ মানুষের নৈতিক জীবনের সবকিছুকেই ধূলিস্যাৎ করে দেয়। ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলির বীভৎস অবস্থায় শ্রমিকদের পক্ষে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনযাপন করা অসম্ভব ছিল। শ্রমিকদের পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশুরাই কারখানায় কাজ সংগ্রহ করতে পারত না। তাই তাদের বৃহত্তর অংশকে গ্রামেই থাকতে হতো। ফলে অধিকাংশ শ্রমিকই তাদের পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতে পারত না। এমনকি যে শ্রমিকদের পরিবার পরিজন শহরে ছিল তাদেরও প্রায় একই অবস্থা ছিল। তাই ঔপনিবেশিক শোষণ শুধুমাত্র সাবালক শ্রমিকদেরই নিপীড়ন করেনি, এই শোষণ শ্রমিকের পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুদেরও কারখানার জাঁতাকলে পিষে মারার ব্যবস্থা করেছে। এই পারিবারিক পরিস্থিতি এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশ, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদির অস্তিত্বহীনতা ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি সচেতন শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

১। Social & Economic Conditions of Bombay workers on the eve of the 1908 Strike. L. A. Gordon, p. 511-12, published in 'Tilak and the Struggle for Indian Freedom' and edited by I. M. Reisner and N. M. Goldberg.

স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন : 'সচেতনতার ভ্রূণাবস্থা'

ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রতিটি ধরনই শ্রমিকশ্রেণীর উপর দ্বান্দ্বিকভাবে একটি স্ববিরোধী প্রভাব সৃষ্টি করে। বস্তুগতভাবে এই শোষণ শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে গড়ে তোলে এবং বৃহৎ বৃহৎ কারখানাগুলিতে একত্রিত অবস্থানের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা একটি জঙ্গী শক্তি হিসাবে গড়ে উঠে। কিন্তু আবার ধনতান্ত্রিক শোষণ শ্রমিকদের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে তাদের রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করে। একমাত্র সক্রিয় সংগ্রামই এই অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এই কারণেই স্বতস্ফূর্ত সংগ্রামের একটা বিকাশমান ধারার মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা আসতে পারে। লেনিন বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে এই স্বতস্ফূর্ত সংগ্রামগুলি হচ্ছে 'সচেতনতার ভ্রূণাবস্থা'।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম যুগের স্বতস্ফূর্ত সংগ্রামগুলির অবদান এই পরিপ্রেক্ষিতেই উপলব্ধি করতে হবে। স্বতস্ফূর্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামগুলিই পরবর্তী যুগে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব ১৯০০-১৪

শতাব্দীর প্রারম্ভে

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ বাধাগ্রস্ত শিল্পোদ্যোগের প্রক্রিয়ায় উন্মেষিত ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিতে শিল্প শ্রমিকদের বিক্ষোভ-ধর্মঘটের উদ্দীপনায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। পূর্ববর্তী ইতিবৃত্ত থেকে এই ঘটনা প্রতীয়মান যে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং কারখানাভিত্তিক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘটকে সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও স্ফীততর হয়। ১৯০০ সালে ভারতে রেজিষ্ট্রিকৃত ফার্মের সংখ্যা হয়েছিল ১৩৬০ এবং লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬২,৮০০,০০০ টাকা। ১৯০৭ সালে ফার্মের সংখ্যা দাঁড়াল ২,৬৬১ এবং মূলধনের পরিমাণ ৫০৮,১০০,০০০ টাকা। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শুরুতে ফার্মের সংখ্যা হল ২.৫৫৩ এবং মূলধনের পরিমাণ ৭২১,০০০,০০০ টাকা।[১]

একদিকে শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আলোচ্য সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে আন্দোলনের যেমন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে রাজনৈতিক জাগরণ ও উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে উচ্চগ্রামে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। তাই দেখা যায় শতাব্দীর সূচনা থেকে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা সৃষ্টি। শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়, এই প্রথম দশকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট

১। Role of Private Enterprises in India—Prospect and Retrospect, Calcutta 1951 p. 2

রাজনৈতিক সংগ্রামেও অবতীর্ণ হতে সমর্থ হয়। আর এই উচ্চস্তরের সংগ্রামগুলি ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন—সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সৃষ্টিরও ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রথম দশকে ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা গবর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জনের শাসনে বঙ্গ-ভঙ্গ এবং সেই বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন যা ক্রমে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। ১৯০৫-০৮ সাল ব্যাপী বাংলা তথা ভারতের গণ-আন্দোলনের জোয়ার শ্রমিক-আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তাই এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের রূপকে সঠিক অনুধাবনের জন্য বঙ্গ-ভঙ্গ এবং তৎপরবর্তী সারাভারতব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলধারার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

বঙ্গ ভঙ্গের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যন্তে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহ সুস্পষ্ট সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশের দিকে অগ্রসর হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা সাধারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন এই বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐক্যবোধের সূচনা করে। কিন্তু বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের অসমান বিকাশ এবং ঔপনিবেশিক শাসন সেই অসমান বিকাশের সহায়ক হওয়ার দরুন ভারতের বিভিন্ন জাতির বিবর্তন একই সঙ্গে আরম্ভ হতে পারেনি। ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও দেশের বিভিন্ন অংশে অসমানভাবে বিকশিত হয়েছিল।

বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কতকগুলি অঞ্চল অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক অগ্রসর ছিল। এবং তারই ফলে কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে জাতীয় আন্দোলনের পথপরিক্রমা এই দুইটি প্রদেশে ব্যাপক জাতীয় জাগরণের সূচনা করে যার প্রভাব পরবর্তীকালে ব্যাপ্ত হয় সারা ভারতবর্ষে।

'ভারতে সর্বপ্রথম বাংলাতেই গণভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

'পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য-ব্যবস্থার মধ্যে বাংলার অন্তর্ভুক্তি পণ্য উৎপাদনের ব্যাপক প্রসার ঘটায় এবং ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তি প্রস্তুত করে।'[১]

বাংলার দুইটি প্রধান শিল্প—চট শিল্প ও কয়লাখনি শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে এই সময়। ১৮৮০ সালে বাংলায় যেখানে মাত্র ১৯টি চটকল ছিল সেখানে ১৯০৩ সালে চটকলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬। চট শিল্প, রেলওয়ে এবং জাহাজ পরিবহণের উন্নতি ঘটায় কয়লা শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে এবং ১৮৮০ সালে ৯,৩০,০০০টন কয়লা উৎপাদনের জায়গায় ১৯০৩ সালে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,৫০০,০০০ টন। ১৮৮০ সালে বাংলায় রেললাইনের দৈর্ঘ্য যেখানে ছিল ১,৪০৫ মাইল ১৯০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৫৭৮ মাইল।[২] এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে কলকাতা শহর ভারতের বৃহত্তম শহরে পরিণত হয় এবং ১৯১১ সালের সেন্সাসে কলকাতার জনসংখ্যা দশলক্ষ হিসাব করা হয়।

১৯০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়েই বঙ্গপ্রদেশ গঠিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষের অধিক এবং এর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসী ছিল বাঙালী। বাঙালীদের অর্ধেক ছিল হিন্দু এবং অর্ধেক মুসলমান। পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে ও উড়িষ্যায় ছিল হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য। বঙ্গপ্রদেশের আয়তন খুব বড় ছিল এই অজুহাতে বঙ্গপ্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গ মিলিয়ে ঢাকা শহরকে রাজধানী করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। এই নতুন প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা হল ৩ কোটি ১০ লক্ষ্য এবং এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হল ২ কোটি ৯০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা সহ কলকাতাকে রাজধানী হিসাবে রেখে বঙ্গপ্রদেশ নামে যে প্রদেশ রইল তাতে বাঙালীর সংখ্যা হল ১ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ ঐ প্রদেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। এই মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল হিন্দু।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অজুহাত যাই থাক না কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলাদেশে যে জাতীয় আন্দোলন

১। Social thought in Bengal in late 19th & early 20th centuries—E N. Komarov, contained in 'Tilak & the Struggle for Indian freedom', edited by I. M Reisner and N. M Goldberg.

২। Imperial Gazetteer of India, Vol II Bengal vol IX, Eastern Bengal & Assam, Oxford, 1908

সৃষ্টি হয়েছিল তাকে দুর্বল করবার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ইন্ধন জোগাবার দুরভিসন্ধি নিয়েই বঙ্গ-ভঙ্গ করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাদের ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যকে পরবর্তীকালে নিজেরাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বঙ্গ ভঙ্গের জল্লাদ লর্ড কার্জন স্বয়ং ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন,

'বঙ্গ-ভঙ্গ এই চরমপন্থী ব্যক্তি ও আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই চূর্ণ করেছিল। এই ব্যক্তিরা এমন একটা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল যখন তারা সমগ্র বাঙালী জাতির অখণ্ড শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের সংগ্রামে ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত হানতে পারবে।[১]

কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গের দ্বারা বাংলার জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পক্ষান্তরে বঙ্গ-ভঙ্গ ও লর্ড কার্জনের নিপীড়ন নীতি ১৯০৫-০৮ সালে সারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ই এন কোমারভের বিশ্লেষণ অনুযায়ী,

'বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সারা ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছিল। ঐ দেশের ইতিহাসে জাতীয়-বুর্জোয়া শ্লোগান নিয়ে এটাই ছিল প্রথম সংগঠিত এবং সচেতন গণসংগ্রাম।'[২]

৭ই আগষ্ট, ১৯০৫ কলকাতার টাউন হলে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জনসভায় যতদিন না বঙ্গ ভঙ্গ রোধ হয় জনগণের কাছে ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের আবেদন জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোমারভ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন,

'বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সদ্যজাত ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবির পিছনে জনগণকে সমবেত করেছিল। জাতীয় আহ্বানের রূপ নিয়ে বস্তুতপক্ষে ভারতীয় বুর্জোয়া বিকাশের দাবিকেই জনগণ সমর্থন দিয়েছিল।'[৩]

১। Hansard's Parliamentary Debates, 4th series, vol 19', House of Lords, quoted from 'social thought in Bengal in late 19th & early 20th centuries', E N Komarov.

২। Social thougut in Bengal in late 19th & early 20th centuries, E. N. Komarov.

৩। Ibid

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রমিক আন্দোলন

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং জাতীয় বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপোষক স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রভাব কেবলমাত্র বাংলাতেই সীমবদ্ধ থাকেনি। মহারাষ্ট্র এবং অন্যত্রও এই আন্দোলনের প্রভাবে ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। এই গণজাগরণে শ্রমিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বঙ্গ-ভঙ্গ এবং তা থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

বাংলার জাতীয়তাবাদীরা গণ-সংগ্রামে শ্রমিকদের আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিল। শ্রমিকদের আশু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবী-দাওয়াগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে এরা শ্রমিকদের এই সংগ্রামে সামিল করবার প্রয়াস চালিয়েছিল। শিল্প-শ্রমিকদের অংশগ্রহণ গণ-সংগ্রামে একটা জঙ্গী চরিত্র দান করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্ব পর্যন্ত শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে এই বৃহত্তর সংখ্যক শ্রমিকের পক্ষে সংগঠিত হওয়ার এবং গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবারও সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

রয়াল কমিশন অন লেবর ইন ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট থেকে আলোচ্যবিষয়ে শিল্প ও শিল্প শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ,

বস্ত্রশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের শ্রামক[১]

তালিকা নং ১৩

বৎসর	মিল	শ্রমিক
১৮৯২-৯৩	১২০	১,১৫,০০০
১৯০২-০৩	১৮৯	১,৬৭,০০০
১৯১২-১৩	২৪১	২,৪৪,০০০

চটকল ও চটকল শ্রমিক[২]

তালিকা নং ১৪

১৮৯২-৯৩	২৬	৬৬,০০০
১৯০২-৩	৩৮	১,১৯,০০০
১৯১২	৬৩	২,০১,০০০

১। **Royal Commission on Indian Labour, 1931.**

২। **Ibid.**

কয়লাখনি ও কয়লাখনি শ্রমিক[১]

তালিকা নং ১৫

বৎসর	খনি	গড়ে দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিক
১৮৯৬-১৯০০	১৯১	৬১,৩৬৭
১৯০১-১৯০৫	২৭৯	৮২,১৮৬
১৯০৬ ১৯১০	৪৩৭	১,০৪,৫০৬
১৯১১ ১৯১৫	৫৫৪	১,২৮,৮৮৪

এই সময়ে ফ্যাক্টরী ও শ্রমিকের মোট সংখ্যা বৃদ্ধির যে হিসাব রজনী পাম দত্ত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ[২],

তালিকা নং ১৬

বৎসর	ফ্যাক্টরীর সংখ্যা	গড়ে দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিক
১৮৯৪	৪১৫	৩,৪৯,৮১০
১৯০২	১,৫৩০	৫,৪১৬৩৪
১৯১৪	২,৯৩৬	৯,৫০,৯৭৩

স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতে শিল্পের এই অগ্রগতির বিরোধীই ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মেই শিল্প ও শিল্পশ্রমিকদের এই অগ্রগতি ঘটেছিল। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন এই শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার কাজ করে।

আলোচ্য সময়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রামগুলির মধ্যে কলকাতায় ভারত সরকারের ছাপাখানার কর্মীদের ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ধর্মঘট সংঘটিত হয় এবং একমাস ব্যাপী এই ধর্মঘট চলে। এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের মূল দাবী ছিল ওভারটাইম ভাতা বৃদ্ধি, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন কাজ করার জন্য অতিরিক্ত বেতন দান, শ্রমিকদের জরিমানা করা বন্ধ, অসুস্থতার জন্য ছুটি প্রদান। প্রথমদিকে এই শ্রমবিরোধের একটা মীমাংসা হয়। কিন্তু মীমাংসার পরই শ্রমিকদের ৭জন নেতা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন এবং তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় ধর্মঘট শুরু হয় এবং বহুসংখ্যক শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগদান করে। ধর্মঘটী

১। Royal Commission on Indian Labour, 1931

২। R. Palme Dutt, India To-day, p. 318

শ্রমিকরা ধর্মঘটের সমর্থনে যে সভাগুলির আয়োজন করেন তাতে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারাও ধর্মঘটকে সমর্থন করে ভাষণ দেন। ফলে ভারত সরকার এই ধর্মঘটকে রাজনৈতিক আখ্যা দিয়ে চরম দমননীতি প্রয়োগ করে। পরে অবশ্য সরকার শ্রমিকদের কতকগুলি দাবী স্বীকার করে নেন এবং ফলে ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯০৫ সালে কলকাতায় যে ধর্মঘটের জোয়ার শুরু হয় তাতে শুধু ছাপাখানার শ্রমিকই নয় আরো বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে হাওড়ার বার্ণ কোম্পানীর শ্রমিকরা এবং কলকাতার ট্রাম শ্রমিকরাও ধর্মঘট করেন। কলকাতা করপোরেশনের ২০০০ কুলি ও ঝাড়ুদার বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হন ঐ সময়ে এবং তাঁদের দাবি-দাওয়া অনেকাংশে স্বীকৃত হয়। ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে বজবজের ক্লাইভ জুট মিলসের একহাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। উন্নততর চাকুরীর শর্তাবলীর দাবিতে এবং ইউরোপীয় কর্তাব্যক্তিদের অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে এই ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এই সময় চটকল শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ ইউনিয়নের একজন নেতা এ. সি ব্যানার্জী ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় এই ধর্মঘট সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন যে ভারতীয়রা এখন ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে আত্মসম্মান নিয়ে জেগে উঠছে।

কলকাতায় এই সময় শ্রমিকদের কয়েকটি নতুন সংগঠনও তৈরী হয়। ১৯০৫ সালে ওয়ার্কিংমেনস্ ইনষ্টিটিউশন গঠিত হয়েছিল। ঐ বৎসর ২১শে অক্টোবর 'প্রিন্টার্স এণ্ড কম্পোজিটার্স লীগ' প্রতিষ্ঠিত হল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর পৃষ্ঠপোষকতায়।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গার্ডরা ধর্মঘট করেন। প্রায় ৯৫০ জন গার্ড এই ধর্মঘটে যোগ দেন। প্রচলিত বেতন-রীতির বিরুদ্ধেই এই ধর্মঘট পরিচালিত হয়।

এই যুগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক জাগরণের প্রভাবে যে শ্রমিক সংগ্রামগুলি মূর্ত হয় তার মধ্যে ১৯০৬ সালে জুলাই মাসে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে বেঙ্গল সেকশনের ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণ বৈষম্যের ভিত্তিতে বেতন হারের পার্থক্য এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে এবং উন্নত ধরনের বাসস্থান ইত্যাদির দাবিতে এই ধর্মঘট হয়। রেল শ্রমিকরা অপমানজনক 'নেটিভ' শব্দের পরিবর্তে 'ভারতীয়' কথাটি ব্যবহারের দাবিও করেন।

এই ধর্মঘট ভারতে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এই ধর্মঘট ছিল অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। লণ্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকা[১] মন্তব্য করে যে 'প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনই' এই ধর্মঘটের জন্য দায়ী ছিল। 'ইংলিশম্যান' ও অন্যান্য ব্রিটিশ মুখপত্রগুলিও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলিকে আড়াল করবার জন্য ধর্মঘটের পিছনে রাজনৈতিক প্রচারকদের কার্যকলাপকেই খুঁজিতে চেষ্টা করেছিল।

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া[২] এই ধর্মঘট সম্পর্কে লিখল, 'প্রায় সমস্ত নেটিভরাই কর্মত্যাগ করেছে। বর্ধমান সহ হাওড়া থেকে আসানসোল পর্যন্ত সমস্ত স্টেশনের কাজকর্ম স্তব্ধ। মালগাড়ী চলাচল কার্যত বন্ধ। পত্রিকাটি আরও লিখল এই ধর্মঘট কয়েকজন রেলকর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যারা 'আন্দোলনকারীদের বক্তৃতা শুনেছে এবং সংবাদপত্র পড়েছে।"

তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এই রেলশ্রমিক ধর্মঘট ছিল প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। ধর্মঘট ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ব্রিটিশ মালিক ও শাসকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অপরদিকে এই ধর্মঘট লাভ করে ব্যাপক গণসমর্থন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কেরানীদের ধর্মঘট (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) স্বদেশী মহলে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। শুধু ইউনিয়ন গঠনে সাহায্য নয়, প্রধানত রাজনৈতিক নেতাদের প্রচেষ্টাতেই যে এই ধর্মঘট হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইন থেকে আরম্ভ করে আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামালপুর, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ…জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত একটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ রিপোর্টের অংশ থেকে পাওয়া যাবে।[৩]

১। The Times London. Nov. 22. 1907.

২। Times of India, September 28, 1906.

৩। সুমিত সরকার স্বদেশীযুগের শ্রমিক আন্দোলন, ইতিহাস, নব পর্যায় দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪।

জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত রিপোর্টটির বক্তব্য নিম্নরূপ,

'Failing in their varied attenpts to coerce the Company into granting the extravagant demands set up by them on behalf of the strikers, the Calcutta agitators, chiefly Premtosh Bose, A. K. Ghose and Liakat Hussain, had since August transferred the Scene of their machinations to the railway centre of Asansol, Ranigang, Jamalpur and Sahibganj insisting the workmen there to join the Railway Union which they have started and which is to support all railway

ধর্মঘটী রেলশ্রমিকরা ২৯শে জুলাই কলকাতায় এক জনসভার আয়োজন করে। চিত্তরঞ্জন দাস ধর্মঘটীদের ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিপিনচন্দ্র পাল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয় 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের

workers who go on strike. Week after week meetings have been held first at one centre, then at another, at which the railway employees have been besought in language both seductive and seditious to gain their brethren of the Howrah district and thus force the Company into acceding to their demands. The opportunity has not been missed at these meetings to advance the Swadeshi cause and excite the men to boycott English goods Secret meetings have been held in Asansol and Calcutta and insidious attempts made to get even the coolies to join the strikers Travelling employees of the railway have used their opportunities to spread disaffection up and down the line, and suggestion was even thrown out that a social boycott should be employed to force the men to go on strike

—Report on the Anti-partition and Swadeshi movement in Bengal, drawn up by the special Branch of office of Inspector-General of Police, 7 September 1906, para 3; Home Public Progs B of govt. of India, October 1906 n 13.

বস্তুত ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের প্রথম যুগেই এই নতুন সৃষ্ট শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে চরম ঔপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা প্রত্যাঘাতের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল, এই প্রত্যাঘাত স্বাভাবিকভাবে ধর্মঘটের রূপেই মূর্ত হতো। এমনকি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এবং জঘন্য বর্বর পরিবেশে যে কয়লাখনি শ্রমিকদের কাজ করতে হতো তারাও এই প্রাথমিক স্তরে প্রায়শই বিক্ষিপ্ত ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করত। স্বদেশী আন্দোলন এই প্রবণতাকে তীব্র করেছিল এবং কিছুটা সংগঠিত করেছিল। শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য মিঃ বি. ফোলে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক শ্রমিক বিষয়ক তদন্তে নিযুক্ত হন। তাঁর রিপোর্টে বাংলাদেশের কয়লাখনি শ্রমিকদের সংখ্যা দেখা যায়:

বৎসর	দৈনিক নিযুক্ত গড় শ্রমিক
১৮৯৪	৩০,৭৭৩
১৯০৩	৭৪,৫৩৮
১৯০৪	৭৫,৭৪৯

প্রতি কলকাতার নাগরিকদের এই সভা আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করছে। এই সভা শ্রমিকদের দাবি ন্যায়সংগত বলে মনে করে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার জন্য সভা শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। এই সভার মত যে যারা ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় কারণে ধর্মঘটে যোগ দেননি তাঁরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিন।'[১]

ব্রিটিশ সরকার এই ধর্মঘট দমন করবার জন্য ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রতিটি স্টেশনই পুলিশ বাহিনীর দখলে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রেলশ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল, পিকেটিং ইত্যাদি সংগঠিত করেন। দুর্ভাগ্যবশত প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট দমন করতে সমর্থ হয়। ধর্মঘটের পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এমন বহু সক্রিয় কর্মীকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এমনকি ২০-২৫ বৎসর ধরে কর্মরত কর্মচারীদেরও বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ভারতের এই প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট বৃথা যায়নি। এর প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল ভারতের সমস্ত রেলওয়েতে। এই ধর্মঘটই সৃষ্টি করে ভারতের প্রথম রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন।

রেলশ্রমিকরা এ বৎসরের আগস্ট মাসে জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে পুনরায় ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘটের সময় শ্রমিকরা পুলিশী আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হন।. ১৯০৬ সালের এই ধর্মঘটের ফলশ্রুতিই ছিল ১৯০৭ সালে সারা ভারত জুড়ে রেল শ্রমিকদের তৎকালীন বৃহত্তম ধর্মঘট।

এই সংখ্যা উল্লেখ করার পর মিঃ ফোলে এই কয়লাখনি শ্রমিকদের সম্পর্কে ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলোন চেম্বার অফ কমার্স-এর ৬ই জানুয়ারী ১৯০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে শ্রমিক সম্পর্কিত এক প্রস্তাবে চেম্বার অফ কমার্সের অন্যতম সদস্য স্যার ই, কেবল-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন, 'I can confirm the statement that labour is yearly becoming more and more difficult to prccure, is insisting up n higher wages, and is evincng greater willingness to strike upon the slightest pretext.' Report on Labour in Bengal, 1906 by B. Foley, M. A. Indian Civil Service.

রিপোর্টটিতে তৎকালীন কয়লাখনি শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রবণতাকেই পরিস্ফুটিত করে।

১। **Bengalee 31st, July, 1906**

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্রিটিশ মালিকানাধীন হুগলী জুট মিলে ধর্মঘট হয়। রাত্রি-শিফ্ট প্রচলন করা এবং মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট পরিচালিত হয়। একই সময় একটি সুতাকলের শ্রমিকরাও ধর্মঘট করেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া সংবাদ ছেপেছিল যে জাতীয় আন্দোলনেব প্রচারকরা কলকাতার আশেপাশে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে যাতায়াত শুরু করেছে এবং এই শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করছে। ঐ পত্রিকাতে আরও বলা হয় যে এই প্রচারকরা ছিল 'জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ অংশ'। পরবর্তীকালে অবশ্য কংগ্রেসের এই অংশকে যারা শ্রমিকদেব সঙ্গে নেবার চেষ্টা করেছিলেন তাদের বলা হয়েছে—'ব্যাডিক্যাল ন্যাশানালিষ্ট'।

বাংলাব তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিপিন চন্দ্র পাল শ্রমিকদেব দাবি-দাওয়াগুলিকে সমর্থন কবেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসও এই ব্যাপাবে অগ্রণী হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অপূর্ব কুমাব ঘোষ, এস. হালদাব প্রমুখ জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরাও শ্রমিকদেব স্বার্থের সপক্ষে বলেছেন। এঁরা মূলত ব্রিটিশ পবিচালিত শিল্পগুলিতেই শ্রমিকদের আন্দোলনে উৎসাহিত করেন। দেশী শিল্পপতিদেব বিষয়ে এঁবা অনেকাংশই ছিলেন নীরব। স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তাধাবার এটাই ছিল অনিবার্য ফল।

১৯০৫ সালে বাংলার সাম্রাজ্যবাদ-বি রোধী রাজনৈতিক গণ-জাগরণে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীব দৃষ্টিভঙ্গীব সীমাবদ্ধতা শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া নেতৃত্বেরই আওতাধীন করে রেখেছিল।

অন্যান্য রাজ্যে অন্দোলন

১৯০৫ সালে বোম্বাই-এর বস্ত্রকলগুলিতে অনেকগুলি ধর্মঘট সংঘটিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের ফলে কারখানাগুলিতে কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং এই কাজেব ঘণ্টা বৃদ্ধির বিরুদ্ধেই ছিল এই ধর্মঘটগুলি। ১৯০৭ সালে বেতন বৃদ্ধির দাবিতেও বস্ত্রকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। কোন কোন ধর্মঘট এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল।

১৯০৬ সালের ১৭ই আগষ্ট বোম্বাই-এর ডাকবিভাগের পাঁচশত কর্মী বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেন। ঐ ধর্মঘট এক সপ্তাহের অধিক স্থায়ী

হয়েছিল।[১] ফলে ডাক বিভাগের সমস্ত কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার ধর্মঘটের ছয়জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন।

১৯০৩ সালে মাদ্রাজেও ভারত সরকারের ছাপাখানার মেশিন ডিপার্ট-মেণ্টের শ্রমিকরা ওভার টাইমের জন্য অতিরিক্ত ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেন। ধর্মঘট প্রায় ৬ মাস স্থায়ী হয়। ধর্মঘটীদের মনোবল এত দৃঢ় ছিল যে সরকার এই ধর্মঘট কিছুতেই ভাঙতে পারেননি। পরিশেষে সরকার কয়েদী-দের দিয়ে এই ছাপাখানা চালু রাখবার চেষ্টা করেন। ধর্মঘটী শ্রমিকেরা অশেষ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করেন।[২]

আমেদাবাদেও এই সময় কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সরবরাহ কম ছিল। আমেদাবাদের শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবী করেন এবং ঐ সময় কয়েকটি আংশিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।[৩]

১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরী কমিশনের কাছে বোম্বাই-এর শিল্প মালিকরা অভিযোগ করেন যে সম্প্রতি রীতিমত ধর্মঘট সংগঠিত হচ্ছে এবং ধর্মঘট-গুলি সফল হচ্ছে।'[৪] আমেদাবাদের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন যে 'বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই ধর্মঘট হচ্ছে এবং মালিকরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন অন্যথায় অন্যান্য মিলের শ্রমিকরাও উত্তেজিত হবে।'[৫]

প্রকৃতপক্ষে এই সময় তীব্রতা এবং সংখ্যা উভয় দিক দিয়েই ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই-এর ডাইরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ বলেন যে 'শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন না থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা জোটবদ্ধ হতে পারত এবং তারা মালিকদেব বিরুদ্ধে ছিল সর্বশক্তিমান।[৬]

এই ধর্মঘটগুলি সম্পর্কে ফ্যাক্টরী কমিশন মোটামুটি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে বলে যে,

'বোম্বাই-এর এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলির আন্দোলনের ইতিহাস

১। **Ahmed Mukhtar, Trade Union and Labour Disputes in India, pp 15-16.**

২। **Ibid.**

৩। **Ibid.**

৪। **British Parliamentary Papers, 1909 vol L XIII.**

৫। **Ibid.**

৬। **Ibid.**

সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে যে শ্রমিকরা স্থানীয় ধর্মঘটের উপযোগিতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলেও এবং অনেক বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রেই মালিকদের দাবি-দাওয়া মানতে বাধ্য করলেও শ্রমিকরা ব্যাপকতর অঞ্চলে সমবেত সংগ্রামের দ্বারা সাধারণ দাবিদাওয়া আদায় করতে তখনও অসমর্থ ছিল।'[১]

ওয়ার্দ্ধার ব্রিটিশ ডেপুটি কমিশনার শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতার উন্মেষ লক্ষ্য করে ভীত হয়ে মন্তব্য করেন,

'শ্রমিকরা সমস্ত পরিস্থিতিকে নিজেদের আয়ত্বে রেখেছে এবং প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের চেয়ে মিলমালিকদের স্বার্থরক্ষারই প্রয়োজন বেশী।'[২]

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই তীব্র সংগ্রাম ভারতের শ্রমিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করল। ল্যাংকাশায়ারের ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে ভারতের সস্তা শ্রম, অধিক সময় খাটানো ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিচ্ছিল। এই অবস্থায় ১৯০৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বস্ত্রকল শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য টেক্সটাইল ফ্যাক্টরী লেবার কমিটি গঠন করা হল। ১লা জুন, ১৯০৭ এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল এবং কাজের সময় দৈনিক ১২ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করার সুপারিশ করা হল। তাছাড়াও রিপোর্টে অন্যান্য বক্তব্যে শ্রমিকদের উপর তীব্র শোষণের কথা স্বীকার করা হল। অন্যান্য সুপারিশগুলির সঙ্গে শ্রমিকদের বাসস্থানের ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল এই রিপোর্টে।[৩]

বোম্বাই এবং কানপুরের ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা দৈনিক কাজের সময়কে ১২ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করতে আপত্তি করল। আবার বোম্বাই-এ ভারতীয় মিলমালিকদের সংগঠন দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত দুইবার ঘোষণা করলেও এই সংগঠনের ভারতীয় সদস্যরা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে অস্বীকার করল। দেখা গেল শোষণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকদের চরিত্র একই এবং এরা একই সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে দৈনিক কাজের সময় কমানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল।

১। Report of the Factory Labour Commission, 1908 Vol I.

২। Ibid.

৩। Report of the Textile Factory Labour Committee, 1906, London, 1907.

১৯০৬-০৭ সালের শ্রমিক আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং এই আন্দোলন সমস্ত শিল্পে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে ঔপনিবেশিক সরকার বস্ত্রকল ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ১৯০৭ সালের শেষদিকে ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন মিঃ মরিসন।

বস্ত্রকল মালিকরা যেমন এখানেও তেমনি অন্যান্য শিল্পের ভারতীয় মালিকরা কাজের সময় বেঁধে দেওয়ার বিরোধিতা করলেন এবং দাবি করলেন যে শ্রমিকদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হবে।[১] সমসাময়িককালের একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পপতি ভি. ডি. থ্যাকারসে যিনি ঐ ফ্যাক্টরী কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনি ভারতীয় মালিকদের এই মন্তব্য তার 'নোট অব ডিসেণ্টে' লিপিবদ্ধ করেছেন।[২] শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ভারতের পুঁজিপতিরা শ্রেণীগতভাবে কতখানি ঐক্যবদ্ধ আরেকবার তার প্রমাণ তাঁরা দিলেন।

নিশ্চিতভাবে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাও কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করলেন। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান দাবি করলেন যে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করা চলবে না। আগ্রায় একজন ব্রিটিশ পুঁজিপতি সরাসরিই বললেন যে ব্রিটেনে শ্রমিকদের কাজের সময়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির মতামত গ্রাহ্য করা হলেও ভারতে ঐরকম কোন কিছু তিনি সহ্য করতে রাজী নন। এর থেকে আবার দেখা গেল যখন শ্রমিকদের তীব্রতম শোষণ করার প্রশ্নটি দেখা দেয় তখন ভারতীয় পুঁজিপতি এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মধ্যে পার্থক্য আর থাকে না।[৩]

১৯০৭ সালে ব্যাপক রেলশ্রমিক ধর্মঘট

রেলশ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি এবং পাশাপাশি কাজের প্রচণ্ড চাপ বৃদ্ধির ফলে ১৯০৭ সালে রেলশ্রমিকরা তীব্রতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল। ১৯০৫-০৮ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণজাগরণে রেলশ্রমিকদের অবদান ছিল অসামান্য।

১। Report of Indian Factory Labour Commission, 908 Vol. II.

২। Ibid.

৩। Ibid.

কর্তৃপক্ষের নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে বৃহৎ বৃহৎ রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১লা মে বোম্বাই-এর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ৩১০০ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু দাবিদাওয়া আদায় হওয়ার পরই মাত্র এই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

১৯০৭ সালে বৃহত্তম ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করেন পূর্বভারতের রেল শ্রমিকরা। ১৮ই নভেম্বর গার্ড এবং ইঞ্জিন ড্রাইভাররা ধর্মঘট শুরু করেন। এই ধর্মঘটী কর্মচারীরা অধিকাংশই ইংরেজ অথবা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন। ধর্মঘটীদের মধ্যে ভারতীয়রা ছিলেন সংখ্যাল্প। ধর্মঘটীদের দাবিদাওয়াও ছিল অর্থনৈতিক। কিন্তু এই ধর্মঘট দেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল এবং ভারতীয় জনগণের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ়তা এবং তার পরিচালিত গণসংগ্রামের শক্তি আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল।

আসানসোল স্টেশনে এই ধর্মঘট প্রথম শুরু হয়ে এলাহবাদ ও টুণ্ডলা পর্যন্ত প্রসাবিত হয়ে পড়ে। শ্রমিকরা মোট ৪৩ দফা দাবিতে এই ধর্মঘট করেন। চাকুরীর শর্তাবলীর উন্নতিবিধান, প্রচলিত সময়ভিত্তিক মজুরিদানের প্রথার বিরুদ্ধে দূরত্বভিত্তিক মজুরি প্রথা প্রচলন, জরিমানা ও অন্যান্য আর্থিক শাস্তির মাধ্যমে বেতন কেটে নেওয়ার স্বৈরাচারী পদ্ধতির পরিবর্তন এবং অন্যান্য দাবি ছিল এই দাবিসনদের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মঘট এত সফল হয়েছিল যে কলকাতায় কোন ট্রেন আসেনি, কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের একটি ট্রেন এই লাইনে চালাবার চেষ্টা করে এবং বিপিন পাল সহ কিছু বন্দীকে আসানসোল থেকে ঐ ট্রেনে আনবার চেষ্টা করে কিন্তু ২০০ রেলশ্রমিক রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সরকারের ঐ অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। হাওড়া স্টেশনের শ্রমিকরা সভা করে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া এবং হাওড়া স্টেশন থেকে কোন ট্রেন যেতে না দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ফলে মালগাড়ীর প্রায় ৩০০ ওয়াগন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল এবং শত শত যাত্রীও স্টেশনে আটকে পড়লেন। ২০শে নভেম্বরের মধ্যে কানপুর ও এলাহবাদ ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ল। হাওড়া-কালকা লাইনে কোন গাড়ী চলাচল করল না। এই অচলাবস্থার পরিস্থিতিতে কলকাতার কারখানাগুলিতে কয়লার অভাব ঘটল এবং কলকাতা বন্দরেও জাহাজগুলি আটক হয়ে রইল কারণ রেল চলাচল না হওয়াতে জাহাজগুলি ভর্তি করা বা খালাস করা গেল না। ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে ১০০০ খালি ওয়াগন এবং ৪০০ মালভর্তি ওয়াগন আটক হয়ে রইল। ধর্মঘট বর্দ্ধমান, আসানসোল, মোগলসরাই, এলাহাবাদ,

টুণ্ডুলা, কানপুর, আম্বালা ইত্যাদি বিভিন্ন স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ে রেল চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিল।

কর্তৃপক্ষ তখন দমননীতির আশ্রয় নিলেন। স্টেশনগুলিতে সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করা হল। হাওড়া স্টেশনকে সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হল। অন্যান্য স্টেশনগুলিও পুলিশ-মিলিটারীর দখলে গেল। বিশেষ করে আসানসোল স্টেশন সৈন্যবাহিনীর দুর্গে পরিণত হল। সৈন্য ও পুলিশ দিয়ে ধর্মঘটীদের সন্ত্রস্ত করার কাজ সরকার আরম্ভ করলেন।

কিন্তু পরিণাম হল বিপরীত। ধর্মঘট বেঙ্গল—নাগপুর রেলওয়েতেও বিস্তার লাভ করল। ঘটনার এই গতিতে সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীমহল আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ২৪শে নভেম্বর খড়্গপুরে রেলওয়ে গার্ডরা ধর্মঘট করলেন। বেঙ্গল—নাগপুর রেলওয়ের ইঞ্জিন ড্রাইভার দিয়ে পার্শ্ববর্তী লাইনে গাড়ী চালনার চেষ্টা সরকার করে কিন্তু এতে ড্রাইভারদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। কিন্তু এই রেলওয়েতে ধর্মঘট ২৪ ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হয়নি কারণ কর্তৃপক্ষ একটা শান্তি কমিটি স্থাপন করে ধর্মটীদের দাবিদাওয়া মীমাংসার প্রতিশ্রুতি দেয়, মজুরি কাটা বন্ধ, জরিমানা আরো সীমাবদ্ধ করা নতুন ইন্‌সিওরেন্স ফাণ্ড রুল চালু করা ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

কিন্তু এই ধর্মঘট মিটতে না মিটতেই আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘটের নিশ্চিত আশংকা সৃষ্টি হল।

২৪শে নভেম্বর বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স কর্তৃপক্ষের কাছে এক বিশেষ বার্তা প্রেরণ করে অনুরোধ করল যে রেলশ্রমিকদের বিরোধগুলি মীমাংসার জন্য গ্রেট বিটেনের প্রচলিত প্রথামত যেন একটা সালিশী বোর্ড গঠন করা হয়। পরদিনই সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ২৮শে নভেম্বর, ১৯০৭ রেল-শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে 'সালিশী বোর্ডের' নিকট দাবিদাওয়া পেশ করতে রাজী হলেন। কানপুরের রেলওয়ে শ্রমিকরাও একই শর্তে কাজে ফিরে এলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে এই ব্যাপক ধর্মঘট ১৮ই নভেম্বর থেকে ২৮শে নভেম্বর ১৯০৭, এই দশ দিন ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল এবং এই ধর্মঘটের ফলে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। লেভ্‌কভস্কি মন্তব্য করেছেন, 'এটা ছিল ব্রিটিশ

শাসনের মর্যাদার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত—এমন একটা আঘাত যা সরকারের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসকেই শিথিল করে দিয়েছিল।'[১]

লেভ্‌কভস্কী আরো মন্তব্য করেন, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে নভেম্বর মাসের ধর্মঘট যদিও প্রধানত ব্রিটিশ এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রেলশ্রমিকদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং এই ধর্মঘটের দাবিদাওয়াও ছিল অর্থনৈতিক, তা সত্ত্বেও এই ধর্মঘট জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না। আমাদের মতে একমাত্র শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠার পরিস্থিতিতেই এইরকম একটা ধর্মঘট সংগঠিত হতে পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এই দশ দিনের ধর্মঘট ভারতের সর্বস্তরের জনগণের কাছে বিশেষ করে পূর্বভারতে, সর্বহারার গণসংগ্রামের শক্তি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ভারতের শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং কলকাতার চরমপন্থীরা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছিলেন।'[২] আসানসোলে জাতীয়তাবাদী নেতারা রেলশ্রমিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং কলকাতায় ধর্মঘটের সমর্থনে ইস্তাহার বিলি করা হয়। ঐ ইস্তাহারে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি মুদ্রিত ছিল।

সারা দেশে রেলওয়েতে শ্রমিকদের মধ্যে এই সময় যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ধর্মঘট ছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন। কিন্তু এই অসন্তোষ কোথাও সীমাবদ্ধ রইল না। ১৯০৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘট আরম্ভ হল। এবার ইঞ্জিন ড্রাইভার ফায়ারম্যান ও ব্রেকম্যানরা উচ্চতর মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করলেন। ধর্মঘটের ফলে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হল। সরকার সৈন্যবাহিনী তলব করলেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ট্রেন চালানোর চেষ্টা করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে সরকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর তীব্র দমননীতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ৬০০ ধর্মঘটী শ্রমিককে বরখাস্ত করে দেওয়া হল এবং অন্যান্য নানা কায়দায়ও শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে শায়েস্তা করার চেষ্টা হল। ১৯০৮ সালের শুরুতে ধর্মঘট কার্যত শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বাই-এর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ৮০০০ শ্রমিক জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পুনরায় ধর্মঘট করেন। শ্রমিকদের দাবি আংশিকভাবে মীমাংসা হলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

১। **A. I. Levkovosky, The Labour movement & the Development of the Freedom Struggle (1905-08)**

২। **Ibid,**

বোম্বাই শহরে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট— রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে বোম্বাই শহরে। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ধর্মঘটের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করতে হলে সমসাময়িককালে বোম্বাই শহরের শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ, তার আয়তন, চেতনা এবং তারই সঙ্গে বোম্বাই-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃতি ও স্তর সম্পর্কিত কিছুটা উপলব্ধি প্রয়োজন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বোম্বাই শহর ছিল জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং ভারতের দুইটি বৃহত্তর শিল্পকেন্দ্রের অন্যতম। ১৯১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী বোম্বাই এর জনসংখ্যা ছিল ৯,৭৯,০০০।[১] ১৯ ৮ সালে ফ্যাক্টরী এ্যাক্টে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ১৬৮টি। ১৯০৬ সালে জনসংখ্যার শতকরা মোট ৩৪ ভাগ শিল্প, নির্মাণকার্য, যানবাহন এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিল।[২] কিন্তু এই শহরের শিল্প বিকাশ কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রধান শিল্প এবং ফলে এই শহরের শিল্পের বিকাশও ছিল একপেশে। শহরের বৃহৎ শিল্পগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৮০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ এর মধ্যে। এর মধ্যে ১,০০,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন একমাত্র বস্ত্রশিল্পেই। এ ছাড়াও আরো প্রায় ১ লাখ শ্রমিক ছিলেন শহরে যারা কুলি এবং অন্যান্য প্রকার অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করত।

বোম্বাই-এর মোট জনসংখ্যার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ছিল। মারাঠীদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫১ ভাগ, গুজরাটী ২৬ ভাগ, জনসংখ্যার বাকী অংশ ছিল অন্যান্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য ভাষাভাষী লোক। শহরের মোট জনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশের বা ভাষাভাষী মানুষের সমাবেশ ছিল শহরের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের বা ভাষাভাষী মানুষের সেই অনুপাত ছিল না। ১৯১১ সালের সেন্সাসের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে বোম্বাই শহরে বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে মারাঠীদের

১। Census of India, 1911, Calcutta, Vol I, part 2, p 420

২। Ibid p. 107.

সংখ্যা ছিল শতকরা ৯০ ভাগ[১] এবং অন্যান্য শিল্পেও মারাঠীদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগের কম ছিল না।

মারাঠীদের এই সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, তেলেগু এবং অন্যান্য ভাষাভাষী শ্রমিকরাও ছিলেন, ফলে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্র বহুজাতিকই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে মারাঠীদের এই সংখ্যাধিক্যের ফলে মহারাষ্ট্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা অনেক সহজ-সাধ্য হয়েছিল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস সঠিকভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ধর্ম ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। বোম্বাই-এর শ্রমিকদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই ছিল হিন্দু এবং বাকী অংশ মুসলমান। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যে জাতীয় আন্দোলন বিকাশলাভ করেছিল তা ধর্মকে বাদ দিয়ে হয়নি। রাজনৈতিক আবেদনের সঙ্গে ধর্মের আবেদনও মিশ্রিত ছিল। বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ জাতীয় নেতারা যে রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছিলেন তাতে হিন্দু ধর্মের বহিরাবরণ ছিল সুস্পষ্ট। বিশেষ করে শিবাজীকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে শিবাজীর বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামকে আদর্শ হিসাবে উপস্থিত করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের কাছেই বেশী আবেদনশীল ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। মোট কথা, বোম্বাই-এর প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিকের ঘনসন্নিবদ্ধ সমাবেশ, তাদের ভাষা, জাতি ও ধর্মের মিশ্রণের অনুপাত মহারাষ্ট্রের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র ও প্রকৃতির সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ফলে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছিল অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র বিশেষ করে কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায়।

কলকাতার শ্রমিকদের মধ্যে অধিকসংখ্যক ছিলেন বহির্বঙ্গ থেকে আগত নিঃস্ব কৃষক। উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের দিয়েই গঠিত হয়েছিল কলকাতার বহুজাতিক ও বহু ভাষাভাষী শ্রমিকশ্রেণী। এরা নিজেদের অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে বহুদূরে কলকাতা শহরের এক ভিন্ন এবং অনভ্যস্ত সামাজিক পরিবেশে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ফলে কলকাতা

১। Ibid. p. 47-61.

শহর তথা বাংলার তৎকালীন বিকাশমান জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সেই শ্রমিকদের যোগসূত্র ছিল বোম্বাই-এর তুলনায় দুর্বল। ১৯০৫ সাল নাগাদ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলার জাতীয় আন্দোলনের যে বিকাশ ঘটে তা ছিল সারা ভারতের মধ্যে তীব্রতম। বাংলার রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের পরিস্থিতি ছিল উত্তাল, অর্থনৈতিক ধর্মঘটও বাংলার শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে হয়ে উঠেছিল ব্যাপক। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রের শ্রমিকদের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান যত সহজসাধ্য হয়েছিল, বাংলার শ্রমিকদের অবস্থানগত পার্থক্যের জন্য বাংলার সাধারণ জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতের মধ্যে তীব্রতম হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের পক্ষে সেই রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়া তত সহজসাধ্য ছিল না। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা কলকাতার তুলনায় বোম্বাই শহরেই প্রথম বিকশিত হয়। অবশ্যই রাজনৈতিক আন্দোলনের আরো বিকশিত স্তরে বাংলার শ্রমিকশ্রেণী অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর বহুজাতিক চরিত্র বাংলার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার উন্নততর বিকাশে অনুকূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামগুলি বস্তুগত-ভাবে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামগুলি ভারতীয় সমাজের সেই স্তরগুলি থেকেই সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে যে স্তরগুলির স্বার্থ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তেমনি আবার সমাজের যে স্তরগুলির স্বার্থ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল সেই স্তরগুলি শ্রমিকদের সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম বিশেষ করে বোম্বাই-এর শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম ভারতীয় সমাজের এই দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।

১৯০৫ সাল নাগাদ ভারতে যে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল বোম্বাই-এর শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম সেই প্রবাহেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। তা ছাড়া ১৯০৫-০৭ সালে রাশিয়ায় যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এবং সেই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের যে প্রধান হাতিয়ার ছিল রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট তার সম্মিলিত প্রভাবও ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছিল।

১৯০৫-০৭ সাল নাগাদ ভারতের শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের তীব্রতম

বিকাশ, বাংলা ও পাঞ্জাবের সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়েব ধর্মঘট, কলকাতার সরকারী ছাপাখানা এবং অন্যত্র ব্যাপক সংগ্রামের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপকতর গণ-আন্দোলন এবং জনগণেব বৈপ্লবিক ঝোঁক ভারতীয় বুর্জোয়াদেব মধ্যে সংকটের সৃষ্টি করেছিল যার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠল ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত সুরাট কংগ্রেসে। সুরাট কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেস তথাকথিত 'মধ্যপন্থী' ও 'চরমপন্থী' এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। মধ্যপন্থীরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা বললেন এবং সরকারেব সঙ্গে সহযোগিতার দাবি জানালেন এবং আন্দোলনে হিংসাত্মক পথ বর্জনের উপদেশ দিলেন। অপরদিকে তথাকথিত চরমপন্থীদেব প্রধান নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনেব আহ্বান জানালেন। গণ আন্দোলনেব বক্তব্য নিয়ে তিলক এবং তার অনুগামীরা শ্রমিকদের মধ্যেও গেলেন এবং তাদেব রাজনৈতিক গণ-সংগ্রামের শরিক কববার চেষ্টা করলেন। অবশ্যই এই কাজ তারা কোন উন্নত চেতনার বশবর্তী হয়ে করেননি। করেছিলেন নিজদের পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হয়েই। তিলক জনগণকে অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলন, বিশেষ করে রাশিয়ার ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণের আবেদন জানালেন। বিভিন্ন লেখায় তিলক ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপর ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রভাবের কথা তুলে ধরলেন। কিন্তু তাঁব শ্রেণীগত অবস্থানের সীমাবদ্ধতার দরুন চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধতা ছিল। তাই তিনি রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপকে যতখানি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন ততখানি গুরুত্ব দিয়ে রুশ শ্রমিকশ্রেণীব বিপ্লবী কার্যকলাপকে পর্যবেক্ষণ করেননি। তেমনি তিলক এবং তাঁর অনুগামীরা জাপানের জাগরণে পুলকিত হয়েছিলেন কিন্তু জাপানের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিলেন।

স্বভাবতই তাঁর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার জন্য তিলক জনগণের সংগঠিত বিপ্লবী কার্যকলাপের উপর জোর দিতে পারেননি অথবা শ্রমিকশ্রেণীকে একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবেও বিবেচনা করতে তিনি সক্ষম হননি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তৎকালীন ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর তিলকের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অসামান্য।

১৯০৮ সালের ২৪শে জুন তিলক বোম্বাই-এ গ্রেপ্তার হলেন। ব্রিটিশ

সরকার তদানীন্তন ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বৈপ্লবিক আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা এবং বিভিন্ন স্থানীয় অভ্যুত্থানে সন্ত্রস্ত হয়ে এই আন্দোলনের ঢেউকে ঠেকোবার চেষ্টা করলেন এবং তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করলেন। তথাকথিত বিচারে তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হল।

তিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষে তুমুল গণবিক্ষোভ সংগঠিত হল। জনগণ বিভিন্ন স্থানে হরতাল ইত্যাদি সংগঠিত করলেন। কিন্তু এই সংগ্রামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মঘট ও তৎসহ জনসাধারণের হরতাল পালন। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘটকে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা তাঁদের শ্রেণী স্বার্থেই কোন গুরুত্ব দিতে পারেননি। কিন্তু ভারতবর্ষে বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশে এই রাজনৈতিক ধর্মঘট সম্পর্কে ডি সি হোম তাঁর প্রবন্ধে মন্তব্য করেন,

'দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লিখিত ইতিহাসে অথবা জনগণের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলির মধ্যে এই ঘটনাটি তার উপযুক্ত স্থান পায়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা যারা আমাদের দেশের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছে অথবা বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা উভয়েই উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই ঘটনাকে চেপে দেবার চেষ্টা করেছে। কারণ একই, উভয়েই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সচেতন কার্যকলাপে মারাত্মকভাবে ভীত ছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী তাদের প্রথম মহান সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের শহীদদের স্মৃতি যত্নের সঙ্গে লালন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সংগ্রামের সমগ্র কাহিনীটি কখনই প্রকাশিত হয় নি।'[১]

ঐ ঘটনার গুরুত্ব সাম্রাজ্যবাদীরা ও বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা চাপা দেবার চেষ্টা করলেও ১৯০৮ সালেই লেনিনের চোখে এই সংগ্রামের অসীম গুরুত্ব ধরা পড়েছিল এবং এই ধর্মঘটকে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছিলেন,

'ভারতেও শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই সচেতন রাজনৈতিক সংগ্রামে উন্নীত হয়েছে এবং এর পরিণামে ভারতে রুশ ধরনের ব্রিটিশ শাসনের দিন ঘনিয়ে এসেছে।'[২]

১। **D. C. Home, Bombay workers' first political strike, New Age No 6, June 1953.**

২। **V. I, Lenin, The National Liberation movement in the East**

তিলকের বিচার চলাকালীনই বোম্বাই-এর জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। প্রথম সংঘর্ষ ঘটে ২৯শে জুন আদালতের সামনে অপেক্ষমান সহস্র সহস্র মানুষের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর। তারপর ১৩ই জুলাই থেকে যখন বিচার শুরু হয় তখন থেকে সেই সংঘর্ষ তীব্রতর রূপ ধারণ করে। ঐদিন সশস্ত্র ফৌজ বোম্বাই-এর রাস্তাগুলি ঘিরে রাখে যাতে কারখানা অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা কোর্ট অঞ্চলে আসতে না পারে। ব্রিটিশ শাসকরা শ্রমিকশ্রেণীর মেজাজ উপলব্ধি করেই এই ব্যবস্থা নিয়েছিল। ১৩ই জুলাই সকালবেলা গ্রীভস, কটন এণ্ড মিলসের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসেন। সশস্ত্র ফৌজ শ্রমিকদের মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এই ঘটনার উল্লেখ করে এ. আই. চিচেরভ লিখেছেন,

'এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে বিচারের প্রথম দিনেই তিলকের সমর্থনে আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্টগুলি ফুটে ওঠে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বোম্বাই এর শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং এই গণমিছিলে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। লেনিনের ভাষায় জনগণ তাদের লেখক ও নেতৃবৃন্দের সমর্থনে জেগে উঠতে শুরু করেছে··· এভাবে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর গণবিক্ষোভ নিজেদের রাজনৈতিক শিক্ষার একটি মাধ্যম হিসাবে পরিণত হয়েছিল এবং শহরের গরীবদের এই পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগ্রামে টেনে নিয়ে এসেছিল।'[১]

বাস্তবিকভাবে শ্রমিকদের এই মিছিলে বোম্বাই-এর সমগ্র জনগণই যোগ দান করেছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার সৈন্য বাহিনী দিয়ে মিল অঞ্চলগুলিকে এমনভাবে ঘিরে ফেলেছিল যাতে শ্রমিকরা শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে না পারে।

১৪ই, ১৫ই, ১৬ই জুলাই একইভাবে আন্দোলন চলল: ১৭ই জুলাই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ব্যাপকতর হল। মধ্যাহ্নের পর লক্ষ্মীদাস, গ্লোব, ক্রিমেণ্ট, জামশেদ, নারায়ণ, করিমভাই, মহম্মদভাই, ব্রিটানিয়া, ফোনিকস, গ্রীভস, কটন এণ্ড কোং এবং আরও অনেকগুলি মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলেন। ব্রিটিশ বা ভারতীয় মালিকানাধীন উভয় ধরনের শিল্পের

১। **A. I. Chicherov, Tilak's trial and the Bombay political strike, of 1908, P. 598.**

শ্রমিকরাই ধর্মঘট করলেন। ২০,০০০ শ্রমিকের মিছিল শিল্পাঞ্চল পরিভ্রমণ করে সমস্ত কারখানায় শ্রমিকদের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আবেদন জানালো। ১৮ই জুলাইও একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। কিন্তু পুলিশ ঐদিন শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করল। ১৯শে জুলাই বোম্বাই এর মহিম ও প্যারেল অঞ্চলের প্রায় ৬০টি কারখানায় ৬৫,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলেন, ২০শে জুলাই শ্রমিকদের উপর আবার গুলি চলল। শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে ডক শ্রমিকরা, ছোটখাট ব্যবসা, দোকান ও বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষরাও সংগ্রামে সামিল হল। ২১শে জুলাই ধর্মঘট আরও বিস্তার লাভ করল। ডকের এক হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ২২শে জুলাই ৫ জন ধর্মঘটী শ্রমিকের বিচার হল এবং তাদের সাজা হল। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মন্তব্য অনুযায়ী ধর্মঘটীদের বিচার কর৷ হয়েছিল, 'অন্যান্য ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছে অপরাধের গুরুত্বটাকে বোঝানোর জন্যই। অপরাধীদের এমন সাজা দেওয়া হয়েছিল যাতে তা একটা উদাহরণ হয়ে থাকে।'[১]

২২শে জুলাই তিলকের বিচারের শেষ দিন। ঐ দিনটা ছিল প্রচণ্ড দুর্যোগপূর্ণ। ঝড় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ উচ্চ আদালতের সামনে সমবেত হলেন। তিলককে ছয় বৎসর কারাবাসের সাজা দিয়ে আদালত থেকে গোপনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। ক্রুদ্ধ জনতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থানত্যাগ করল। কিন্তু শ্রমিকরা একটা কর্মসূচী নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ডি. সি হোমের ভাষায় 'শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন।' এবং পরদিন ২৩শে জুলাই প্রথম 'সফল হরতাল অনুষ্ঠিত হল।'[২]

২৩শে জুলাই থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধর্মঘট সংগ্রাম শুরু হল। বোম্বাই-এর শ্রমিকরা তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু করলেন।

ঐদিন ১,০০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করলেন এবং তার সঙ্গে বোম্বাই-এর সাধারণ জনগণ হরতাল পালন করলেন। শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে শহরের জনগণের ব্যাপকতম অংশ যোগ দিলেন।

২৪শে জুলাই জনতার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ

১। Times of India, July 25, 1908.

২। D. C. Home, Bombay workers' first political strike, New Age, No. 6, June, 1953.

শুরু হল। হিংস্র ব্রিটিশ শাসকরা শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রমিকরা ভীত না হয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। চলল বোম্বাই শহরের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ড যুদ্ধ। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর 'স্ট্রীট ফাইটিং'-এর হাতেখড়ি হল বোম্বাই-এর রাস্তায়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটল। ঐদিনে শ্রমিকদের প্রতিরোধের ঘটনা সম্পর্কে ডি. সি. হোম বলছেন,

'কোন রাজনৈতিক প্রশ্নে শ্রমিকদের সংগঠিত প্রতিরোধ সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে নজর দেয়নি। তারা নিশ্চিত ছিল যে, যে মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলার শ্বেতকায় প্রতীকরা দিগন্তে উপস্থিত হবে সেই মুহূর্তেই এই নেটিভ মজুররা মাছির মত পালিয়ে যাবে।[১]

তাই শ্রমিকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী অগ্রসর হল এবং শ্রমিকদের সামনে এসে ব্রিটিশ অফিসাররা শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ হবার আদেশ দিলেন। ডি. সি হোম লিখছেন,

'পুলিশের এটা বোধগম্য ছিল না যে তারা এমন একটা শ্রমিক জনতার মুখোমুখী হয়েছে যারা এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল এবং নিজের শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গিয়েছিল।'[২]

পুলিশের হিংস্র আক্রমণে শ্রমিকরা প্রথমে একটু পিছু হটলেও তারা আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে জমায়েত হল এবং পুলিশের গুলিবর্ষণের পাল্টা হিসাবে তারাও পুলিশের উপর প্রবলভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করে প্রতিরোধ শুরু করল। বোম্বাই-এর শ্রমিকরা অসীম বীরত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ-মিলিটারীর বিরুদ্ধে ইট পাটকেল দিয়ে লড়ল। কিন্তু এই অসম লড়াই-এ বেশীক্ষণ শ্রমিকরা টিকে থাকতে পারেনি। বহু শ্রমিক ঐদিন নিহত ও আহত হলেন। যাঁরা নিহত হলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল গণপত গোবিন্দ। এই শহীদটি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জনতাকে সাহসের সঙ্গে লড়বার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে ঐদিনের সংঘর্ষে ব্রিটিশ সরকার কোন ভারতীয় পুলিশকে নিয়োগ করেনি, কারণ বিটিশ সরকারের কাছে সংবাদ ছিল যে বোম্বাই-এর ভারতীয় পুলিশের অধিকাংশই তিলকের কারাদণ্ডের জন্য বিক্ষুব্ধ ছিল।

১। D. C. Home, Bombay workers' first political strike, New Age, No. 6, June, 1953.
২। Ibid.

আরো সংবাদ পাওয়া যায় যে বোম্বাই-এর শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট ও অন্যান্য জনসাধারণের হরতাল এত সুসংবদ্ধ ছিল যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য শহরের ছোট দোকানদারদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের নিকট ক্রয়মূল্যেরও কম দামে চাল বিক্রয় করা হত। এই ঘটনাটি শ্রমিকদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত জনসাধারণের একটা ঐক্যের সূচনারই প্রকাশ।

এই লড়াই সম্পর্কে ভারতীয় মিলমালিকদের ভূমিকাও লক্ষণীয়। ২৪শে জুলাই সন্ধ্যায় পুলিশ কমিশনার মিলমালিকদের প্রতিনিধিদের এক সভা ডেকে এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করবার আহ্বান জানালেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বোম্বাই-এর মিলমালিকদের সভা অনুষ্ঠিত হল এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হল যে শিল্পের স্বার্থেই শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে বিরত করা উচিত।' মিলমালিক সমিতির সভাপতি হরিলালভাই ভিশ্রম মিলমালিকদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিলেন। 'যাতে সরকারকে কোনরকমভাবে ব্যতিব্যস্ত না করা হয় এবং এটাই হল তাদের দায়িত্ব যাতে তারা আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলেন ও কাজে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।'[১] বোম্বাই-এর শ্রমিকরা এবং সাধারণ গরীব জনগণ যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফেটে পড়েছেন তখন জাতীয় বুর্জোয়ারা বা তাদের এক বৃহৎ অংশ সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষ অবলম্বন করল।

২৫শে জুলাইও সংগ্রাম চলল। ২৬শে জুলাই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃবৃন্দ নগ্নভাবে ধর্মঘট ভাঙবার কাজে নেমে পড়ল। একজন বৃহৎ শিল্পপতি এবং তুলা ব্যবসায়ী স্যার বিঠলদাস থ্যাকারসের পরামর্শমত বোম্বাই-এর 'নেটিভ পিস গুডস মারচেন্টস্ এসোসিয়েশন' এক সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিল,

'২৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার থেকে কর্মচারীদের অনুপস্থিতির জন্য যে দোকানগুলি বন্ধ রয়েছে সেগুলি খোলবার জন্য সমস্ত সদস্যকে নির্দেশ দেওয়া হোক।'[২] এভাবেই ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রামের প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হল। ব্রিটিশ সরকার এদের রাজানুগত্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। 'অপর দিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বোম্বাই-এর নবীন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী দৃঢ়তা, সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এর উন্নত

১। Quoted by D. C. Home, Ibid.
২। Times of India, August 1, 1908.

ধরনের এবং ফলপ্রসূ কৌশলসমূহ উদ্ভাবনের ক্ষমতা। এদের অনেকগুলি সংগ্রামই ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। এই ঘটনাগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম গুরুতর সংঘর্ষে নবীন শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ের মানসিকতারই প্রমাণ দেয়।'[১]

সোমবার ২৭শে জুলাই নতুন নতুন শক্তি সংঘর্ষে যোগ দিল। শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ শ্রমিকদের পক্ষেই ছিল। তারা এবার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শিল্প শ্রমিক নয় এমন শ্রমিক বা কুলিরাও সংঘর্ষে যোগ দিল। ছোট ব্যবসায়ীরাও বিক্ষোভ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করল। গুজরাটী ভাষায় তিলকের ফটো সমন্বিত ছাপানো ইস্তাহার বিলি করে জনগণকে এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগদানের আহ্বান জানানো হল। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করল। জনতাও শহরের অলিতেগলিতে বিভক্ত হয়ে পুলিশের উপর অবিরাম ধারায় প্রস্তর বর্ষণ করে দৃঢ় প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। ঐদিনকার প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেশবলাল কাঞ্জী নামে একজন গুজরাটী ব্যবসায়ী। অন্যান্যদের সঙ্গে কাঞ্জীও পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

মঙ্গলবার ২৮শে জুলাই সংঘর্ষে শহরের খেটে খাওয়া মানুষের নতুন আরেকটি অংশ যোগ দিল। এরা হচ্ছে শহরের গৃহভৃত্য। এই গরীব মানুষেরা ছিল রত্নগিরি অঞ্চলের কৃষক। জীবনধারণের তাগিদেই এরা-বোম্বাই শহরে এসেছিল। বিভিন্ন বাড়ীর ছাদ থেকে এবং অলিতেগলিতে জমায়েত হয়ে এরা পুলিশ-মিলিটারীর উপর প্রস্তর বর্ষণ করে প্রতিরোধ চালায়। সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কিছু লোক এতে আহত হয়। শ্রমিকরাও ঐদিন মিছিল বের করে এবং ঐ মিছিল পুলিশ ও মিলিটারীর সম্মুখীন হয়।

২৩শে জুলাই যে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল ২৮শে জুলাই তার পরিসমাপ্তি ঘটল। তিলকের কারাদণ্ড হয়েছিল মোট ছয় বৎসর এবং সেই ছয় বৎসর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধেই এই ছয়দিনের রাজনৈতিক সংগ্রাম—এক এক বৎসর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে এক এক দিনের ধর্মঘট। এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন অন্তত ২০০ জন, আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বহু।

এই সংঘর্ষে বোম্বাই শহরের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ যোগদান

১। A. I. Chicherov, Tilak's Trial and the Bombay workers' Political strike, p. 612.

করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ বলবার চেষ্টা করেছেন যে শহরের মুসলমান সমাজ এই ধর্মঘট সংগ্রামে যোগ দেয়নি। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে হিন্দু-মুসলমান মালিকানা নির্বিশেষে শহরের সব দোকানই বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের শতকরা ২০ ভাগ ছিলেন মুসলমান এবং তাঁরাও ধর্মঘটে সমভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই সংগ্রামের কয়েকটি শিক্ষা

বোম্বাই-এর শ্রমিকদের এই রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রধান পূর্বশর্ত ছিল শ্রমিকদের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা। ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিক হিসাবে ভারতের শ্রমিকদের উপর অতিরিক্ত শোষণ শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন ভারতীয় এবং ব্রিটিশ এই উভয় ধরনের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধেই অর্থনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনি শ্রমিকরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল যে এই অতিরিক্ত শোষণের জন্য দায়ী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং এই উপলব্ধি শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করল।

বালগঙ্গাধর তিলক বোম্বাই-এর শ্রমিকদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালান এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করারও চেষ্টা করেন। এই কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিলক বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর কাছে হয়ে উঠেছিলেন যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাই যখন তিলককে গ্রেপ্তার করে সাজা দেওয়া হলো তখন বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও দমনমূলক চরিত্রটা অতি নগ্ন হয়ে ধরা পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী রুখে দাঁড়ালেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর রুখে দাঁড়ানোর পদ্ধতিটি ছিল পৃথিবীর দেশে দেশে অনুসৃত শ্রমিকশ্রেণীর স্বভাবজাত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটা হল রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়নমূলক সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য মোকাবিলার পদ্ধতি। প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠার সময় প্যারিসের শ্রমিকরা বুর্জোয়াদের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর সহজাত সংগ্রামী প্রেরণার বশবর্তী হয়েই। ১৯০৫ সালে রুশ শ্রমিকশ্রেণীও রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট ও প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতেও বোম্বাই-শ্রমিকশ্রেণী ১৯০৮ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর অবলম্বিত পথেই অর্থাৎ রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট ও প্রকাশ্য প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই পথ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগ্রামের পথ। এই পদ্ধতি শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পদ্ধতি। ভারতে সেই সময় শ্রমিকশ্রেণীর কোন নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি গড়ে উঠে নাই। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কোন রাজনৈতিক পরিচালনাও ছিল না, যেমন ছিল না প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠার সময় প্যারিস শ্রমিকশ্রেণীর কোন নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টির পরিচালনা। এতদ্‌সত্বেও শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব সংগ্রামী কায়দাতেই অগ্রসর হয়েছিল। বোম্বাই-এর সংগ্রামের এইটি ছিল ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের এই পদ্ধতি ছিল ভারতে বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অনুসৃত পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। সুরাট কংগ্রেসে কংগ্রেস 'মধ্যপন্থা' বা 'চরমপন্থায়' বিভক্ত হলেও ঐ তথাকথিত 'চরমপন্থীরাও' বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত সংগ্রামের পদ্ধতির কথা চিন্তাও করতে পারেনি। বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের পথ ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ রফার পথ, আর বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী দেখিয়ে দিয়েছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর পথ হচ্ছে জনগণকে নিয়ে খোলাখুলি প্রতিরোধের পথ। দুইটি পথের এই মৌলিক পার্থক্য বোম্বাই-এর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

এই পার্থক্যের জন্যই এবং শ্রমিকশ্রেণীর এই আপোষহীন প্রতিরোধের পথের জন্যই ভারতের বুর্জোয়ারা বোম্বাই-এর শ্রমিকদের ঐ ঐতিহাসিক সংগ্রামকে স্বাগত জানাতে পারেনি, উপরন্তু ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যেই এই সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টিবিহীন অবস্থায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপক্কতা এবং রাজনৈতিক দর্শনের অভাবের মধ্যেও বোম্বাই-এর শ্রমিকদের এই রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট ও প্রতিরোধ সংগ্রাম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছিল একটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতবহ ঘটনা। বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের নিজস্ব পরিচালনায় ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-সংগ্রামের সঠিক পদ্ধতিটাই ভারতের জনগণের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

আরো একটি দিক লক্ষণীয় যে হিন্দুস্থানী সম্পন্ন তিলকের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক সংগ্রামে হিন্দু শ্রমিকদের সঙ্গে মুসলমান শ্রমিকরাও সমভাবে যোগদান করেন এবং এই ঘটনা এই অন্তর্নিহিত সত্যটিকেই তুলে ধরে যে শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে সমস্ত ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আবেদনে ধর্মের প্রভাব

ভারতের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের পেটি-বুর্জোয়া সামাজিক ভিত্তি এদের রাজনৈতিক কাযকলাপে ধর্ম ও কুসংস্কারের উর্দ্ধে তুলে ধরতে পারেনি। বরং এদের রাজনৈতিক আবেদন শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারকেই আশ্রয় করত। শ্রেণী সচেতনতা বিকাশের ক্ষেত্রে এদের রাজনৈতিক প্রচারের কোন অনুকূল ভূমিকা স্বভাবতই ছিল না।

বোম্বাই-এর ধর্মঘটের সময় তিলকপন্থীরা বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ও পোষ্টার লাগাত। একটা বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হযেছিল যে মধ্যাহ্ন-কালীন বিরামের পর যে শ্রামকরা কাজে যোগ দেবে তাদের ধাঙ্গর-সন্তান বা ইউরোপীয়দের সন্তান বলে ধরে নেওয়া হবে। আরেকটা বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল যে, যে শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করছে তারা গো-বধের পাপে মহাপাপী। এ ছাড়াও নানারকম কুসংস্কারপূর্ণ কাহিনী ও আবেদন প্রচার করে এরা শ্রমিক জনতাকে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা করত। শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি যে সমস্ত মধ্যযুগীয় ভাবধারা ছিল সেগুলিও কাজে লাগানো হত। তিলক এবং তিলকপন্থীদের অনেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুন 'নিম্নজাতিভুক্ত' শ্রমিকরা তাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করত। এই জাতিগত শ্রদ্ধাকেও আন্দোলন সংগঠনের কাজে ব্যবহার করা হয়নি তা নয়।

অনুরূপভাবে বাংলায় অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল প্রমুখ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতেন।

বস্তুতপক্ষে এই জাতীয় নেতারা জাতীয়তাবাদীর সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুয়ানীর এক প্রতিক্রিয়াশীল সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদ বলতে তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকল্প হিসাবে ভারতের প্রাচীন 'হিন্দু সভ্যতা' বা 'আর্য সভ্যতার' শ্রেষ্ঠত্বকে উপস্থিত করেছিলেন। ভারতের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর আন্দোলন—জাতীয় আন্দোলনকে এঁরা প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মীয় কুসংস্কারের ভিত্তিতে পরিচালনার প্রয়াস করেছিলেন। এই সময় থেকে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় কুসংস্কারের যে সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল তার কুপ্রভাব শুধুমাত্র সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনেই পরিদৃষ্ট হয়নি, এই কুপ্রভাব ভারতের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আন্দোলন ও চিন্তাধারায় মধ্যেও প্রত্যক্ষভাবে বিরাজমান ছিল।

এই ক্ষেত্রে 'মধ্যপন্থীদের' তুলনায় 'চরমপন্থীরা' ধর্মীয় কুসংস্কারকে অধিকতর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালে তিলক বালিকাদের বাল্যবিবাহের সমর্থনে প্রচারে নেমেছিলেন। 'এজ অব কনসেণ্ট' বিলে বালিকাদের বিবাহের বয়স ১০ থেকে ১২তে বৃদ্ধি করবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তিলক এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, অপরপক্ষে 'মধ্যপন্থী' রানাডে প্রমুখরা এই বিলকে সমর্থন করেন। তিলক 'গোরক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'শিবাজী উৎসবের' সঙ্গে সঙ্গে 'গণপতি পূজার' প্রচলন করেন। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবকে তিনি জাতীয়তাবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে বাংলায়ও ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদকে সংগঠিত করবার চেষ্টা হল। বাংলায় কালীপূজা জাতীয়তাবাদীদের নিকট রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের উৎস হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কালীপূজা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। ১৯০৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন কলকাতায় কালীঘাটে প্রচণ্ড ধুমধাম সহকারে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই পূজা সম্বন্ধে লিখছে,[১]

"নিরবচ্ছিন্ন ঝড় ও প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও সকাল ৯টা থেকে দলে দলে মানুষ ও ছাত্রদের মিছিল খালি পায়ে চিৎপুর রোড ও কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল··· · সমস্ত স্থান জনারণ্যে পরিণত হল।

"·· ···শতাধিক সংকীর্তন দল জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে এবং নানারকম সময়োপযোগী মন্তব্য লিখিত পতাকা বহন করে মন্দির পরিক্রমণ করল।

"পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী মানুষ ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল।··· কলকাতায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দুরা এবং হিন্দু জমিদাররা খালি পায়ে এবং পবিত্র রেশমীবস্ত্র পরিধান করে এখানে জমায়েত হয়েছিলেন।

"কিন্তু জনসংখ্যাই সব নয়। অনুভূতিও খুব তীব্র ছিল, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এই বিশাল জনসমষ্টিকে মহালয়ার পুণ্য দিনে দেবীর নিকট বঙ্গভঙ্গের সর্বনাশ রোধ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের পবিত্র শপথ গ্রহণ ও প্রার্থনার জন্য নিয়ে যাওয়া হল।······"

উপরোক্ত ঘটনা একটি উদাহরণ মাত্র। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে এভাবেই তদানীন্তনকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১। **Amrita Bazar Patrika, September 29, 1905.**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্থান লাভ করল, কিন্তু এই 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতও ছিল হিন্দু ধর্মের ধ্যানধারণারই অভিব্যক্তি।

সেই যুগের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর রাজনৈতিক আন্দোলন—জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুয়ানীর এই সংমিশ্রণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা আদৌ উন্নততর রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশের সহায়ক ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম থেকেই ভারতের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করার অপ্রচেষ্টা করে। কারণ এই বিভেদ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সহায়ক ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের এই হিন্দুয়ানী রাজনীতি বা হিন্দু জাতীয়তাবাদও ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য কম দায়ী ছিল না। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণবশত মুসলমানসমাজ জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু যখন তারা অগ্রসর হবার মত অবস্থায় উপস্থিত হল তখন এই 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয় আন্দোলনেও পরিপন্থী শক্তি হিসাবে কাজ করল এবং পরবর্তীস্তরে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামীয় ধর্মীয় কুসংস্কারের ভিত্তিতে মুসলমান সমাজকেও পরিচালিত করবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা হল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এই অবস্থার ফলশ্রুতি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিরন্তর বিভেদ সৃষ্টি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ভারতের হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও শ্রেণীচেতনা বিকাশের পরিপন্থী ছিল। এই ধর্মীয় আবহাওয়া এবং রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সংমিশ্রণ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্নততর বিকাশ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা সৃষ্টির পথে দুস্তর বাধাস্বরূপ কাজ করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনা বিকাশ বা মধ্যবিত্তের উচ্চতর চেতনাবোধের স্বাভাবিক পথে অবরোধ সৃষ্টি করেছিল এই ধর্মীয় আবহাওয়া। শুধু তদানীন্তনকালেই নয় পরবর্তীকালেও ধর্মীয় কুসংস্কার ভারতীয় রাজনীতির বৈজ্ঞানিক বিকাশের পথকে দারুণভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। গান্ধীর আবির্ভাব ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল এই ধর্মীয় কুসংস্কারকেই একটু অপেক্ষাকৃত মার্জিত রূপ দিয়ে চালিয়ে দেওয়ার একটা প্রচণ্ডতম, প্রচেষ্টা। গান্ধীর 'রামরাজত্বের' তত্ত্ব ছিল শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের পথ থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে বিচ্যুত করবার জন্য ভারতীয় বুর্জোয়াদের ধূর্ত কৌশল।

ভারতের রাজনীতিতে ধর্মের মিশ্রণ ভারতীয় বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা এখনও পরিত্যাগ করেনি এবং ভারতের শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও বিজ্ঞান বোধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তারা ধর্মকে এখনও ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে।[১]

শ্রমিকদের অন্যান্য আন্দোলন

১৯০৮ সালে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের উত্তাপ হ্রাস পাওয়াব পর শ্রমিকদের চাকুরীগত সমস্যা নিয়ে পুনরায় আলোড়ন শুরু হয়। ইতোমধ্যে বোম্বাই মিলহ্যাণ্ডস্ এসোসিযেশন নিষ্ক্রিয় এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মি. মরিসনের নেতৃত্বে তখন ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন তদন্ত কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ১৯১০ সালে বি আর. নারে, এস. কে. বোলে, এবং এন এ. তালাস্কার-এর উদ্যোগে বোম্বাই কামগর হিতবর্দ্ধক সভা বা শ্রমিক কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। এই সভার পক্ষ থেকে মরিসন কমিশনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে দৈনিক কাজের সময় ১২ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা, গুরুতর শিল্প দুর্ঘটনার জন্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরন প্রদান, শ্রমিকদেব সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগদান ইতাদি দাবী সন্নিবেশিত ছিল। কামগর হিতবর্দ্ধক সভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হতো না। বিভিন্ন মানবপ্রেমিক মানুষের দেয় অর্থেই এই সভার কাজকর্ম নির্বাহ হতো। শ্রমিকদের মধ্যে সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এই সময় বোম্বাই-এ আবেকটি সংগঠন সোশ্যাল সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলকাতায়ও এই সময় দুইটি সংগঠন সৃষ্টি হয়। একটি মহামেডান এসোসিয়েশন এবং অপবটি ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন। মরিসন কমিশনের কাছে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে স্মরকলিপি পেশের জন্যই এই দুইটি সংগঠনের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ব্যারিষ্টার, কলকারখানার কেরানী ইত্যাদিদের উদ্যোগেই এই সংগঠন দুইটি সৃষ্টি হয়। কিন্তু এইগুলি 'কাগুজে ইউনিয়ন'

১। নির্বাচনের জয়লাভের জন্য জনগণের ধর্মীয় কুসংস্কার ও ভেদাভেদকে কাজে লাগানো এবং মন্দিরে পূজা-অর্চনা করা, রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হয়ে মন্দিরে যেয়ে পূজা দেওয়া, প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করে ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করা এবং তার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা ইতাদি বিংশ শতাব্দীর সত্তর এবং আশির দশকেও অব্যাহত ছিল।

ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং বাস্তবে কিছু কিছু কর্মকর্তার স্বার্থসিদ্ধিই এই সংগঠনগুলির কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ ছাড়া কলকাতায় এই সময় (১৯০৮) সীমেন্স্ অঞ্জুমান নামে একটি সংগঠনও তৈরী হয়। লক্ষণীয় এই নতুন সংগঠনগুলি বহুলাংশে ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল।

১৯১০ সালে বোম্বাই ইলেকট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোম্পানীর শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। কিন্তু ধর্মঘট পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের কোন ইউনিয়ন ছিল না। ধর্মঘটান্তে শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবি-দাওয়ার মীমাংসা হয়।

১৯১১ সালের ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট শ্রমিকদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা হ্রাস করে দেয় কিন্তু ঐ আইনে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করার বিরুদ্ধে কোন বিধান ছিল না। তার ফল হল এই যে ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী বিভিন্ন মিলে কাজের ঘণ্টা হ্রাস হলেও মালিকরা সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরিও সেই অনুপাতে হ্রাস করে দিল। এই মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিকরা ধর্মঘট সংগ্রাম সংগঠিত করেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও ধরনধারণ বিশ্লেষণ করলে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং বহুলাংশে আন্দোলনের সাফল্য সত্ত্বেও ভারতের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম তখনও যথেষ্ট সংগঠিত ও শক্তিশালীরূপ ধারণ করেনি। ট্রেড ইউনিয়ন অর্থে বাস্তবিকভাবে যে ধরনের সুসংবদ্ধ সংগঠন বোঝায় সেই ধরনের সংগঠন তখনও জন্মলাভ করেনি এবং সুসংবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে সুপরিচালিত এবং সুসংহত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও সঠিক অর্থে তখনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আন্দোলনগুলি বিস্তার লাভ করেছিল এবং শ্রমিকদের যে ধরনের প্রাথমিক সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল তাতে একথা বলা যায় বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত—এই সময়ে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠার ভিত্তিভূমি উত্তমরূপেই রচিত হয়েছিল। এরপর এসেছিল ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং তৎপরবর্তী সময়ে সারা ধনতান্ত্রিক জগতে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশেষ করে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ঐ দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা পৃথিবীতে যে নতুন হাওয়া সৃষ্টি করে তার প্রভাব ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর যথেষ্টরূপেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

মহাযুদ্ধ ভারতের জনজীবনে যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতের শিল্প শ্রমিকদের যে সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তৎসহ পূর্ববর্তী আন্দোলনসমূহ থেকে সঞ্জাত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও শ্রেণী সচেতনতা এবং সর্বোপরি রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনও আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে শুরু হয় ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সুসংবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সৃষ্টি এবং সংগঠিত ও উন্নততর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রাক-যুদ্ধকালীন আন্দোলনের ধারাগুলি ছিল যুদ্ধোত্তরকালীন সংগঠিত সংগ্রামের উপযুক্ত মহড়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রথম মহাযুদ্ধ—শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক জাগরণ ও সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উন্নততর বিকাশ ১৯১৪-২০

প্রথম মহাযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে শিল্প ও শিল্পশ্রমিকদের অবস্থা

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ঘটে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি কিছুটা উচ্চস্তরে পৌছায়। ভারতের জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির হারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এই অগ্রগতি প্রতীয়মান হয়। ১৯০০ সালে ভারতে রেজিষ্ট্রিকৃত ফার্মের সংখ্যা ছিল ১,৩৬০ এবং এই ফার্মগুলির লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬,২৮,০০,০০০ টাকা। ১৯০৭ সালে ফার্মের সংখ্যা হলো ২,৬৬১ এবং মূলধন হলো ৫০,৮১,০০,০০০ টাকা। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ফার্মের সংখ্যা ছিল ২,৫৫৩ এবং মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭২,১০,০০, ০০ টাকা।[১]

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দুইটি বর্শামুখ ছিল। দেশকে লুণ্ঠন করা হয়েছিল, (১) ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মাধ্যমে, (২) ব্রিটিশ ব্যক্তিগত পুঁজি খাটানোব মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শোষণের দুইটি উপায়ের মধ্যে কোন সময় প্রথমটি অধিকতর কার্যকরী রূপ গ্রহণ করেছিল, কোন সময় দ্বিতীয়টি অধিকতর শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ রূপ গ্রহণ করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে ভারতে ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিই ছিল শোষণের সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার।

যুদ্ধ শুরু হলে পর ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভয়াবহ চরিত্র নগ্ন হয়ে ওঠে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে ব্যাপকহারে শুধুমাত্র কাঁচামাল রপ্তানিই করল না, বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পের শিল্পজাত দ্রব্যও বিপুলভাবে যুদ্ধের তাগিদে ভারতের বাইরে চালান দেওয়া হলো। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার ছিল ভারতের রেলওয়ে ট্র্যাক, ব্রিজ স্ট্রাকচার,,

১। A. I. Levkovosky, Capitalism in India, p 94..

রোলিং স্টক, ডাক ও তার বিভাগের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির একটা বড় অংশ ভারতের বাইরে চালান দিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগানো।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী ও সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নতুন নতুন কৌশলে ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণকে তীব্রতর করে তুলেছিল। ১৯১৪-১৮ সালে ভারতের জনগণ ব্রিটিশ সামরিক ঔপনিবেশিক শক্তির তীব্রতম শোষণ ও লুণ্ঠনের শিকার হলো।

ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে ভারতের শ্রমজীবী জনগণের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করে দিল। ভোগ্যপণ্য এবং বিশেষ করে লবণের উপর করবৃদ্ধি সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর চরম দুর্দশা সৃষ্টি করল। সামরিক খাতে এবং অসামরিক প্রশাসনের খাতে যে বিপুল পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটল তা উসুল করা হলো জনগণের উপর করবৃদ্ধি করে এবং অন্যান্যরূপে শোষণকে আরও নির্মম করে।

এর উপর ব্যাপক হারে নোট ছাপিয়ে সরকার মুদ্রাস্ফীতিকে মারাত্মক করে তুলল। এই সামগ্রিক অবস্থার ফল দাঁড়ালো অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। কলকাতা শহরে দ্রব্যমূল্য শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি পেল। ভারতের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটলো।

প্রাকযুদ্ধকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় শিল্পপতিদের শিল্পোদ্যোগে সংকট ছিল অবশ্যম্ভাবী। ১৯০৫-০৮ সালের জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় শিল্পপতিদের শিল্প প্রতিষ্ঠায় অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা সৃষ্টি হলে পরিস্থিতির প্রতিকূল পরিবর্তন ঘটে এবং সুরক্ষিত ব্রিটিশ পুঁজি সংহত হবার সুযোগ পায় এবং ভারতীয় পুঁজি সুরক্ষিত ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটে আসে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ দ্বিমুখী সংকটের সম্মুখীন হয়। প্রথমত কৃষকসমাজের আর্থিক অবস্থার অধোগতির ফলে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয় এবং দ্বিতীয়ত ভারতীয় কলকারখানাগুলি পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু আধা-শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাওয়ার ফলে ভারতীয় কারখানাগুলি চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য ১৯১৫ সালের শেষদিকে ভারতীয় শিল্পগুলি সংকট কাটিয়ে উঠতে শুরু করে।

বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল অবস্থার

সৃষ্টি করে। যুদ্ধের সময়—ব্রিটিশ ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের কলকারখানাগুলির উৎপাদন যুদ্ধের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। ফলে ভারতে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পায়। জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী থেকে আমদানী একবারেই বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হ্রাসের ফলে ভারতীয় শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ভারতে কাঁচামালের অপেক্ষাকৃত কম দাম এবং অনেক কম মজুরিতে শ্রমিক সুলভ হওয়াতে ভারতের কারখানাগুলি প্রচুর যুদ্ধের কণ্টাক্ট পায় এবং ভারতে এবং ভারতের বাইরে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী ভারতের কারখানাগুলি সরবরাহ করে।

শ্রমজীবী জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং ভারতীয় কারখানাগুলি চালু রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী যন্ত্রপাতির আমদানী বন্ধ হওয়ার দরুন ভারতীয় শিল্পগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হলেও যুদ্ধ ভারতীয় শিল্পে সামগ্রিকভাবে অগ্রগতিরই সৃষ্টি করে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে রেজিষ্ট্রিকৃত জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীগুলির সংখ্যা ২,৫৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৭৮৯তে দাঁড়ায় এবং লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭২,১০,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬,৬১,০০,০০০ টাকায় পৌছায়।

ভারতীয় শিল্পপতিদের বৃহত্তম উদ্যোগ বস্ত্রশিল্পে চালু কারখানার সংখ্যা ২৭১ থেকে ২৬২তে হ্রাস পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোট তাঁতের সংখ্যা ১,০৪,০০০ থেকে ১,১৬,০০০-এ বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রের উৎপাদনও ১৯১৪-১৫ সালের তুলনায় ১৯১৭-১৮ সালে এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬০,০০০ থেকে ২,৮২,০০০-এ দাঁড়ায়।

টাটা আইরন এণ্ড স্টীল কোম্পানী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় বুর্জোয়ারা প্রভূত মুনাফা সঞ্চয় করে।

যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটলেও তা ছিল যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। জাতীয় বুর্জোয়ারা এই সময় ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে শিল্পোন্নতির জন্য কোন কার্যকর প্রতিশ্রুতিই আদায় করতে পারেনি। ভারতীয় শিল্পগুলির অবস্থা তদন্তের জন্য একটি ইনডাস্ট্রিয়াল কমিশন নিয়োগ এবং ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর আবগারী শুল্ক আর বৃদ্ধি না করার প্রতিশ্রুতিই একমাত্র আদায় করা গিয়েছিল।

১৯১৯ সালে ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৩,৬৭,০০০। এর মধ্যে ৩,০৬,৩০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল ২৭৭টি বস্ত্র-

কলে, ১,৪০,৮০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল ১৯৪০টি কটন গিনিং ফ্যাক্টরীতে এবং ২,৭৬,১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল ৭৬টি চটকলে। রেলওয়ে শপগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,২৬,১০০ জন। অর্থাৎ শিল্পশ্রমিকদের দুই তৃতীয়াংশই নিযুক্ত ছিল বৃহৎ শিল্পের তিনটি শাখায়। এ ছাড়া কয়লাখনিগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২,০৭,৮০০ জন।

যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশী ও ভারতীয় পুঁজিপতিরা একদিকে যেমন অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করেছিল অপরদিকে ঠিক তার বিপরীতভাবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ছোট ছোট নতুন কলকারখানা স্থাপন এবং চালু কারখানাগুলিতে অধিকতর শ্রমিক নিয়োগের ফলে শ্রমিকের মোট সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলেও শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। শ্রমিকদের অধিকতর পরিশ্রম করতে বাধ্য করে একদিকে তাদের শোষণকে তীব্রতর করা হয়েছিল। অপরদিকে শহরাঞ্চলে এবং প্রকৃতপক্ষে সারাদেশে খাদ্যদ্রব্যের প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকরা শোচনীয় আর্থিক সংকটে জর্জরিত হয়েছিল।

১৯১৮ সালে সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ভারতের পাবলিক হেলথ, স্যানিটেশন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চরম ঔদাসীন্যের ফলে ভারতের জনগণের শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ এই মহামারীর কবলে পড়ে। চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জ্বালা এই মহামারীর সহযোগী হয়। ফলে ১৯১৮ সালের জুন মাস থেকে ১৯১৯ সালের জুন মাস, এই এক বৎসরে ভারতে ৭০,০০,০০০ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সংখ্যা হল সরকারী তথ্য অনুযায়ী। বেসরকারী হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা আরো অধিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম শোষণই এই ব্যাপক মৃত্যুর কারণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়েছিল তেমনি ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রামের পথও উন্মুক্ত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

প্রাক্‌যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন

১৯০৫-০৮ সালের ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করবার জন্য প্রচণ্ড নিপীড়ন নীতি চালাবার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কয়েকটি শাসন সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রোষের উপশমের চেষ্টা

করল। ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো রিফর্মস্ নামে অভিহিত হয়ে এই সংস্কার নীতি ঘোষিত হলো। এই নামমাত্র শাসনসংস্কার ভারতের জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি যদিও কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতৃত্ব এই সংস্কারকে স্বাগত জানিয়েছিল। 'চরমপন্থী' নামে অভিহিত কংগ্রেসের অপর অংশ অবশ্য এই সংস্কারকে গ্রহণ কবতে পারেননি।

গভর্নর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও প্রভিন্সিয়াল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সমূহে একজন করে ভারতীয় সদস্য নিয়োগ, ইম্পেরিয়াল এবং প্রভিন্সিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলসমূহের চরিত্র অপরিবর্তিত রেখে সদস্য সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি, ইত্যাদি সংস্কারগুলিব চরিত্র এমনই ছিল যে এর দ্বারা ভারতীয়দের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণের কোন প্রশ্ন ছিল না। কৌশলে জাতীয় আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মূলত যে তিনপ্রকার নির্বচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছিল তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলীও ছিল।

স্বভাবতই কংগ্রেসের অধিকাংশই এই তথাকথিত সংস্কারকে গ্রহণ করতে পারেননি। এই বিষয়ে মধ্যপন্থী নেতৃত্বের চরম আপোষমুখী মনোভাব বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের আদেশনামা প্রত্যাহৃত হলে পর মধ্যপন্থীরা ব্রিটিশের প্রশস্তিতে মুখর হয়ে উঠেছিল যদিও এই আদেশনামার প্রত্যাহার স্বদেশী বয়কট এবং তীব্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেরই আংশিক সাফল্য সূচনা করেছিল।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করে সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতের জনগনকে রাজনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের শিকারে পরিণত করল। ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে আগা খাঁ, ঢাকার নবাব সলিমুল্লা এবং মহসীন-উল-মুল্কের নেতৃত্বে সারাভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত করে সাম্প্রদায়িক তত্ত্বকে বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টা হলো। মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিল কারণ এতে মুসলমান জমিদার ও কায়েমী স্বার্থের প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল। মুসলীম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীও দাবী করেছিল। ব্রিটিশরা ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল এবং মর্লি-মিন্টো রিফর্ম এই দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদের ব্যবস্থা পাকাপাকি করল।

কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতৃত্বের অত্যধিক ধরনের আপোষমুখী মনোভাব এবং মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিষময় প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি

তিলক, বিপিন পাল প্রমুখ 'চরমপন্থী'দের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকাল সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিল—তা হচ্ছে ভারতের জনগণের স্বাধীনতার দাবিকে এই আন্দোলন বিশ্বের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং ভারতের জনগণের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে যে মারাত্মক আঘাত হানল এবং এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী জগতে যে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করল এবং ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং এই বিপ্লব যে বিশ্ব বিপ্লবের জোয়ার সৃষ্টি করল তাঁর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হলো ভারতের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক গণভিত্তিক ও ব্যাপক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে অগ্রসর হলো।

১৯০৫ সালে রুশ গণতান্ত্রিক বিপ্লব, রুশ-জাপান যুদ্ধে এশীয় রাষ্ট্র জাপানের নিকট ইউরোপীয় রাষ্ট্র রাশিয়ার পরাজয় ভারতীয় এবং এশীয়বাসীর মধ্যে যে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ঘটনা-সমূহ সারা বিশ্বে নিপীড়িত ও পরাধীন দেশগুলিতে তদপেক্ষা অনেক বেশী তীব্রতার সঙ্গে রাজনৈতিক জাগরণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ঢেউ সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস অনুসরণে অনেকেই ভারতের সংগ্রামী ধারাকে সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মূলধারা থেকে বিক্ষিপ্ত করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। ঐ দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদপ্রসূত এবং তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

যুদ্ধ শুরু হতেই সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারত রক্ষা আইন ও অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের আপোষহীন কর্মীদের আটক করে সমগ্র পরিস্থিতি নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখবার চেষ্টা করে। মধ্যপন্থীদের নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯১৪ সাল থেকে যুদ্ধ চলাকালীন চারটি বার্ষিক অধিবেশনেই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায় এবং যুদ্ধশেষে ১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেসে যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির জন্য ব্রিটিশ সম্রাটকে অভিনন্দন জানানো হয়। ব্রিটিশ সরকারও প্রতিদান হিসাবে কংগ্রেসকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। এই সময় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রাদেশিক গভর্নররা যোগদান করেন। লণ্ডনে লাজপত রায়, জিন্না প্রমুখের নেতৃত্বে এক ডেপুটেশন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেক্রেটারী অব স্টেটের কাছে

পত্র দেয়, মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লণ্ডনে সন্ত উপস্থিত হয়ে সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট পত্র লিখে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন ও নিঃশর্ত সেবার প্রতিশ্রুতি দেন, পরে তিনি লণ্ডনে যুদ্ধের জন্য ভারতীয়দের মধ্য থেকে একটি এ্যাম্বুলেন্স বাহিনীও গঠন করেন। ভারতে এসে গান্ধী ১৯১৭ সালে ভাইসরয় কর্তৃক আহুত দিল্লী ওয়ার কনফারেন্সেও সহযোগিতা দান করেন। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে তিনি গুজরাটী কৃষকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন এবং সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে স্বরাজ অর্জনের জন্য কৃষকদের পরামর্শ দেন। গান্ধী এবং মধ্যপন্থীরা এই আশাতেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন যে যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদান করবে। স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁদের এই আশা পরবর্তীকালে হতাশায় পরিণত হয়েছিল।

উপরতলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের বশংবদ মনোভাব যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের গণবিক্ষোভকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী সরকার যুদ্ধের জন্য ভারতের দরিদ্র জনগণের উপর যে গুরুতর আর্থিক দায়িত্ব চাপিয়েছিল তার চাপে ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর উপর দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, যথেচ্ছ মুনাফাবাজী জনগণের সঙ্কট ও দারিদ্র্যকে তীব্রতর করে তুলেছিল। ভারতের দিকে দিকে যে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় পাঞ্জাবের গদর আন্দোলন ছিল তারই একটি বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। ১৯১৬ সালে তিলক হোমরুল ফর ইণ্ডিয়া লীগ গঠন করলেন। তিলকের হোমরুল আন্দোলনে ইংরেজ আধ্যাত্মবাদী মিসেস এ্যানি বেসান্তও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে কংগ্রেসের 'মধ্যপন্থী' ও 'চরমপন্থী' এই উভয়পক্ষই সমবেত হলেন। বস্তুত ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে দুইপক্ষের বিচ্ছেদের পর এই প্রথম দুইপক্ষ একত্রে মিলিত হলো। ১৯১৬ সালের অধিবেশনে কংগ্রেস-মুসলীম লীগ মৈত্রীও স্থাপিত হল। তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধ অভিযানের ফলে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং ১৯১৫ সালে মুসলীম লীগ কনফারেন্সে এই বিক্ষোভ প্রকটিত হয়। ফলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ একযোগে সংস্কার আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আংশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করা হয় এই দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে। 'সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসনশীল ডোমিনিয়নের সঙ্গে সমঅংশীদার' হওয়ার রাজনৈতিক লক্ষ্যই তখন ঘোষণা করা হয়েছিল।

সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে যুক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। হোমরুল লীগের আন্দোলন অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের আকৃষ্ট করেছিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনের সম্মুখীন হল। দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্নরূপ জঙ্গী আন্দোলনের চাপও সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বিব্রত করে তুলল। ব্রিটিশ সরকার এই সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সংস্কার ও নিপীড়ন এই দ্বৈত নীতির দ্বারা মোকাবিলায় অগ্রসর হল। হোমরুল লীগকে দমন করার ব্যবস্থা হল এবং মিসেস এ্যানি বেসান্ত গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেস ভাইসরয়ের নিকট এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানালো এবং ১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে এ্যানি বেসান্তকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা হলো। কলকাতা কংগ্রেস অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করল এবং সেই দাবীপূরণের পথে কংগ্রেস-মুসলীম লীগ সংস্কার পরিকল্পনা ছিল প্রথম ধাপ।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার রাউলাট কমিটি গঠন করল। ভারতের 'বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রগুলি' তদন্তের জন্য এই কমিটি গঠিত হল। এই কমিটি বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য যথেচ্ছ গ্রেপ্তার, বিচার না করে আটক রাখা, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের চলাফেরার উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি কঠোর ও স্বৈরাচারী বিধিব্যবস্থার সুপারিশ করল। ভারতীয় জনগণের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও রাউলাট বিল পাশ হল।

১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের রাজনীতিতে তখন গান্ধীজীর প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করেছে। রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি সত্যাগ্রহ সভা স্থাপন করলেন এই উদ্দেশ্যে। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী হরতালের আহ্বান দেওয়া হল এবং আইন অমান্য পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে নির্দ্ধারিত হল। হরতাল চমৎকারভাবে সফল হয়েছিল, কিন্তু দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান জনতার উপর পুলিশ বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করল। গান্ধীজীকে দিল্লী আসতে দেওয়া হল না, তাঁকে বলপূর্বক বোম্বাই-এ ফেরৎ পাঠানো হল।

তারপরই ঐ বৎসরের ১৩ই এপ্রিল সংঘটিত হল জালিয়ানওয়ালবাগের হত্যাকাণ্ড। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত বিক্ষুব্ধ জনতার উপর জেনারেল ডায়ারের পরিচালনায় ব্রিটিশ ফৌজের উন্মত্ত গুলিবর্ষণে সহস্রাধিক নরনারী নিহত হলেন এবং আহত হলেন আরো কয়েক সহস্র। এই

নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী কয়েকদিন যাবৎ কার্ফু, জনসাধারণের উপর বেত্রাঘাত, গ্রেপ্তার, জঙ্গী আইন জারী, ইত্যাদি নির্বিচার দমন পীড়ন চলল।

এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হল তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘৃণায় এবং প্রতিবাদে 'নাইট উপাধি পরিত্যাগ কবলেন। পাঞ্জাবের এবং বোম্বাই-এর ঘটনা গান্ধীজীকে ভারতীয় রাজনীতির প্রথম সারিতে নিয়ে এল। ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনার তদন্তের জন্য লর্ড হাণ্টারের নেতৃত্বে যে কমিটি স্থাপন করেছিল কংগ্রেস তা বয়কট করল।

এই তীব্র দমনপীড়নের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতের জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে চাপা দেওয়ার জন্য কতকগুলি শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে এল। কিন্তু সংস্কার প্রস্তাবগুলি ভারতের গণ-আন্দোলনের ঢেউকে প্রশমিত করতে ব্যর্থ হল। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ মণ্টেগু এই সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা করেন এবং হোমরুল আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি দেন। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতে ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবিকাশ ঘটানোই' ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই সংস্কার মণ্টেগু ঘোষণা করলেন। আসলে প্রাদেশিক সরকারগুলিতে এক তথাকথিত দ্বৈত-শাসনই ছিল এই সংস্কারের মূল ভিত্তি। এই সংস্কার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার 'মধ্যপন্থীদের' কিছুটা তুষ্ট করতে সমর্থ হলেও 'চরমপন্থীরা' এতে তুষ্ট হননি।

১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই সংস্কারকে 'নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অসন্তোষজনক' বলে ঘোষণা করা হয় এবং প্রায় সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। 'মধ্যপন্থীরা' সংখ্যায় অনেক হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ঐ অধিবেশনে যোগদান করেন না এবং পরবর্তী বৎসর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল লিবারেশন ফেডারেশন গঠন করেন। গান্ধীজীও এই সংস্কারে অনুকূলভাবে সাড়া দেন যদিও পরবর্তীকালে রাউলাট এ্যাক্ট পাশ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার ফলে তিনি সত্যাগ্রহ ইত্যাদির দিকে অগ্রসর হন।

গান্ধীজী এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন এবং অচিরেই ঐ মঞ্চ থেকে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন।

গান্ধীজীর ধারণা ছিল লক্ষ্ণৌ চুক্তির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য গড়বেন এরকম ধারণাও তাঁর ছিল। তিনি খিলাফৎ আন্দোলনকে ন্যায্য বলে মনে করলেন এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানালেন।

কংগ্রেস-মুসলীম লীগের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব যেমন ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর পড়েছিল, তেমনি খিলাফৎ আন্দোলনও যে মুসলমান সমাজকে পরিচালিত করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শ্রমিকদের প্রভাবান্বিত করেছিল —এই ঘটনা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সমস্ত প্রভাবই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী চেতনা বিকাশের পরিপন্থী ছিল। খিলাফৎ আন্দোলন এর ব্যতিক্রম নয়।

যুদ্ধশেষে ১৯১৯ সালে যে শান্তি চুক্তি হল তাতে যুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন যুদ্ধের যে ১৪ দফা উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ গণতন্ত্র ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার সব কিছুই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। উপনিবেশগুলিকে পুনরায় ভাগ বাটোয়ারা করার উদ্দেশ্যেই যে ছিল এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তা বুঝতে আর সাধারণ মানুষের অসুবিধা হল না। ভার্সাই চুক্তির চরিত্র হল প্রতিহিংসামূলক। সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ভারতের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যে সাহায্যগুলি করেছিল তার জন্য জার্মানীর প্রতি ভারতের মানুষের একটা সহানুভূতিমূলক মনোভাব ছিল। ভার্সাই চুক্তির প্রতিশোধাত্মক চরিত্র, মধ্য ইউরোপের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার, এবং বিশেষ করে তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ-মার্কিন শক্তির আচরণ ভারতের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। এরা অটোমান সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দেবার সিদ্ধান্ত করল। তারপর যখন ব্রিটিশ-মার্কিন সহায়তায় গ্রীক ও ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনী তুরস্কে অবতরণ করল তখন অটোমান সাম্রাজ্য ও খলিফার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠল। মুসলমান সমাজের বিরাট অংশ তুরস্কের খলিফাকে তাঁদের ধর্মীয় গুরু বলে বিবেচনা করত। তারা অনুভব করত যে তুরস্কের খলিফার শক্তি দুর্বল হলে অন্যান্য পরাধীন দেশের মুসলমান সমাজের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই অনুভূতি থেকেই ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনের সৃষ্টি হল।

ভার্সাই চুক্তি বলে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত করা এবং তুরস্কের সুলতানকে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করা হলে ভারতের মুসলমান সমাজের একাংশ ব্রিটিশশক্তিকে এই তুরস্ক নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করার জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

করল। মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ এবং হজরত মোহানীর নেতৃত্বে খিলাফৎ কমিটি গঠিত হল। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে সহায়তাদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভাবলেন যে খিলাফৎ আন্দোলন ছিল 'হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার একটা সুযোগ যা একশ বছরেও আর পাওয়া যাবে না।' গান্ধীজী খুব সরলভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে অন্তরের ঐক্য বলে মনে করলেন। হিন্দু-মুসলমান বিভেদের আসল কারণগুলির দিকে তিনি তাকালেন না। ১৯১৯ সালে গান্ধীজী খিলাফৎ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগও খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন দান করল। পরবর্তীকালে অবশ্য খিলাফৎ আন্দোলনের কোন গুরুত্ব রইল না। ১৯২২ সালে মুস্তাফা কামাল পাশা তুরস্কে ক্ষমতায় এলেন এবং সুলতান সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বিবর্জিত হলেন। কামাল পাশা তুরস্ককে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করলেন এবং খলিফা প্রথার অবসান ঘটল। ফলে ভারতেও খিলাফৎ আন্দোলনের আর কোন মূল্য রইল না।

খিলাফৎ আন্দোলন এবং গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা যেভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাতে যথেষ্ট ভাবাবেগ থাকলেও এই আন্দোলনের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই এই আন্দালন ভারতের শহুরে মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের এক বৃহদাংশের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু মূলত এই আন্দোলন ছিল ধর্মভিত্তিক এবং এই আন্দোলনের সামনে ঐতিহাসিক আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হতো পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম ধর্মীয় কাহিনীর নায়কদের। ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে এই আন্দোলন সমর্থ হলেও প্রকৃত অথে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা সৃষ্টিতে এই আন্দোলন কতটুকু সমর্থ হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি, তার শোষণ ও লুণ্ঠনমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা হিসাবে ছিল না—মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক এবং তার সুলতানের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মভিত্তিক ক্ষোভই ছিল এই আন্দোলনের প্রেরণা। তাই এই আন্দোলনকে প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে ভারতীয় মুসলিম সমাজের দরিদ্রতম অংশ কৃষকদের ও শ্রমিকদের মূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণের মূল স্তম্ভগুলির বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভকে পরিচালিত করতে এই

আন্দোলন সফল হয়নি। ধর্মীয় প্রশ্নকেই মূল সমস্যা হিসাবে তুলে ধরায় শোষিত মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের কোন সহায়ক ভূমিকা ছিল না। পাশাপাশি মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব, মধ্যযুগীয় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় উন্মত্ততা ভারতীয় মুসলিম কৃষক ও শ্রমিকদের এক বিরাট অংশের দৃষ্টিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের মূল চরিত্রগুলি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মীয় আবিলতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। একদিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের এবং অপরদিকে মুসলিম ধর্মীয় কুসংস্কারপন্থীদের বিষময় এবং তীব্র প্রভাবের এই প্রেক্ষাপটেই বিবেচনা করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনা বিকাশের ইতিহাস।

১৯২০ সালের প্রথমদিকে এক যুক্ত হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুরস্কের প্রতি সুবিচারের দাবী জানিয়ে ব্যর্থ হয়। তখন লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সঙ্গে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। লয়েড জর্জ সোজাসুজি জানিয়ে দেন যুদ্ধে পরাজিত অন্যান্য খৃষ্টধর্মাবলম্বী রাজ্য থেকে তুরস্কের সঙ্গে কোনরূপ পৃথক ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সেভার্সের সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী কনস্টান্টিনোপল তুরস্কের অধিকারে থাকলেও জনসংখ্যায় এবং আয়তনে তুরস্কের যথেষ্ট অঙ্গহানি ঘটল। গান্ধীজী তখন খিলাফৎ দাবীতে সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত করলেন এবং ১লা আগস্ট ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল।

কিন্তু এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল এবং 'অহিংস অসহযোগিতার' কর্মসূচী গৃহীত হল। ১৯১৯ সাল থেকে ভারতে যে গণবিক্ষোভের ঢেউ শুরু হয়েছিল ১৯২০-২১ সালে তা আরও তীব্র আকার ধারণ করল। ১৯২০ সালের প্রথমার্দ্ধে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক দুইশতাধিক ধর্মঘট সংগ্রামে অংশগ্রহণ করল, অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতায় শ্রমজীবী মানুষ জঙ্গী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হল। সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায় তাঁর অভিভাষণে বললেন, 'এই সত্যকে আড়াল করবার কোন প্রয়োজন নেই যে আমরা একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছি ...ঐতিহ্য এবং স্বভাবগতভাবেই আমরা বিপ্লবের প্রতি বিমুখ। ঐতিহ্যগতভাবে জাতি হিসাবে আমরা ধীরে চলায় অভ্যস্ত। কিন্তু যখন আমরা চলার সিদ্ধান্ত নিই তখন আমরা তড়িৎগতিতে

এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলি। কোন জীবন্ত সত্তাই তার অস্তিত্বকালে বিপ্লবকে এড়িয়ে যেতে পারে না।'[১]

রজনী পাম দত্ত লিখছেন, 'মূলগত দিক থেকে কংগ্রেস সভাপতির এই বিশ্লেষণ সঠিক ছিল। কংগ্রেসের মুখপাত্রের এই ঘোষণার বাস্তব অর্থ ছিল এই যে, "একটা বিপ্লবী পরিস্থিতিতে" "স্বভাবগত এবং ঐতিহ্যগতভাবে বিপ্লব বিমুখ" একটা নেতৃত্ব ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতের যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতিতে এইটাই ছিল দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বই বাস্তবে দেখা দিয়েছিল অন্যান্য দেশেও যেখানে যুদ্ধ যে সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল সেই সুযোগ ব্যবহারের উপযুক্ত পরিপক্ক রাজনৈতিক শক্তির অভাব ছিল।'[২]

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই সিদ্ধান্ত করে যে যতদিন না তুরস্কের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিবিধান হয় এবং স্বরাজ অর্জিত হয় যতদিন গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগিতার আন্দোলন ক্রমবর্দ্ধমানভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা আলীভ্রাতৃদ্বয়ের সমর্থনে এবং গান্ধী ও মতিলাল নেহেরুর যুগ্ম উদ্যোগে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে যে নীতি ঘোষিত হয় সেই অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সরকার প্রদত্ত সমস্ত খেতাব প্রত্যাখ্যান, আইনসভা, আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জন, প্রতি ঘরে ঘরে চরকার প্রবর্তন এবং শেষ স্তরে খাজনা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বয়কট আন্দোলনের যে আশু কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল সেগুলি মূলত সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত স্তরের জনগণের মধ্যেই। কারণ আইনসভা, আদালত, স্কুল কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মধ্যবিত্তদেরই মাত্র। ব্যাপক জনগণের নিকট একটি কর্মসূচীই রাখা হয়েছিল—তা ছিল চরকায় সুতা কাটা। খাজনা বন্ধের যে কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল তার সাফল্য সম্ভব ছিল জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই—কিন্তু এই কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল অন্তিমস্তরের আন্দোলন হিসাবে। সি. আর. দাশ অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে বলেছিলেন যে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলগুলি ব্রিটিশের দয়ার দান ছিল না, এগুলি ব্রিটিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং

১। Lajpat Rai Presidential Address to the calcutta Special Session of the National Congress in September, 1920 quoted by R. P. Dutt, in India Today, p. 280.

২। R. P. Dutt. India Today, p. 280

কাউন্সিলগুলিকে পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যাই হোক, নেতারা সমঝোতায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নির্বাচন ও কাউন্সিল বয়কট আন্দোলন উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটও সফল হয়েছিল। আদালত বয়কট করেছিলেন অল্প সংখ্যক আইনজীবী মাত্র। মতিলাল নেহেরু, সি আর দাশ প্রমুখ প্রখ্যাত আইনজীবীর আদালত বর্জন করলেন। বহু ছাত্র ও শিক্ষক স্কুল-কলেজ বর্জন করলেন। কাশী, বিহার, গুজরাট বিদ্যাপীঠ এবং জামিয়া-মিলিয়া, ইসলামিয়া ইত্যাদি কয়েকটি জাতীয় বিদ্যায়তন স্থাপিত হল এবং নরেন্দ্র দেব, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জাকির হোসেন, সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সমস্ত শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা করলেন।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাঁষিক অধিবেশনে কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে গৃহীত হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই সাংবিধানিক উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের যে লক্ষ্য কংগ্রেস এযাবৎকাল ঘোষণা করে এসেছে তার পরিবর্তে 'শান্তিপূর্ণ এবং আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে স্বরাজ অর্জনই' কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হল। কংগ্রেসের সাংগঠনিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটানো হলো নাগপুর অধিবেশনে। বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠন, প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে কংগ্রেসকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হল। খাদি পরিধান, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদকদ্রব্য বর্জন ইত্যাদিও কর্মসূচী হিসাবে ঘোষিত হল, মোটামুটিভাবে বলা যায় কংগ্রেস ঐ সময় জনগণের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করল।

কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে জনগনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব যখন অত্যন্ত তীব্র, যখন আন্তর্জাতিক অবস্থা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অনুকূলে তখন কংগ্রেস জনগণকে পরিচালিত করার কি পন্থা গ্রহণ করল? ১৯২১ সালের শেষদিকে গান্ধী ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত প্রথম সারির কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কতকগুলি শর্তাধীনে প্রতিটি প্রদেশকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার অনুমতি দিল। স্বরাজ অর্জনের জন্য যখন দেশের মানুষ জঙ্গী সংগ্রামী কর্মসূচীর অপেক্ষায় তখন কংগ্রেস ঘোষণা করল এই শর্তাধীন আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী এবং গান্ধী স্বয়ং ঘোষণা করলেন যে ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আদায় হবেই। সংগ্রামে উন্মুখ জনগণ কংগ্রেস ঘোষিত অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলনকেই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করল। ১৯২১ সালে গণআন্দোলন শুধু অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই নয়, দেশের বিভিন্ন অংশে শ্রমিকদের ধর্মঘট, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘট,

মেদিনীপুরে খাজনা বন্ধ আন্দোলন, মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ফেটে পড়তে লাগল। ১৯২১ সালের শেষদিকে এই সংগ্রাম এত উচ্চগ্রামে উন্নীত হল যে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত পবিদর্শনের মধ্য দিয়ে জনগণের বিক্ষোভকে প্রশমিত করার চেষ্টা করল। কিন্তু ফল হলো বিপবীত। ১০ই নভেম্বর যেদিন প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারতে অবতরণ করলেন সেদিন সারা ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করে জনগণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভকে মূর্ত করে তুললেন। জাতীয় আন্দেলনের ক্ষেত্রে এটাই সম্ভবত ছিল ভারতের জনগণের সর্বপ্রথম জাতীয় রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট। জনগণের এই তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব এবং পাশাপাশি ঔপনিবেশক সরকারের নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন ভারতের স্থানে স্থানে জনতা পুলিশের রক্তাক্ত সংঘর্ষের সৃষ্টি করল। মোপলা বিদ্রোহ, বোম্বাই-এর জনগণের প্রতিরোধ, কলকাতায় সি. আর. দাশ সহ সহস্র সহস্র মানুষের গ্রেপ্তার ও তুমুল বিক্ষোভ এবং ভারতের অন্যান্য প্রান্তে জনগণের অনুরূপ জঙ্গী কার্যকলাপ সংগ্রামের চেহারা পাল্টে দিল।

জনগণের এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী সংগ্রামের জোয়ার প্রত্যক্ষ করে গান্ধী প্রমাদ গুনলেন। তিনি বুঝলেন জনগণ অগ্রসর হয়ে চলেছে আপোষহীন সংগ্রামের পথে। তাই আর কালবিলম্ব নয়। এই অগ্রগতির জোয়ার ঠেকাতেই হবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে শহরগুলিতে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই এখন তিনি তাঁর কার্যকলাপ গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করবেন। সি. আর. দাশ সহ সমস্ত নেতৃবৃন্দ যখন বন্দী তখন গান্ধীই হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের ডিরেক্টর। বৎসরের শেষে অনুষ্ঠিত আমেদাবাদ কংগ্রেস গান্ধীকে ব্যক্তিগত এবং গণ-আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার কর্তৃত্ব দিল এবং এই কংগ্রেস থেকেই কংগ্রেসের পিছু হঠা শুরু হল।

গান্ধী সিদ্ধান্ত করলেন যে গুজরাটের একটা তালুক বরদলিতে তিনি তাঁর এই আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করবেন। কিন্তু বরদলিতে এই গণ-আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে উত্তর প্রদেশের (তৎকালীন যুক্ত প্রদেশ) চৌরিচোরা নামক স্থানে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশের এক রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটল। পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষক জনতা একটি থানায় অগ্নিসংযোগ করল এবং সংঘর্ষে ২২জন পুলিশ নিহত হল। জনগণের এই ক্রোধ ও ঘৃণার সংবাদ গান্ধার নিকট পৌছানো মাত্রই গান্ধী অনুভব করলেন আর কালক্ষেপ করা সঙ্গত নয়। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২২, বরদলিতে তাড়াহুড়ো করে

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করে গান্ধী এবং কংগ্রেস 'চৌরিচোরায় জনতার অমানুষিক আচরণের' পরিপ্রেক্ষিতে শুধু গণ-আইন অমান্য আন্দোলন নয়, জন-সমাবেশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মিছিল ইত্যাদি সমস্ত কাযকলাপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং পরিবর্তে সুতাকাটা ইত্যাদি 'গঠনমূলক' কাযকলাপের সিদ্ধান্ত নিলেন। কংগ্রেসের সংগ্রাম শেষ হল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যখন দেশ উত্তাল এবং যখন ব্রিটিশ সরকারও সেই ক্রমবর্দ্ধমান সংগ্রামে আতঙ্কিত তখন গান্ধী এবং তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস ঐভাবেই সেই সংগ্রামের সমাধি রচনা করল।

বরদলির এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংগ্রামী জনগণকেই হতচকিত করল না, এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের মধ্যেই নেতৃত্বের একাংশকে এবং কর্মীদের এক বৃহদাংশকে বিস্মিত করল। সি. আর. দাশ, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় সেই সময় কারান্তরালে ছিলেন। তাঁরাও এই সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হলেন। সি. আর. দাশ ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত হলেন। সুভাষ চন্দ্র বসু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। মতিলাল নেহরু ও লাজপত রায় জেল থেকে গান্ধীর নিকট পত্র লিখে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

কংগ্রেস জনগণের সমস্ত আন্দোলনকেই এমনভাবে সংগঠিত করেছিল যে তাতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় কার্যকলাপের কোন স্থান ছিল না। সমস্ত আন্দোলনটাকেই যান্ত্রিকভাবে একজন মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। ফলে বরদলির সিদ্ধান্ত জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করল প্রচণ্ড হতাশা ও অসহায় বিভ্রান্তি।

ব্রিটিশ সরকারও এবার সুযোগ বুঝে সমস্ত ঘটনার মোকাবিলায় অগ্রসর হল। ১০ই মার্চ গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হল কিন্তু তার জন্য সৃষ্টি হল না কোন গণবিক্ষোভ। গণ-আন্দোলনের জোয়ার গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কল্যাণে এবার ভাঁটায় পরিণত হল।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বস্তি

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগের যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় তাতে ব্রিটিশ সরকার বেশী চিন্তিত হয়নি। স্কুল-কলেজ বয়কট, আইন আদালত বয়কট বা নতুন কাউন্সিলের নির্বাচন বয়কটে ব্রিটিশ সরকার শংকিত হয় নি। কিন্তু শংকিত হল তখনই যখন জনগণের

আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করল। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠন ও কার্যকলাপ জনগণের জঙ্গী বিক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মনে আতংক সৃষ্টি করল। ১৯২২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ভাইসরয় লণ্ডনে সেক্রেটারী অফ স্টেটের নিকট যে তারবার্তা প্রেরণ করেন তাতে এই আতংক সুস্পষ্ট। তারাবার্তায় বলা হয়েছে,

'১৯২০ সালের শেষদিকে আন্দোলনে কতকগুলি অস্বস্তিকর লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলির মধ্যে সামরিক কায়দা-কানুন অনুকরণের একটা ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। এই বাহিনীগুলি অন্তত বাহ্যিকভাবে জনকল্যাণ-মূলক এবং সমাজসেবামূলক উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতারা এই সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সামাজিক বয়কটের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে বিলম্ব করেনি।......এই সংগঠনগুলিতে সদস্যদের গ্রহণ করা হয় হিংসার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণার ভিত্তিতেই। তথাপি ক্রমশ এই প্রতিষ্ঠানগুলি নেতাদের হাতে এমন শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে উপস্থিত হয়েছে যে এগুলি ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং বাস্তবে তা হচ্ছেও। পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, ভীতিপ্রদর্শন এবং বলপ্রয়োগ করে হরতাল এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট সংগঠিত করা, স্বদেশী আন্দোলন বা মাদক দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনের আড়ালে সরকারের কর্তৃত্বকে খর্ব করা এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করাই সাম্প্রতিকালে এই সংগঠনগুলির মুখ্য কাযকলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন স্থানে এরা শুধুমাত্র সামরিক কসরৎ ইত্যাদিই অভ্যাস করছে।'[১]

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন ও তার কার্যকলাপের এই আতংকের পাশাপাশি খিলাফৎ কমিটির কয়েকটি সিদ্ধান্তও ব্রিটিশ সরকারের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্ট করে। অল ইণ্ডিয়া খিলাফৎ কমিটি ১৯২১ সালের জুলাই মাসে করাচীতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে মুসলিম সমাজকে সরকারী চাকুরীতে এবং ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগ না দেবার আবেদন জানায়। লণ্ডনে সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট প্রেরিত ভাইসরয়ের তারবার্তায় এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারবার্তায় বলা হয়,

'এর কিছুদিন পরে—পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীতে আনুগত্য বিনষ্ট করবার জন্য আরো খোলাখুলিভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়। গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে পাঁচশত

১। Telegraphic Correspondence regarding the situation in India, Home Dept. Political, File on 678.SerialNos 19,1922

উলেমা বা শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক এক ফতোয়া জারীর সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।……… এই ফতোয়ায় মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ সবিশেষ ঘৃণ্য পাপ বলে বিবেচিত হয়।'[১]

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, সরকারী চাকুরী ও সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে, খিলাফৎ কমিটির ঘোষণা ব্রিটিশ সরকারের কাছে উদ্বেগ ও শংকা নিয়ে আসে, কিন্তু পরবর্তীকালের দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে নিক্ষেপ করে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে। সেক্রেটারী অফ স্টেটের নিকট ভাইসরয়ের তারবার্তায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে সেই বিপদের স্বীকৃতি। তারবার্তায় বলা হচ্ছে।

'প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতে অবতরণের দিন অর্থাৎ ১৭ই নভেম্বর উত্তর ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রধান শহরে সাধারণ হরতাল পালিত হয়। হিজ রয়াল হাইনেস-এর উপস্থিতির দৃশ্য অবলোকনের পর প্রত্যাবর্তনরত এক জনতার উপর একটা পুলিশী ব্যবস্থার ফলস্বরূপ তিন দিন ব্যাপী গুরুতর দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে। এই হাঙ্গামায় কয়েকজন ইউরোপীয় নিহত হয় এবং মোট নিহতের সংখ্যা ছিল ৫৩ এবং আহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০। কলকাতায় হরতালের দিন স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যাপকভাবে ভীতিপ্রদর্শন করে। অন্যান্য বৃহৎ শহরগুলিতেও অনুরূপ ছোটখাট ঘটনা ঘটে।

'১৭ই নভেম্বরের ঘটনার পর সরকার এক নতুন এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। বিগত কয়েক মাসের হাঙ্গামাসমূহের পর আইনসম্মত কর্তৃত্বের প্রতি একটা ক্রমবর্দ্ধমান অশ্রদ্ধা এবং আইনকানুন অগ্রাহ্য করার একটা বিপজ্জনক ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলি সংগঠিতভাবে হিংসা, ভীতিপ্রদর্শন ও বাধাসৃষ্টির প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ অপরাধ নিরোধক আইনের দ্বারা এর মোকাবিলা সম্ভব নয়।'[২]

অসন্তোষ, বিক্ষোভ শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে নয়—অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে মজুরদের মধ্যেও এবং বেকার যুবকদের মধ্যেও। তারও স্বীকৃতি প্রকট হয়ে পড়েছে তারবার্তায়।

'অনেক স্থানে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্য থেকেই সদস্য সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু এদের কার্যকলাপ যতই হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করল

১। Ibid.
২। Ibid.

ততই বেকার মজুর, কলকারখানার শ্রমিক, শহরে নিম্নস্তরের লোকেরা এদের প্রতি আকৃষ্ট হল........।'[১]

এর সহজ অর্থ আন্দোলন যতই জঙ্গীরূপ ধারণ করল ততই এই আন্দোলনের প্রতি শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষেরা সামিল হতে শুরু করলেন। স্বভাবতই ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে এই ঘটনার তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কিন্তু গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের এই বিপদের অবসান ঘটালেন। গান্ধীর সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ সরকারের চিন্তায় স্বস্তি এনে দিল। কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভাইসরয়ের তারবার্তায় এই স্বস্তির অভিব্যক্তি স্পষ্ট।

'ক্রীসমাস সপ্তাহে আমেদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোম্বাই-এর হাঙ্গামায় গান্ধী গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বিবৃতিগুলিতেই এর প্রমাণ রয়েছে। বোম্বাই-এর হাঙ্গামা গণ আইন-অমান্য আন্দোলনের বিপদসমূহ তাঁর কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিই এর সাক্ষ্য দেয়। এগুলিতে খিলাফৎ পার্টির চরমপন্থী অংশের প্রদত্ত অহিংসা বর্জনের প্রস্তাবই শুধু প্রত্যাখ্যাত হয়নি এমনকি ...... খাজনাবন্ধের উল্লেখও প্রস্তাবে বাদ দেওয়া হয়েছে.......। গান্ধী কংগ্রেস কমিটির একক সর্বেসর্বা নিযুক্ত হয়েছিল।'[২]

আন্দোলনের জঙ্গীরূপ দেখে গান্ধী বিচলিত। ব্রিটিশ সরকারও আন্দোলনের বিস্তৃতি ও তীব্রতায় আতংকিত। ভারতের শেষতম পরিস্থিতি সম্পর্কে তারবার্তায় বলা হচ্ছে,

'অসহযোগ আন্দোলন শহরগুলির নিম্নশ্রেণীর লোকদের গুরুতরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে যদিও এই আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী এযাবৎ আংশিক সাফল্যই লাভ করেছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে এই আন্দোলনের প্রভাব সামান্য হলেও কতকগুলি অঞ্চলে বিশেষ করে আসাম উপত্যকা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশে কৃষকরা এই আন্দোলনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন। পাঞ্জাবে চরমপন্থীদের দ্বারা নিজস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগঠিত আকালী আন্দোলন গ্রামাঞ্চলের শিখদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশ খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাবে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বারংবার সেভার্স চুক্তি সংশোধনের

১। Ibid.
২। Ibid.

সুপারিশ করেছেন। এই সুযোগে আমরা আমাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করতে চাই যে তুরস্ক শান্তিচুক্তি বিশেষ করে কনস্টান্টিনোপল, থ্রেস ও স্মার্ণা সম্পর্কিত অংশ সংশোধিত করে সাত কোটি মুসলমানের সঙ্গে আপোষ করা একান্ত আবশ্যক।'[১]

এমনি একটা পরিস্থিতিতে যখন ভারতের বিস্তৃত অংশে শহরে জনতা থেকে গ্রাম্য কৃষক সমাজ পর্যন্ত এবং হিন্দু, মুসলমান, শিখ সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষুব্ধ এবং সেই বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে জঙ্গীরূপ নিয়ে তখন বিচলিত হয়ে উঠলেন গান্ধীজী এবং শংকিত হয়ে উঠল ব্রিটিশ সরকার। উভয়েরই উদ্দেশ্য সংগ্রামের রাশ টেনে ধরা। গান্ধীজী রাশ টেনে ধরলেন—ব্রিটিশ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বুর্জোয়া নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অদ্ভুত পরিণতি!

রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভীষণতম আঘাত

বুর্জোয়া নেতৃত্ব ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি রুদ্ধ করল এমন একটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যখন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ পেয়েছে একটা প্রচণ্ড আঘাত। ১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পৃথিবীতে সূচনা করেছিল নতুন যুগের—পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম ঘোষণা করল এই বিপ্লব। প্রমাণিত হল ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ শাশ্বতও নয়, অজেয়ও নয়। বরং ধনতন্ত্রের অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী এবং এমন একটা সমাজব্যবস্থা শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করতে যাচ্ছে যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এবং উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক দেশের জনগণ—কোন মুনাফালোলুপ ব্যক্তি বিশেষ নয়। প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের পতন এবং সর্বহারার একনায়কত্ব রাশিয়ার শ্রমিক কৃষককে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তিই এনে দিল না, রুশ অক্টোবর বিপ্লব জাতিগত শোষণের অবসান ঘোষণা করল। একটি দেশের এক জাতি কর্তৃক আরেক জাতির শোষণ, এক ভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে অন্য ভাষাভাষী জনগণের বিরোধ অবলুপ্ত হল এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এশিয়ার উজবেকিস্তান, তাজকিস্তান

১। Ibid.

প্রভৃতি নিপীড়িত পিছিয়েপড়া এবং মধ্যযুগীয় অর্থ নৈতিক ও সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন রাজ্যগুলি পেল এক অপূর্ব মুক্তির স্বাদ—ঘোষিত হল জাতিসমূহের আত্মনিয়ণাধিকার।

রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল সর্বপ্রথম এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের অর্থ রাশিয়ায় শ্রমিক-শ্রেণীর মতো একটা বিপ্লবী শ্রেণীর নেতৃত্ব। বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর কোন দোদুল্যমানতা নেই, নেই কোন পিছুটান বা আপোষমুখীন মনোভাব। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়,

'অক্টোবর বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মতো একটি বিপ্লবী শ্রেণী, সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এই শ্রেণী ইস্পাতের মতো দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, অল্পকালের মধ্যে দুইটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতাও ইহার ছিল, তৃতীয় বিপ্লবের প্রাক্কালে এই শ্রেণীই শান্তি, ভূমি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জনগণের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর মতো নেতৃত্ব যদি বিপ্লবে না থাকিত, জনগণের আস্থা অর্জন করিয়াছে এমন নেতা যদি বিপ্লবে না মিলিত, তবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ঘটিত না, এবং ঐ মৈত্রী না ঘটিলে বিজয়ও সম্ভব হইত না।

'কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, বিপ্লব সাধনে সেই দরিদ্র কৃষকদের মতো বলিষ্ঠ এক মিত্র রুশ শ্রমিকশ্রেণী পাইয়াছিল।

'কৃষিকর্মরত কৃষকসাধারণ সম্বন্ধে বলা যায় যে মাত্র আট মাস ব্যাপী বিপ্লবের যে অভিজ্ঞতাকে বিনা দ্বিধায় "নিয়মিত অগ্রগতির" যুগেব কয়েক দশকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা নিরর্থক হয় নাই, এই সময়ে তাহারা রুশদের সকল পার্টিকেই কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়াছিল এবং নিজেরা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে "সংবিধানী গণতন্ত্রী" কিংবা সোশ্যালিষ্ট রেভলুশনারি মেনশেভিকদের দল জমিদারদের সঙ্গে কখনও সত্যকার সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে না কিংবা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে না, তাহারা বুঝিয়াছিল যে রুশদের একমাত্র যে পার্টি জমিদারদের সঙ্গে একেবারে জড়িত ছিল না এবং কৃষকদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জমিদারদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, সেই পার্টিই হইল বলশেভিক পার্টি। এই বিশ্বাসই হইল সর্বহারাশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর সুদৃঢ় ভিত্তি। যে মাঝারী চাষীরা বহুদিন দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল এবং মাত্র অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে সর্বান্তকরণে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলাইল, সে মাঝারী চাষীরা যে কি করিবে, তাহাও নির্ধারিত হইয়া গেল এই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী দ্বারা।

'এই মৈত্রী ছাড়া অক্টোবর বিপ্লব যে জয়যুক্ত হইত না তাহা বলাই বাহুল্য।

'রাজনৈতিক সংগ্রামে বারবার পরীক্ষিত ও পরিশোধিত বলশেভিক পার্টির মতো পার্টি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতা। চূড়ান্ত আক্রমণে জনগণকে পরিচালনা করার মতো সাহস ও লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার পথে যে নানা প্রচ্ছন্ন বাধা থাকে সেগুলি কাটাইয়া যাইবার মতো সতর্কতা ছিল বলিয়াই শুধু বলশেভিক পার্টির মতো পার্টি এমন নিপুণভাবে একটি ব্যাপক বিপ্লবী প্রবাহের মধ্যে, যুদ্ধ শান্তির দাবীতে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জমিদারী দখলের দাবিতে কৃষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবিতে অত্যাচারিত জাতিসমূহের আন্দোলন, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপনের দাবিতে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো বিভিন্ন ধারাকে মিশাইয়া দিতে পারিল।'[২]

এই বিপ্লব পৃথিবীতে একটি নতুন যুগের সূচনা করল। সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা ভাবনা, নতুন দর্শন মানুষের মনকে আন্দোলিত করল। প্রমাণিত হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রী এবং মার্কসীয় তত্ত্বের মতো একটি বিপ্লবী তত্ত্বই ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই বিপ্লবের প্রভাব কেবলমাত্র রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। প্রভাব বিস্তৃত হল ইউরোপ আমেরিকা ও এশীয় দেশসমূহে। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী উদ্বুদ্ধ হল এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ও সর্বহারার রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। উপনিবেশ-সমূহের নবসৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের মধ্যেও রুশ অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব অনিবার্যভাবেই এসে পড়ল। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনে এই বিপ্লবের প্রভাব পরিলক্ষিত হল। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে থাকায় এবং শ্রমিকশ্রেণী তখনও সুসংগঠিত ও পরিণত অবস্থায় না পৌছানোর দরুন রুশ বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রভাব সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই বিপ্লবের তাৎপর্য ভারতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে শ্রেণীগতভাবেই অক্ষম ছিল,

---

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ ২২৭-২২৮

কিন্তু তা সত্ত্বেও সংগ্রামী জনগণের অগ্রসর অংশের মধ্যে পড়ে ছিল এই বিপ্লবের প্রভাব। তৎকালীন শ্রমিকশ্রেণীর উত্তাল ধর্মঘটগুলি বিশেষ প্রেরণা সঞ্চয় করেছিল রুশ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে। পরবর্তী স্তরে মার্কসীয় দর্শন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা অগ্রণী অংশকে প্রভাবান্বিত করে এবং ভারতেও মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯১৭ থেকে ১৯২২ সাল সময়টাই ছিল জনগণের ব্যাপক বিপ্লবী অভ্যুত্থানে সমৃদ্ধ। এই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রক্রিয়া থেকে ছিল অভিন্ন। দ্বিবিধ উপায়ে এই বিপ্লবী আন্দোলন পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একটা ছিল ধনতান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম এবং অপরটি ছিল নিপীড়িত এবং ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। ১৯১৭ সালে লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রুশ অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বব্যাপী এই বিপ্লবী প্রবাহে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তারপর ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে যে প্রথম ভাঙ্গন সৃষ্টি করল তার প্রক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুধু ভারতেরই নয়, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং আরও বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলন শক্তিশালী রূপ ধারণ করল। ইউরোপের বিভিন্নদেশেও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত হল। ১৯১৮ সালে জার্মান বিপ্লব থেকে শুরু করে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটেছিল। ইংলণ্ডেও শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক ধরনের সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হল। পাশাপাশি আইরিশ বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসনের উপর হানল প্রচণ্ড আঘাত।

ভারতে এবং এশিয়ার বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অক্টোবর বিপ্লবের আবেদন ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রতি এর আহ্বান ছিল খোলাখুলি। পুঁজিবাদী সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের নিকট বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের নিকট এই বিপ্লব উপস্থিত করেছিল এক প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলি শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি, লেনিন এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসার অভিযান চালিয়েছিল। এই সমস্ত মিথ্যা ও কুৎসা ভারতের ধনিকশ্রেণীকে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল ঠিকই কিন্তু শ্রমজীবী জনগণ ভীত হন নি বরং এদের বিরুদ্ধ প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়েই অক্টোবর বিপ্লবের বাণী পৌছেছিল ভারতের সাধারণ মানুষদের মধ্যে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুরু করল তখন তার ফলস্বরূপ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের মনে সোভিয়েতের প্র'ত মৈত্রী ভাব স্থাপিত হল।

.মাট কথা রুশ অক্টোবর বিপ্লব ভারতের সমসাময়িককালের ঘটনাবলীতে অনস্বীকার্যভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের প্রক্রিয়ায় এর প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।

মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন

ভারতের উত্তাল জাতীয় আন্দোলন গান্ধী ও কংগ্রেসের নির্দেশে স্তিমিত হয়ে এলেও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন শিল্পে কখনও বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও বা সংগঠিতভাবে ব্যাপক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হল। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী-কালেব প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক সংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনে দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। লণ্ডন থেকে সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া বিচলিত অবস্থায় ভাইসরয়ের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তারবার্তায় জানতে চাওয়া হয়,

'ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে ভারতে উত্তাল শ্রমিক অশান্তি চলছে। এ বর্ণনা কতটা সত্য? শাসন ব্যবস্থাকে অসম্ভব করে তোলার প্রচেষ্টাতেই কি কংগ্রেস দল এই ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করছে? এই ধর্মঘটগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আপনি কি আমাকে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রেরণ করতে পারেন যাতে আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে সমর্থ হই?'[১]

১। Industrial unrest in India, Govt. of India. Home Dept. Political-B (print) proceedings, December 1920, no 262-266

এই তারবার্তার উত্তরে ভাইসরয় যে রিপোর্ট তারে প্রেরণ করেন তাতে বলা হয়,

'নিঃসন্দেহে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক অশান্তি চলছে। কিন্তু এটা বলা অতিশয়োক্তি যে সারা দেশ শ্রমিক অশান্তিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে এবং ভারতের অবস্থা কোনমতেই ইংলণ্ডের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই বিক্ষোভের কারণসমূহ প্রধানত অর্থনৈতিক। (১) মূল্যবৃদ্ধির চাপ, গত ১২ মাসে মজুরি বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে বা সর্বত্র সমানভাবে বৃদ্ধি পায়নি। (২) একটা সাধারণ বিশ্বাস যে দালালরা এবং খুচরো বিক্রেতারা স্বচ্ছন্দে মুনাফাবাজী করছে। (৩) এই ধারণা যে পুঁজিবাদী মিল মালিকরা অত্যন্ত বেশী মাত্রায় মুনাফা আদায় করছে। (৪) স্বল্প সংখ্যক লোকের আরাম ও সম্পদ এবং বিপরীতভাবে শ্রমিক সাধারণের তুলনামূলক দারিদ্র্য। ৫) দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্পায়ণের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকেব ঘাটতি। সর্বনাশা ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ফলে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে এই ঘাটতি আবও গুরুতর হয়েছে এবং গ্রামের শ্রমিকরাও আর শহরে আসছে না। (৬) বর্তমান অবস্থার প্রতি শ্রমিকদের অসন্তোষ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে না উঠলে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধিতে মালিকদের অনিচ্ছা।

'এই অর্থনৈতিক কারণগুলি ছাড়াও এক ধরনের ধর্মঘটের মহামারী দেখা দিয়েছে। অংশত বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়ন এবং অংশত ইংলণ্ড ও ইউরোপের ঘনঘন শ্রমিক অশান্তির রিপোর্ট এই ধর্মঘটের প্রেরণা জুগিয়েছে। এখানকার রাজনৈতিক প্রচারকরাও অবশ্য এই ধর্মঘটের জন্য কিছুটা দায়ী। যদিও ধর্মঘট এখানেই প্রায়শই ঘটছে তাহলেও এই ধর্মঘটগুলি কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ এবং বিক্ষিপ্ত।··· ·শ্রমিক সংগঠনগুলির সর্বভারতীয় জোট এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফাণ্ডের অভাবের ফলে এই ধরনের শ্রমিক আন্দোলনগুলির পক্ষে দীর্ঘদিন সফলভাবে টিকে থাকা তুলনামূলকভাবে অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। আবার অপরদিকে ভারতের শহুরে শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশ গ্রাম্য কৃষকসমাজের মধ্য থেকে আসার দরুন ধর্মঘটীরা সর্বদাই গ্রামে ফিরে যেতে পারে এবং এর ফলে এদের প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেস পার্টি হিসাবে ধর্মঘট সংঘটিত করছে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু আমাদের কাছে সংবাদ আছে যে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্যোক্তরা সরকারকে অসুবিধায় ফেলবার কৌশল হিসাবে ধর্মঘট যন্ত্রটির কার্যকারীতা উপলব্ধি করে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কংগ্রেসের কোন কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা

গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত রাজনীতিবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মঘট প্রকৃতপক্ষে শুরু হবার পরই ধর্মঘটীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে কিছু কিছু ঢিলেঢালা সংগঠন আছে। বোম্বাই-এ ব্যাপ্টিস্টা এবং মাদ্রাজে ওয়াদিয়ার মত রাজনীতিবিদরা এই সংগঠনগুলির পরিচর্যা করেন যদিও শেষোক্ত ব্যক্তি রাজনীতি ত্যাগ করেছেন বলে বলেন। কতকগুলি সংবাদপত্র বিশেষ করে 'বম্বে ক্রনিকল' ধর্মঘটীদের উৎসাহ দেয়। এই মাসের শেষদিকে বোম্বাই-এ অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হবে এবং তারপর রেলওয়ে শ্রমিকদের যে বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তার উপর এই সংবাদপত্রগুলি খুব ভরসা করছে।'[১]

সরকারী রিপোর্ট সমসাময়িককালের শ্রমিক আন্দোলনের তাৎপর্যকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করলেও প্রকৃত সত্যকে সরকারী রিপোর্ট চেপে রাখতে পারেনি। রিপোর্ট থেকে এই সত্যই স্বীকৃতিলাভ করে যে যুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয় এবং এই আন্দোলন ছিল যথেষ্ট ব্যাপক এবং ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষেও ছিল উদ্বেগজনক। ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক আন্দোলন এই শ্রমিক সংগ্রামের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলেও সরকারী রিপোর্টেও স্বীকার করা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়ন এবং ইউরোপ ও ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন ভারতের এই শ্রমিক আন্দোলনে প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। এই বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়নের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? সরকারী রিপোর্টে এই ব্যাখ্যাকে অস্পষ্ট রাখলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে ১৯১৭ সালের রুশ অক্টোবর বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবোত্তর বিশ্বব্যাপী শ্রমিক জাগরণের বাস্তবতাকেই এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হচ্ছে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবের কথা রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ১৯১৭ সালের রুশ অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীতে যে নতুন যুগের সূচনা করল তার আলোকচ্ছটা ভারতের রাজনৈতিক আকাশকেও আলোকিত করল, চঞ্চল করে তুলল ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে। ঘটনার এই তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ধূর্ত ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি।

রিপোর্টে তৎকালীন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে স্থানীয় ভিত্তিক এবং

১। **Ibid.**

বিক্ষিপ্ত বলে বর্ণনা করলেও এই ঘটনাও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি যে অচিরেই শ্রমিকশ্রেণীর সর্বভারতীয় সংগঠন সৃষ্টি হতে চলেছে। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা এবং সর্বভারতীয় জোটবদ্ধতার অভাবের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ সংগ্রামের যে দুর্বলতা সুস্পষ্ট ছিল সেই দুর্বলতা কাটিয়ে শ্রমিকশ্রেণী সর্ব ভারতীয় স্তরে সংগঠিত হতে চলেছে। পরিস্থিতির এই বিকাশ স্বভাবতই ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে না। আসন্ন বিপদ ব্রিটিশ সরকারকে সচকিত করে তুলেছে। তাই চেষ্টা কিছু অর্থনৈতিক কনসেশন দিয়ে ক্রমবর্ধমান এই বিক্ষোভকে প্রশমিত করা। রিপোর্টে বলা হয়েছে,

'অসন্তোষ দূর করবার জন্য আমরা প্রায় সকল অধস্তন এবং নিম্নতম সরকারী কর্মচারীর বেতন সংশোধন করেছি এবং এই খাতে প্রতি বৎসর কমপক্ষে দশ কোটি টাকা খরচ হবে। ঐভাবে যথেষ্ট পরিমাণ রিলিফ দেওয়া হয়েছে কিন্তু অনেক সময়ই বেতন বৃদ্ধির ঠিক পরেই ধর্মঘট শুরু হয়েছে কারণ মাত্রাতিরিক্ত দাবীদাওয়া মেটানো সম্ভব হয়নি। উদাহরণস্বরূপ এই সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট বোম্বাই-এর পোষ্টাল কর্মচারীদের ধর্মঘটের উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে জুলাই মাসে নতুন মজুরি হার ঘোষণা করবার পর সরকারী ছাপাখানা-সমূহে ধর্মঘট শুরু হয়, কিন্তু যখন এই মজুরির হার পুনর্বিবেচনায় সরকারকে বাধ্য করা গেল না তখন শ্রমিকরা কাজে ফিরে গেল। বেসরকারী মালিকানার শিল্প-সমূহে প্রতিটি ধর্মঘটকেই তার গুণাগুণ অনুসারে বিচার করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই বাঞ্ছনীয় যে দুইপক্ষ নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে নেয়। আমেদাবাদে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মাদ্রাজে এই পন্থা অনুসরণ করে সাফল্য অর্জন করা গেছে। স্থানীয় সরকারগুলি বিশেষ করে বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলি অনুসন্ধান করা এবং এইগুলি মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবস্থা ব্যর্থ হবার পর গভর্নরদের হস্তক্ষেপে সফলতা এসেছে। মোটামুটি এইটাই ধারণা যে ইংলিশ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোর্টস্ এ্যাক্টের অনুরূপ আইনকানুন বর্তমানে সঠিক হবে না। আমরা 'ওয়ার্কাস কমিটির' ধারণাকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করছি এবং জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মালিকেরাও সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ওয়াশিংটন কনভেশনের অনুসরণে আমাদের প্রস্তাবিত ফ্যাক্টরী লেজিস্লেশনস্ মজুরি ছাড়াও শ্রমিকদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী উন্নত করবে। আমাদের কেন্দ্রীয় লেবর ব্যুরো বিভিন্ন তথ্য এবং প্রস্তাব সংগ্রহে ও সরবরাহে অত্যন্ত তৎপর কারণ শ্রমিকদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে

মালিকদের এবং শ্রমিকদের শিক্ষিত করবার প্রয়োজন রয়েছে।[১]

সরকারী রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতায়ই ব্রিটিশ সরকার যথেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য কিছু অর্থনৈতিক কনসেশন দিয়েও শ্রমিকদের ধর্মঘট বন্ধ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সরকারেরই স্বীকৃতি অনুযায়ী দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে ঐ সামান্য কনসেশনের বিরুদ্ধেই শ্রমিকরা ধর্মঘট করে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী মেজাজেরই পরিচয় মেলে। বোঝা যায় যে এই সময়ের ধর্মঘটগুলি পূর্বেকার এলোমেলো চরিত্র থেকে উন্নত হয়ে যথেষ্ট সংহত হয়ে উঠেছিল এবং নেতৃত্বও ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন।

এই সময়টি বিশেষ করে ১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতের উত্তাল রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীরও যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম বিস্তৃত ও তীব্ররূপ ধারণ করেছিল তারই পরিণতিতে ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সর্বভারতীয় শ্রেণী সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। শুধুমাত্র কয়েকজন নেতা বা শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রচেষ্টাতেই এই সর্বভারতীয় সংগঠন সৃষ্টি হয়নি। এর পিছনে ছিল ভারতের শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম—যে সংগ্রাম চঞ্চল করে তুলেছিল ভারতের প্রতিটি শিল্পাঞ্চলকে। সরকারী রিপোর্ট থেকেও ধর্মঘটের এই বিস্তৃতির কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় এবং এই তথ্যগুলির মধ্যে থেকে এই সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের চিত্রটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটের তথ্য এখানে দেওয়া হল।

১। Ibid.

সাম্প্রতিককালে (১৯২০ সাল) **তালিকা নং ১৬**

ভারতের শ্রমিক ধর্মঘটের চিত্র[1]

স্থান	প্রতিষ্ঠান	ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা	মন্তব্য
মাদ্রাজ	মাদ্রাজ ট্রামওয়েজ	১,৪০০	মজুরি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পর ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি হয়
মাদুরা (মাদ্রাজ)	মাদুরা মিলস্	—	শ্রমিকরা বিনাশর্তে কাজে যোগদান করে
মাদ্রাজ	আর্মি ক্লোদিং ফ্যাক্টরী	৩১	„
পাঞ্জাব	নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে	—	আপোষ আলোচনায় ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
জামালপুর (বিহার)	ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে	১০,৩০০	শ্রমিকরা বিনাশর্তে কাজে যোগদান করে
পাটনা (বিহার)	পাটনা ল প্রেস	৭০	বেতন বৃদ্ধির পর শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয়
মজফ্ফরপুর (বিহার)	ডাক কর্মচারী	—	আপোষ আলোচনায় ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
হিংগনঘাট (সেণ্ট্রাল প্রভিন্স)	রায় সাহেব রকচাঁদ মেহতা মিলস্	১০০০	গ্রেন এলাউন্স বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
নাগপুর (সেণ্ট্রাল প্রভিন্স)	এমপ্রেস মিলস্	৫০০০	বেতন বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
বেরিলী (যুক্ত প্রদেশ)	রোহিলখণ্ড এণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে	৬০০	মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
সাহারাণপুর (যুক্ত প্রঃ)	নর্থওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে	১,৫০০	দাবিপূরণের প্রতিশ্রুতির পর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়
ঝাঁসী (যুক্ত প্রঃ)	গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ওয়ার্কশপ	—	আপোষ আলোচনায় ধর্মঘটের মীমাংসা হয়

১। Proceedings April—1920, part B, No 189, Home (Political) Dept. Govt of India.

স্থান	প্রতিষ্ঠান	ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা	মন্তব্য
এলাহাবাদ (যুক্ত প্রঃ)	পাইওনীয়র প্রিন্টিং প্রেস	৭৪৬	কিছু অর্থনৈতিক কনসেশনের ফলে শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়
কানপুর (যুক্ত প্রঃ)	এলগিন মিলস্, উলেন মিলস্, ভিক্টোরিয়া মিলস্, মুর মিলস্, কানপুর কটন মিলস্, গ্যাঞ্জেস্ জুট মিলস্, ফ্লাওয়ার মিলস্, কুপার এলেন এণ্ড কোং, দি ট্যানারী এম্পায়ার ইঞ্জিনীয়ারিং কোং	২০,০০০	মজুরি বৃদ্ধি, বোনাস প্রদান এবং কাজের ঘণ্টা হ্রাস করার পর ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি হয়
কানপুর (যুক্ত প্রঃ)	এলগিন মিলস্	২,৪০০	বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
"	উলেন মিলস্	২,০০০	আপোষ মীমাংসা হয়
"	ভিক্টোরিয়া মিলস্	৫১০	দ্বিসাপ্তাহিক মজুরি প্রদানের প্রতিশ্রুতির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
"	কটন মিলস্	৫,৫০০	মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি এবং বোনাস প্রদানের পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
"	কুপার এলেন	৫,২০০	বোনাস বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের
"	এণ্ড কোং		মীমাংসা হয়
"	ট্যানারী	৬০০	আপোষ মীমাংসা হয়
	এম্পায়ার ইঞ্জিনীয়ারিং	৮০০	মজুরি সামান্য বৃদ্ধির পর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়
"	হারনেস ফ্যাক্টরী	৩,০০০	মজুরি বৃদ্ধির পর শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়
"	আজমান মিলস	৫০০	"
"	হাফিজ হালিম ট্যানারী	৩০০	"

স্থান	প্রতিষ্ঠান	ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা	মন্তব্য
কানপুর [যুঃ প্রঃ]	প্রিমিয়ার অয়েল মিলস্	১৫০	আপোষ মীমাংসা হয়
„ „	স্বদেশী কটন মিলস্	৬০০	আপোষ মীমাংসা হয়
কলিকাতা (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী)	রাজমিস্ত্রী	১০,০০০	মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
কুলটি „	বেঙ্গল আইরণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস	১১,০০০	মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
হাওড়া „	ঘুস্থরী, নিউ সেণ্ট্রাল, গ্যাঞ্জেস, ফোর্ট উইলিয়ম এবং হাওড়া জুট মিলস্	২৭,০০০	মজুরি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দাবি পূরণের প্রাতশ্রুতির পর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়
হাওড়া „	প্যারী এণ্ড কোং	৩০০	
কলিকাতা „	মেসার্স গ্রাহাম এণ্ড কোং	১০০	শ্রমিকরা বিনাশর্তে কাজে যোগদান করে
„ „	ট্যাকসী ড্রাইভারস্	১,২০০	ধর্মঘটের আপোষ মীমাংসা হয়
„ „	রিকশা চালক	৩০০	„
বোম্বাই শহর [বোঃ প্রেসিডেন্সী]	সূতাকল	১,৩৫,০০০	ভাতা বৃদ্ধি, কাজের ঘণ্টা হ্রাস এবং অন্যান্য দাবির মীমাংসার পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	ডাই ওয়ার্কস	২,৮৪২	
„ „	ম্যাকেঞ্জী স' মিলস্	৩৫০	মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিন এণ্ড ডকইয়ার্ড	৪,১৭৫	„
„ „	বম্বে পোর্ট ট্রাষ্ট ওয়ার্কশপ	৩,৫০০	মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	বম্বে পোর্ট ট্রাস্ট ওয়ার্কার্স [টালী ক্লার্ক, কুলি, ক্রেনম্যান ইত্যাদি]	৩,০৭৫	„

স্থান	প্রতিষ্ঠান	ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা	মন্তব্য
বোম্বাই শহর [বোঃ প্রেসিডেন্সী	টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	২০০	ভাতা বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রায় কারখানা	৩,০০০	মজুরি ও ভাতা বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি	৩০০	মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	পি এণ্ড ও এবং বি, আই, এস, এন কোং ডকইয়ার্ড	৬,০০০	মজুরি বৃদ্ধি ও বোনাস প্রদানের পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	অয়েল ইনষ্টলেশানস্	১,৬৮৮	মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„ „	ট্রামওয়ে কোং ওয়ার্কশপ, দাদার	১,৫০০	„
করাচী	ষ্টিভেডোরদের নিযুক্ত কুলী	৬০০	„
বান্দ্রা, বুলসার, কল্যাণ, শোলাপুর	রেল শ্রমিক	৭৭০	বেতন বৃদ্ধির ফলে ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
শোলাপুর	বস্ত্রকল	১৩,৬০০	ধর্মঘট তখনও অমীমাংসিত
পুনা	তাম্রশিল্পের কারিগর	১৫০	বেতন বৃদ্ধির ফলে ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
আমেদাবাদ	„	৪,৮২২	বেতন ও বোনাস বৃদ্ধির ফলে ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
গোধ্রা	পৌরসভার ঝাড়ুদার	১১৩	দাবি মীমাংসার ফলে ধর্মঘটের মীমাংসা হয়
„	পোষ্টাল পিওন	—	বেতন বৃদ্ধির ফলে ধর্মঘটের মীমাংসা হয়

উপরোক্ত ধর্মঘটগুলি ছাড়াও সরকারী নথিপত্র ১৯২০ সাল নাগাদ অন্যান্য যে ধর্মঘট ইত্যাদির তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান ধর্মঘটের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। ভারত সরকারের নথিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে,

'যুক্তপ্রদেশের সরকার রিপোর্ট করেছে যে ঝাঁসীতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান

পেনিনসুলার রেলওয়ের লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টে ১৬ই অক্টোবর থেকে এবং ক্যারেজ এণ্ড ওয়াগন ডিপার্টমেন্টে ১৯শে অক্টোবর থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। কোন সুনির্দিষ্ট দাবি নির্ধাবিত হয়নি কিন্তু ধর্মঘটীদের মূল বিক্ষোভ এই কারণে যে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের মতো লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকরা ওভারটাইমের জন্য কোন অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পায় না। এই বিষয়টি এজেন্টের বিবেচনার জন্য অনেকদিন পূর্বে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন আদেশ প্রকাশিত হয়নি। ক্যারেজ এণ্ড ওয়াগন ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকরা সহানুভূতিমূলকভাবে এবং লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের চাপে ধর্মঘট করেছেন।···· সংবাদপত্রেব রিপোর্টে জানা যায যে রানিং শেডের শ্রমিকরাও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়েছেন। ৩০শে অক্টোবর আরেকটি সংবাদে প্রকাশ সালিশীবোর্ড তাদের রায় ঘোষণা করেছে।'[১]

নথিতে মাদ্রাজ সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হচ্ছে,

'মাদ্রাজের লেবার কমিশনার রিপোর্ট করেছেন যে পেরাম্বুরের বাকিংহাম মিলসের ৫,২৬০ জন শ্রমিকের উপর ২১শে অক্টোবর ১৯২০ থেকে লকআউট প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রমোশন এবং ডিসমিসালকে কেন্দ্র করে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রমিকরা সাধারণভাবে যে উত্তপ্ত ব্যবহার শুরু করেছে ও একজন উইভিং মাষ্টারকে মারধর করার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হযেছে তাতেই এই লকআউট হয়েছে।·· সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭০৭ জন শ্রমিক এই লকআউটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ২৬শে অক্টোবরের সংবাদপত্রেব রিপোর্টে জানা যায় যে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন একটি বুলেটিন প্রকাশ করেছে। বুলেটিনে বলা হয়েছে যে যখন শ্রমিকরা স্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই এবং অস্থায়ী কর্মীদের প্রমোশন সংক্রান্ত বিষয়ে উইভিং মাষ্টার মিঃ বেণ্টলীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন মিঃ বেণ্টলী ক্রোধান্বিত হয়ে একটি পিস্তল বের করেন। তাঁতীরা বেণ্টলীর হাত ধরে ফেলে এবং তখন মিঃ বেণ্টলী পিস্তলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে। একজন তাঁতী পিস্তলটাকে তুলে নেয় এবং ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ ওয়াদিয়াকে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। ওয়াদিয়া পিস্তলটি নিয়ে কয়েকজন শ্রমিকসহ হাইকোর্টে আইনের পরামর্শ গ্রহণের জন্য যান।'[২]

সরকারী নথিতে ঐ সময় কলকাতা এবং বোম্বাই-এ গ্যাস শ্রমিকদের

১। **Industrial unrest in India, Govt. of India, Home Dept, Political—B (print) proceedings. December, 1920, Nos.262-266**

২। **Ibid.**

ধর্মঘট এবং বোম্বাই-এর ট্রাম-শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথাও জানা যায় যদিও ঐ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত তথ্য নথিতে অনুপস্থিত।

ডঃ আর. কে. দাস ১৯১৯-২০ সালের শ্রমিক ধর্মঘটগুলির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁর পুস্তকে সংযোজন করেছেন। তাঁর তথ্য অনুযায়ী,

'৪ঠা নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর ১৯১৯ পর্যন্ত কানপুর উলেন মিলসে ১৭,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ৭ই ডিসেম্বর ১৯১৯ থেকে ৯ই জানুয়ারী ১৯২০ পর্যন্ত জামালপুরে ১৬,০০০ রেলশ্রমিক ধর্মঘট করেন; ৯ই জানুয়ারী থেকে ১৮ই জানুয়ারী ১৯২০ পর্যন্ত কলকাতায় ৩৫,০০০ চটকলশ্রমিক ধর্মঘট করেন; ২রা জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে ২,০০,০০০ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেন; ২০শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী রেঙ্গুনে ২০,০০০ শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ৩১শে জানুয়ারী বোম্বাই-এ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নেভিগেশন কোম্পানীর ১০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ২৬শে জানুয়ারী থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী শোলাপুরের ১৬,০০০ শিল্পশ্রমিক ধর্মঘট করেন; ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০,০০০ ইণ্ডিয়ান মেরিন ডক শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন; ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯শে মার্চ টাটা আইরন এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কসের ৪০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ৯ই মার্চ বোম্বাই-এর ৬০,০০০ শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ২০শে মার্চ থেকে ২৬ মার্চ মাদ্রাজের ১৭,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন; ১৯২০ সালের মে মাসে আমেদাবাদে ২৫,০০০ শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট করেন।'[১]

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় যে ১৯২০ সালের শুরুতেই বোম্বাই-এ দুই লক্ষ শিল্প শ্রমিকের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের শিল্প শ্রমিকদের সংগ্রামের ইতিহাসে এই ধর্মঘট ছিল অভূতপূর্ব। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে ১,২৫,০০০ জন ছিলেন বস্ত্রকল শ্রমিক। বোম্বাই-এর মোট ৮৫টি বস্ত্রকলের মধ্যে ৮০টি বস্ত্রকলের শ্রমিকই ধর্মঘটে যোগদান করেছিলেন।

এর পরই সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ করে। রেলওয়ে, ডক, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান, তৈলশিল্প, সরকারী মিণ্ট, ছাপাখানা, পোর্ট, ট্রামওয়ে, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক—এককথায় সর্বস্তরের শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হন, এই ধর্মঘটগুলির প্রধান লক্ষ্যই ছিল জীবন ধারণের উর্দ্ধগামী ব্যয়সূচীর ক্ষতিপূরণের জন্য বর্দ্ধিত বেতন আদায় করা।

১। Dr. R. K. Das, The Labour Movement in India, 1923, P. 36-37

লক্ষণীয় যে ধর্মঘটগুলি বিস্তৃত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অংশে। যেমন বোম্বাই-এ তেমনি মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার, আসাম এবং অন্যত্র এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে মাদ্রাজের ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা, বিহার এবং আসামে—এই তিনটি রাজ্যেই ৮টি করে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হয়।[১] ১৯১৯ সালের মে মাসে কলকাতায় পোষ্টম্যানদের ধর্মঘট জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

বিভিন্ন নথিতে বা সংবাদপত্রসমূহে সাধারণত প্রধান প্রধান ধর্মঘটগুলির তথ্যই প্রকাশিত হয়। এই বাস্তবতাকে স্মরণে রেখেই সংবাদপত্রসমূহের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে ১৯১৯ সালের একমাত্র অক্টোবর মাসেই ভারতে ৩৮টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং দুইটি ক্ষেত্রে লকআউট হয় এবং এই ধর্মঘটসমূহে মোট ১২,৫০,০০০ জন শ্রমিক সামিল হন। ১৯২০ সালে পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের তুলনায় ধর্মঘটগুলি যেমন বৃহৎ বৃহৎ আকার ধারণ করে তেমনি ধর্মঘটগুলি অনুষ্ঠিত হয় অত্যন্ত ঘনঘন। ঐ বৎসরের প্রথম দুইমাসে একমাত্র বস্ত্রকল ও চটকলগুলিতেই ১১০টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ২৪,৭৫,০০০ জন শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে যুক্ত হন।[২] এই ধর্মঘটগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল: বোম্বাই-এর দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট। পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করে এবং মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০০,০০০। ২রা জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলে এবং মোট ৫,৪০০,০১০ কার্য দিবস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরেকটি হল আমেদাবাদে স্পিনার্সদের সাধারণ ধর্মঘট। ২৯টি মিলে এই ধর্মঘট হয়। এ ছাড়া বস্ত্রকল শ্রমিকদের আরেকটি সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় ব্রোচ এবং শোলাপুরে।

অন্যান্য শিল্পশ্রমিকদের সঙ্গে সমতালে রেলশ্রমিকরাও সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর শর্তাবলী উন্নয়নের জন্য কয়েকবারেই ধর্মঘট করেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হচ্ছে ডঃ আর. কে. দাসের তথ্যে উল্লেখিত ১৯২০ সালের জামালপুরে ১৬,০০০ রেলশ্রমিকের ধর্মঘট।

১। **Ahmed Mukhtar, Trade Unionism and Trade Disputes in India. p. 20.**

২। **Gulzarilal Nanda, "Labour Unrest in India". Indian Economic Journal. Vol. 3, Part 4, No. 12,1922, p. 460.**

এ ছাড়া নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলওয়েতেও এই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এই সময়ে ৬২টি ধর্মঘটের তথ্য পাওয়া যায়। মোট ৪৩,১২৬ জন শ্রমিক এই সংগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ করেন।[১]

১৯২০ সালের শেষার্দ্ধে একমাত্র বঙ্গদেশেই ১১৯টি ধর্মঘটের সংবাদ পাওয়া যায়। ২,১১,৪৭৮ জন শ্রমিক ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করেন।[২] চটকলগুলি ছাড়াও অন্যান্য শিল্পে, বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, ধাতুশিল্প, যানবাহন, কয়লাখনি এবং ছাপাখানাসমূহে এই ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় ভারত সরকারের ছাপাখানায় শ্রমিকদের ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেতন এবং চাকুরীর শর্তাবলীর আপত্তিকর সংশোধনের বিরুদ্ধেই শ্রমিকরা এই ধর্মঘট করেন। ধর্মঘট ক্রমে দিল্লী এবং সিমলায় সরকারী ছাপাখানাসমূহেও বিস্তার লাভ করে।[২]

যে তথ্যসমূহ এখানে সংযোজিত হল তা ঘটনার সমগ্র অংশ নয়। কিন্তু এই তথ্যসমূহ থেকেই তৎকালীন ভারতের শিল্পশ্রমিকদের অশান্ত অবস্থা অনুধাবন করা যায়। এ কথা বলা যায় যে ১৯২০ সালের শেষদিক পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে এমন কোন শিল্প ছিল না যা ধর্মঘট থেকে মুক্ত ছিল। ধর্মঘট হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিল্পজীবনের সহযাত্রী।

দেশব্যাপী এই প্রবল এবং জঙ্গী শ্রেণী-সংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। আধুনিক অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং সর্বোপরি সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন স্থাপনের বাস্তব এবং অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর এই দেশময় উত্তাল সংগ্রামী কার্যকলাপ। রজনী পাম দত্ত বলেছেন;

'এটাই ছিল অবস্থা যার মধ্য দিয়ে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জন্মগ্রহণ করেছিল।' ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পসমূহে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সময়ই সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও অনিবার্য কারণেই খুব সামান্য ট্রেড ইউনিয়নই

১। **Ahmed Mukhtar, Trade Unionism and Trade Disputes in India, p. 21.**

২। **Dr. R. K. Das, Labour Movement in India, p 67.**

৩। **Moral and Material Progress of India (London 1921)**

সাংগঠনিক নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে পেরেছিল। জঙ্গী সংগ্রামের মহান অধ্যায় ঘোষণা করল আধুনিক এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা।[১]

মালিকের মুনাফা বনাম শ্রমিকের বঞ্চনা

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে শিল্পের প্রসার ঘটা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল গভীর অর্থনৈতিক সংকট। শিল্পমালিকরা প্রভূত মুনাফা অর্জন করলেও শ্রমিকদের বঞ্চনা বজায় রইল পূর্ববৎ। তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হল না, কাজের ঘণ্টাও কমানো হল না। ভারতের প্রবল রাজনৈতিক গণসংগ্রাম নিপীড়িত মানুষের মনে যে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিল, অক্টোবর বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যে বৈপ্লবিকবার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল তার প্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। প্রবল অর্থনৈতিক সংকট সেই অনুকূল পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীকে চালিত করল জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের পথে। শ্রমিকদের এই অর্থনৈতিক বঞ্চনার বাস্তবতাকে সরকার নিযুক্ত কমিশনও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। রয়েল কমিশন অন লেবার ইন ইণ্ডিয়া তাঁদের প্রতিবেদনে এই উত্তাল সংগ্রামের কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন,

'যুদ্ধপরবর্তীকালে এই বিরাট সংগ্রামের পিছনে স্পষ্টতই ছিল অর্থনৈতিক কারণসমূহ ও তাঁদের বেতন বৃদ্ধি ছিল বহু প্রতীক্ষিত, এবং বেতন, দীর্ঘ কাজের ঘণ্টা ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রমিকরা যে অন্যায় অবিচার সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছিল সেই সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন ;'[২]

যুদ্ধের সুযোগে শিল্প মালিকরা কল্পনাতীত মুনাফা অর্জন করল। শেয়ার বাজার তেজী হল। বস্ত্রকল মালিকদের মুনাফা শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পেল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৩৬৫ ভাগ।[৩]

চটকল মালিকদের ক্ষেত্রেও একই সত্য প্রযোজ্য। '১৯১৮ সালে যে

১। R. P. Dutt, India Today p. 333

২। Report of the Royal Commission Labour in India, p. 334.

৩। I. L O, Industrial Labour in India, p. 138.

৪৪টি কোম্পানী ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করেছিল তার মধ্যে ৩৩টি শতকরা ২০০ ভাগ বা ততোধিক ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করে এবং মাত্র ৯টি (দুইটি নতুন সংস্থা সহ) শতকরা ৭ ভাগের কম ডিভিডেণ্ড প্রদান করে।'[১] আরেকটি সূত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে গৌরীপুর জুট মিলসে ১৯১৮ সালে শতকরা ২৫০ ভাগ এবং ১৯১৯ সালে শতকরা ৪২০ ভাগ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হয়। ইউরোপীয়দের মালিকানাধীন ৪১টি চটকলে দেখা যায় যে যদিও তাদের মোট মূলধন ছিল ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু ১৯১৮ থেকে ১৯২১ এই চার বৎসরে তাদের মুনাফা হয়েছিল ২৩ লক্ষ পাউণ্ড। এ ছাড়া আরও ১৯ লক্ষ পাউণ্ড রিজার্ভ ফাণ্ডে যুক্ত হয়েছিল।[২]

শিল্প মালিকদের এরূপ প্রভূত মুনাফা এবং তাঁদের এই অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্পশ্রমিকদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় খারাপ হল। জীবন যাত্রার ব্যয়সূচী অনেক বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের মূল্য গড়ে শতকরা ৯৩ ভাগ বৃদ্ধি পেল। আমদানীকৃত অন্যান্য খুচরা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হল শতকরা ১৯০ ভাগ এবং দেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হল গড়ে শতকরা ৬০ ভাগ।[৩]

শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বহুক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি ছিনিয়ে আনতে পারলেও এই বেতন বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে হয়নি। এমনকি সেক্রেটারী অব স্টেটও মন্তব্য করেছেন,

'এই তীব্র মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনেক ক্ষেত্রে বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ কাগজে-কলমে সঠিক মনে হলেও বাস্তবে শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থার খুব সামান্য উপশমই ঘটিয়েছিল।'[৪]

এই মন্তব্য অত্যন্ত সঠিক ছিল। কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্প শ্রমিকদের মজুরির কয়েকটি উদাহরণ দিলে অবস্থাটা সুস্পষ্ট হবে।

১৯১৪ সালে মাদ্রাজের বার্কিংহাম এণ্ড কার্ণাটক মিলসে শ্রমিকদের মাসিক গড় মজুরি ছিল ১০ টাকা ৬ আনা। কোম্পানীর হিসাব মতই ১৯১৯ সালে ১৯১৪ সালের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি

১। Bulletin of Indian Industries & Labour, no 43, p. 2.
২। M. H. Gopal, Trend of Profits—A Factual Analysis, p. 19.
৩। Ibid.
৪। Moral and Material Progress in India (1920) p. 63.

পেলেও শ্রমিকদের মজুরীর গড় বৃদ্ধি এই সময়ে ঘটেছিল শতকরা মাত্র ৪১'৫ ভাগ।[১]

কলকাতায় চটশিল্পে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী ১৯২০ সালে ২০১ [১৯১৪—১০০] ভাগ বৃদ্ধি পেলেও বেতন বৃদ্ধি ঘটেছিল মাত্র শতকরা ১৪০ ভাগ। জামশেদপুর টাটা আইরন এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কসে শ্রমিকদের বেতন ১৯১৭ সালে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ এবং ১৯২০ সালে শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২]

১৯১৯ সালে বোম্বাই-এ বস্ত্রকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের সময় এন. এম যোশীর মতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল কমপক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ। রক্ষণশীল সরকারী হিসাবও প্রায় অনুরূপই ছিল। বোম্বাই-এর মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের মতে ঐ সময় শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ঘটেছিল শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ।[৩] কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম শতকরা ১০ ভাগ ওয়ার বোনাস ঘোষণা করবার পর বেতন বৃদ্ধি কোন ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগের বেশী দাঁড়ায়নি।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এই বঞ্চনার বিরুদ্ধেই সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ফলে শ্রমিকরা যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা উপেক্ষণীয় নয়। বরং বিগত ত্রিশ বৎসরে শ্রমিকদের মোট যে বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল ১৯১৯-২০ সালের সংগ্রাম তার চেয়েও বেশী বৃদ্ধি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। বেতন বৃদ্ধির দাবির পাশাপাশি আরেকটি যে দাবি শ্রমিকদের চঞ্চল করেছিল তা ছিল দৈনিক দশ ঘণ্টা শ্রমের দাবি। এযাবৎ শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টার প্রকৃতপক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিসীমা ছিল না। সর্বত্রই ১০ ঘণ্টার অধিক কাজ করতে হত। এক্ষেত্রেও শ্রমিকদের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডঃ আর. কে. মুখার্জী মন্তব্য করেছেন যে ১৯২২ সালে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী এ্যাক্টে সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা শ্রমের যে নীতি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল তা

১। Report of the Royal Commission on Labour in India, Vol. II, part I, p. 147.

২। R. K. Mukherjee, The Indian Working Class, p. 146.

৩। Evidence of Bengal Unrest Committee & Bombay Industrial Disputes Committee, 1921.

শ্রমিকরা ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিল্পে যে নীতি প্রয়োগ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন তার চেয়েও বেশী সাফল্যের সূচনা করেছিল।[১]

এই সময়ের ধর্মঘটগুলির মধ্যে সফল ধর্মঘটের অনুপাতও ছিল উল্লেখযোগ্য-ভাবে বেশী। ১৯২০ সালের শেষার্দ্ধে বঙ্গদেশে যে ৯৭টি ধর্মঘট হয়েছিল তার মধ্যে ৬৬টি ধর্মঘটেই শ্রমিকরা সাফল্য অর্জন করেছিল।

এই যুগের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাংগঠনিক চরিত্র

ধর্মঘটগুলির সাফল্য শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছিল এবং শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ধর্মঘট পরিচালনা এবং সাংগঠনিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও শ্রমিকরা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' বলেছে,

'শহরের সমস্ত বস্ত্রকলগুলির ১৫,০০০ শ্রমিককে সংশ্লিষ্ট করে ১৯১৯ সালে বোম্বাই-এর সাধারণ ধর্মঘট যেরূপ দ্রুততার সঙ্গে এবং সঠিক তালে প্রতিদিন বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সুনিশ্চিতভাবে এই সংগ্রামে যে সংহতি ছিল তাতে এক অভিনব সংগঠন এবং পরিকল্পনার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সুসংবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আরো অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময়কার ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাংগঠনিক চরিত্র সম্বন্ধে রজনী পাম দত্ত বলেছেন,

'এই সময় বহু ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল, অনেকগুলিই ছিল মূলত স্ট্রাইক কমিটি। আশু সংগ্রামের প্রয়োজনে এগুলি গড়ে উঠেছিল এবং এগুলির কোন স্থায়িত্ব ছিল না। শ্রমিকরা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকলেও এর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল অন্যদের হাতে। ফলে ভারতের প্রথমযুগের শ্রমিক আন্দোলনে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও সমাজতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণীর ধ্যানধারণা বা শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি। ফলে অন্যান্য শ্রেণী থেকে বিভিন্ন কারণে যে 'বহিরাগতরা' বা সাহায্যকারীরা সাংগঠনিক কাজে এগিয়ে এসেছিলেন এবং যাঁদের এগিয়ে

১। R. K. Mukherjee, The Indian Working class, p. 374.
২। The Times of India, Bombay, January 17, 1919.

আসা এই প্রাথমিক স্তরে অনিবার্য ছিল তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য এবং কর্তব্য উপলব্ধি না করেই এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন মধ্যবিত্ত রাজনীতির চিন্তাধারা। তাঁদের উদ্দেশ্য জনসেবামূলকই হোক, অথবা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্য নিয়েই হোক বা জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্য নিয়েই হোক, তাঁরা এসেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তাধারার বিরোধী একটা ধ্যানধারণা নিয়ে। শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে যে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন সেই শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে এই নবজাত শ্রমিক আন্দোলনকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা এঁদের ছিল না। এই দুর্ভাগ্য ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে দীর্ঘদিনযাবৎ বিড়ম্বিত করেছিল এবং গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল শ্রমিকদের চমৎকার জঙ্গী এবং বীরত্বপূর্ণ মনোভাবকে। এই প্রভাবগুলি এখনও বজায় রয়েছে।[২]

তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনকে উৎসাহ দিতেন জাতীয় আন্দোলনে গণ-সমর্থনের স্বার্থে। বিরাট সংখ্যক বঞ্চিত এবং বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা একটা উপযুক্ত জনতা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তাই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের একটা অংশ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করবার উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের ছিল না। তাঁরা শ্রমিকদের পরামর্শ দিতেন গ্রামে ফিরে যেয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে।

মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন

প্রচলিত ইতিহাসে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শুরু ধরা হয় ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বি. পি. ওয়াদিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নের জন্মকাল থেকে। এই তত্ত্বটি যথাযথ না হলেও ঐ ইউনিয়ন স্থাপনের ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বি. পি. ওয়াদিয়া যে পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে ওয়াদিয়া প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন পরিচালনা করবার প্রেরণা নিয়ে আসেননি, তিনি এসেছিলেন মানবিক কারণে অনুপ্রাণিত হয়ে। ওয়াদিয়া

১। R. P. Dutt, India Today, pp. 333-334.

ছিলেন থিয়োসফিস্ট মিসেস্ এ্যানি বেসান্তের একজন সহযোগী। তিনি কি-ভাবে শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত হলেন তা তাঁর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী,

'আমার মনে পড়ে একদিন অপরাহ্নে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি যাঁদের আমি কখনও দেখিনি আমার কাছে এল এবং শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলল। তারা বার্কিংহাম এণ্ড কার্নাটক মিলের কথা উল্লেখ করল। ঐ মিলের কথা আমি অস্পষ্টভাবে শুনলেও ঐ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। তারা কয়েকমিনিট ধরে আমাকে বলল কিভাবে শ্রমিকরা তাড়াহুড়ো করে তাঁদের খাবারগুলো গিলে ছুটত। ভয় পাছে কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমি নিউ ইণ্ডিয়া অফিসে মিসেস এ্যানি বেসান্তের অধীনে কাজ করতাম।...রাজনৈতিক কর্ত্তব্যের চেয়ে আধ্যাত্ম প্রেরণাই আমাকে বেশী পেয়ে বসল। আমি একটা গাড়ী ভাড়া করলাম এবং তাদের সঙ্গে কারখানায় গেলাম। আমি সেখানে দেখলাম সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যাহ্ন বিরতির সময় শ্রমিকরা কয়েকটি দানা গিলছে এবং ছুটে যাচ্ছে পাছে কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।'[১]

মাদ্রাজের শ্রমিকদের সংগঠিত করার দিক থেকে ওয়াদিয়া যে ভূমিকা পালন করেন তার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বোম্বাই-এ লোখাণ্ডের ভূমিকা কিছুটা তুলনীয়। যদিও সময়ের ব্যবধানে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনও ঘটেছিল যথেষ্টভাবে। তাই লোখাণ্ডে যা করতে পারেননি ওয়াদিয়া তা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নই ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম প্রয়াস। নিয়মিত সভ্যপদ এবং চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা এই প্রথম প্রবর্তিত হল। সদস্যপদের জন্য মাসিক এক আনা চাঁদা নির্দ্ধারিত হয়েছিল। এর সদস্যপদ প্রথমদিকে কেবলমাত্র বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ট্রাম শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা এবং বাস্তবে যে কোন শিল্পের শ্রমিকই এই ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভের অধিকারী ছিলেন। অবশ্য বস্ত্রকল শ্রমিকরাই অধিক সংখ্যায় এই ইউনিয়নের সদস্য হয়েছিলেন।

লক্ষণীয় যে এই ইউনিয়নটি গঠিত হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনের একটা অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর ক্ষেত্রে। মাদ্রাজের তুলনায় বোম্বাই ও বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন অনেক বেশী ব্যাপক ছিল। কাজেই এটা বোঝা যায় যে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন গঠনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবদানই ছিল মুখ্য। রজনী পাম দত্ত বলেছেন, 'একটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিল্পাঞ্চলে (১৯২১-২৩ সালে মাদ্রাজে

১। B P. Wadia, Labour in Madras (Madras 1921) pp 14-15

মোট ২৮ লক্ষ দিন ধর্মঘট হয়েছিল যেখানে বোম্বাই ও বাংলায় ধর্মঘটের দিনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ মিলিয়ন ও ২০ মিলিয়ন) এই উদ্যোগের আবির্ভাব এর ব্যক্তিগত চরিত্রকেই প্রকাশ করে; এবং ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রভাবকে অতি গুরুত্ব দেওয়া সঠিক হবে না।'[১]

এই ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর থেকেই সমবায় সমিতি স্থাপন, লাইব্রেরী ও রিডিংরুম গঠন ইত্যাদি শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা বি. পি. ওয়াদিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর শ্রমিকরা তাঁদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে মালিকদের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক সাড়া না পাওয়ায় শ্রমিকরা যখন ধর্মঘটের দাবী জানাল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ওয়াদিয়া ধর্মঘটের বিরোধিতা করলেন। ৩রা জুলাই ১৯১৮, ওয়াদিয়া এক বক্তৃতায় বললেন,

'যদি ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে তোমরা বিন্নি এণ্ড কোং-এর মালিকদের পকেটকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাও তবে তাতে আমার আপত্তি নেই কারণ তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু এই পদক্ষেপের ফলে তোমরা মিত্রশক্তির স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। আমাদের সৈন্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজন এবং তারা অসুবিধায় পড়বে। মিলের এবং সরকারের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন ইউরোপীয় খারাপভাবে চলছে বলে যারা আমাদের রাজার হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাদের ক্ষতি করার কোন অধিকার নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে অবশ্যই কোন ধর্মঘট করা চলবে না।'[২]

ওয়াদিয়া এভাবে ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মালিকপক্ষই এগিয়ে এসে আঘাত করল। কারখানা লক-আউট করে দেওয়া হল এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় শ্রমিকরা পিছু হটলেন। দাবিদাওয়া সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখতে হল। প্রথমযুগের শ্রমিক আন্দোলনেই মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করবার জন্য লক-আউটকে এক মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল।

ওয়াদিয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সাংবিধানিক। তিনি মনে করতেন 'শোষণকে এড়ানোর একমাত্র পথই হচ্ছে প্রাদেশিক কাউন্সিলে শ্রমিকদের নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠানো যাতে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক সমস্ত ব্যবস্থাবলীর

১। R. P. Dutt, India Today, p. 334.
২। Ibid. pp. 334-335.

দায়িত্ব অর্পণ করা যায় শ্রমিকদের আস্থাভাজন দায়িত্বশীল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।'[১]

ব্রিটিশ লেবার পার্টিকে আদর্শ অনুমান করে বৃটেনের লেবার পার্টির নীতির অনুরূপ নীতি ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে গৃহীত হলেই মোটামুটি শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হবে এই ধারণা ওয়াদিয়া এবং তাঁর সমসাময়িক শ্রমিকনেতাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে শ্রমিকদের সমস্যাকে দেখবার একটা ঝোঁক অধিকাংশ শ্রমিক নেতার দৃষ্টিভঙ্গিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়নস মিঃ জে. এফ. জেনিংস-এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন,

'সামান্য কয়েকজন বাদে ভারতের শ্রমিক নেতারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মূল নীতিটিকে অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরা উপলব্ধি করেন না যে একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার ভূমিকার সঙ্গে লেবার পার্টির নেতাদের ভূমিকার অনেক পার্থক্য।'[২]

ওয়াদিয়া ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে গ্লাসগো ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে মাদ্রাজের শ্রমিকদের পক্ষে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন এবং ভাষণ দিয়েছিলেন। লণ্ডনে জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্ট কমিটি তখন ইণ্ডিয়ান রিফর্মস বিল বিবেচনা করছিলেন। ওয়াদিয়া সেই কমিটির নিকট ভারতের এসেম্বলী এবং কাউন্সিলে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন।[৩]

১। The Royal Commission on Labour in India, Evidences, Vol. VII, part I, pp, 182-3.

২। Ahmed Mukhtar, Trade unionism and Trade Disputes in India, Forword, pp V-VI.

৩। এই দৃষ্টিভঙ্গী ওয়াদিয়ার একক ছিল না। কাউন্সিলে প্রবেশ অর্থাৎ সাংবিধানিক প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে জনগণের সমস্যা সমাধান ও অধিকার অর্জন ছিল ভারতের মধ্যবিত্ত রাজনীতির এক বিশেষ ঝোঁক। ভারতের মধ্যবিত্ত রাজনীতির আরেকটি প্রধান ঝোঁক ছিল সন্ত্রাসবাদ। বস্তুত ভারতের মধ্যবিত্ত রাজনীতি কাউন্সিলে প্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ এই দুই ঝোঁকের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি নির্ভর সন্ত্রাসবাদ টিকে থাকতে পারেনি। এই দুই ঝোঁকের বিপরীত ছিল গণসংগ্রামের পথ। শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত রাজনীতিতে গণসংগ্রামই শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বিবেচিত।

আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন ও গান্ধীবাদী আদর্শ

আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা গান্ধীজী। ১৯১৮ সালে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয়ভাবে এটি 'মজুর মহাজন' নামে পরিচিত। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি আলোচনাকালে এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপও কিছুটা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই সংগঠনটির মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের সমস্যা এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীজী যে স্থান অধিকার করে আছেন তাতে শ্রমিকদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সঠিকভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে গান্ধীজী তখন প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের উদ্যোগ আয়োজন গ্রহণ করছেন। সেই সময় তিনি আমেদাবাদে শ্রমিকদের সংস্পর্শে এলেন। গান্ধীজী স্বয়ং ঐ সময়ের ঘটনা সম্পর্কে লিখছেন,

'... আমি শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডে এবং শংকর লাল পরিখের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। তাঁরা জানালেন যে খেদা জিলায় শস্য উৎপাদন ব্যর্থ হয়েছে এবং কৃষকরা খাজনা দিতে অসমর্থ। তাই কৃষকদের পরিচালনার জন্য তাঁরা আমাকে আহ্বান জানালেন।

'একই সময় আমেদাবাদের শ্রমিকদের সম্পর্কে শ্রীমতি অনুসূয়া সরাভাই-এর কাছ থেকেও একটা চিঠি পেলাম। মজুরি কম ছিল এবং শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবৎ মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছিল এবং যদি সক্ষম হই তবে আমারও ইচ্ছা ছিল ওদের পরিচালনা করি। কিন্তু এত দূর থেকে তুলনামূলকভাবে এই সামান্য ব্যাপার পরিচালনা করার আত্মবিশ্বাস আমার ছিল না, তাই আমেদাবাদ যাওয়ার এই প্রথম সুযোগই আমি গ্রহণ করলাম।......

'আমি একটা খুব সঙ্গীন অবস্থায় পড়লাম। শ্রমিকদের দাবিদাওয়া খুব সঙ্গত ছিল। মিলমালিকদের পক্ষে শ্রীযুক্ত অম্বলাল সরাভাই এই বিরোধের নেতৃত্বে ছিলেন। শ্রীমতি অনুসূয়া বাঈকে তাঁর ভাই-এর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। আমার সঙ্গে মিলমালিকদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা আমার পক্ষে আরো কঠিন হল। আমি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং বিরোধকে সালিশীতে প্রেরণ করবার জন্য অনুরোধ জানালাম। কিন্তু তাঁরা সালিশীর নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করল।

·····তারা বলত 'শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পিতাপুত্রের মত ··· আমরা কি করে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারি? সালিশীর সুযোগ এখানে কোথায়?"

এই ঘটনার মধ্য দিয়েই গান্ধীজী শ্রমিকদের সংস্পর্শে এলেন এবং আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশন গঠন করলেন। শ্রমিকদের বিরোধ নিষ্পত্তির যে আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তা হল এই সালিশীর ব্যবস্থা।

গান্ধী এই সংগঠনের আদর্শকেই শ্রমিক সংগঠনের আদর্শ হিসাবে প্রচার করতে লাগলেন। 'যদি আমি আমার পথে অগ্রসর হই' গান্ধীজী লিখলেন, 'আমি ভারতের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে আমেদাবাদের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করব।'[২] ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রচলিত ধ্যানধারণা থেকে এই আদর্শ স্বভাবতই সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আদর্শটার আসল চরিত্র কি?

এই এসোসিয়েশনের প্রধান বিশেষত্বই ছিল এর সালিশী ব্যবস্থা। ১৯১৮ সালের আমেদাবাদ বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং সেই ধর্মঘটে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মীমাংসার কাহিনী থেকেই চিত্রটি ফুটে উঠবে।

আমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকদের আগস্ট ১৯১৭ থেকেই শতকরা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশের মত উচ্চহারে বিশেষ বোনাস প্রদান করা হতো। প্লেগ মহামারীর ফলে শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার জন্যই এই বিশেষ বোনাস দেওয়া হত। জানুয়ারি ১৯১৮তে অকস্মাৎ মালিকপক্ষ এই বোনাস বন্ধ করে দেয় এবং তখন শ্রমিকরা শতকরা ৫০ ভাগ মহার্ঘভাতা দাবি করে।

গান্ধীজী সালিশী বোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তিনি 'মিলমালিকদের বক্তব্য বোঝবার চেষ্টা করলেন এবং তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধিই ন্যায়সঙ্গত হবে।'[৩] মিলমালিকরা এই মীমাংসা প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হলেন একটি শর্তে, "যদি গান্ধীজী ভবিষ্যতে শ্রমিকদের কাছ থেকে দূরে থাকবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিষয়গুলি শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যেই ছেড়ে দেন।'[৪]

১। M. K Gandhi, An Autobiography or Tho story on with Truth. pp. 259-260.

২। P. P. Lakshman, Congress and Labour Movement In India, (Allahabad 1948) p. 10.

৩। R. J. Soman, Peaceful Industrial Relations (Allahabad, 1958), p. 235.

৪। Ibid, p. 242.

এই শর্তে গান্ধীজী রাজী হননি এবং মালিকরা ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ লক-আউট ঘোষণা করল এবং যে শ্রমিকরা শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধিতে রাজী হবে একমাত্র তাদেরই কাজে গ্রহণ করা হবে বলে জানালো।

স্বভাবতই এই অবস্থায় সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হল। গান্ধীজী তখন তাঁর নিজস্ব অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। শ্রমিকদের সমবেত সংগ্রামের ঊর্দ্ধে নিজেকে স্থাপন করলেন এবং ধর্মঘটীদের মনোবল এবং সংগ্রামী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংগ্রামকে বিস্তৃত করবার পরিবর্তে এবং জনগণকে এই সংগ্রামের পিছনে সামিল করবার পরিবর্তে তিনি ব্যক্তিগত অনশন শুরু করলেন। অবশেষে স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীধ্রুব সালিশী নিযুক্ত হলেন এবং তিনি একটি মীমাংসা প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি হল: শ্রমিকরা তাদের দাবী ৭½ শতাংশ কমিয়ে আনবে এবং মালিকরা তাদের দেয় ৭½ শতাংশ বৃদ্ধি করবে এবং মোট ২৭½ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হবে। ২১ দিন ধর্মঘট চলার পর এই প্রস্তাবে ধর্মঘটের মীমাংসা হল।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের এই সালিশী ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে আমেদাবাদ মিলমালিক সমিতির এক প্রস্তাবে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২০ একটা স্থায়ী সালিশী বোর্ড স্থাপিত হল। এই বোর্ডে মালিকদের পক্ষ থেকে একজন আর শ্রমিকদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন। গান্ধীজী প্রথম থেকেই এই বোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে রইলেন। রয়াল কমিশনের বিবরণ অনুযায়ী এই সালিশী বোর্ডের কার্যপদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:

'আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পে আমেদাবাদ মিল ওনার্স এসোসিয়েশন এবং আমেদাবাদ লেবার ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি হয়েছে যে সমস্ত শ্রম-বিরোধ মিলের শ্রমিক এবং মিলের পরিচালকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে আলোচিত হবে। যদি কোন শ্রমিকের কোন অভিযোগ থাকে তবে তা মিলের প্রতিনিধি পরিষদের কোন সদস্যের কাছে জানাতে হবে। সেই সদস্য প্রয়োজন অনুযায়ী মিলের মুখ্য পরিচালক বা মিলের এজেন্টের সঙ্গে কথা বলবে। যদি অভিযোগের মীমাংসা না হয় তবে লেবার ইউনিয়নের কাছে একটা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পেশ করতে হবে। লেবার ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তা—সাধারণত সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক মিলের পরিচালক বা এজেন্টের কাছে যাবে অভিযোগের মীমাংসার জন্য। যদি এই স্তরে কোন মীমাংসা না হয় তবে লেবার ইউনিয়ন বিষয়টি মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের কাছে পেশ করবে। মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী সংশ্লিষ্ট মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টির আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করবে। একাধিক মিল

বা একাধিক শ্রমিক সম্পর্কিত সাধারণ বিরোধগুলি সম্পর্কেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। যদি মিল ওনার্স এসোসিয়েশন বা লেবার ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনার ফলে শেষ পর্যন্ত বিরোধটির মীমাংসা না হয় তবে সেই বিরোধ স্থায়ী সালিশী বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হবে।'[১]

এটাই ছিল শ্রমিক মালিক বিরোধ মীমাংসার গান্ধী প্রবর্তিত আদর্শ।

আমেদাবাদ শ্রমিকদের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণাকে মূর্তরূপ প্রদান করেন। 'তিনি তাদের (শ্রমিকদের) সর্বসাধারনের হিতসাধনের কর্মে অংশীদার বলে মনে করতেন। মিলমালিকদের তিনি ট্রাস্টি হিসাবে বিবেচনা করতেন। তাদের মধ্যে যে কোন বিরোধই পারস্পরিকভাবে মীমাংসা করতে হবে। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কেও বিধান দেন। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে শুধুমাত্র আন্দোলন করা বা ধর্মঘট করাই ট্রেড ইউনিয়নের কাজ নয়, সদস্যদের তাদের পরিবার-পরিজনদের এবং সামাজিক উন্নতির জন্যও কাজ করতে হবে।......এই কাজে তিনি শংকরলাল বাংকার এবং প্রখ্যাত শিল্পপতি অম্বলাল সরাভাই-এর ভগ্নী অনুসূয়া বাঈ-এর সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁরা আমেদাবাদ মিল মজদুর ইউনিয়ন গঠন করলেন।......এর ফলে আমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক হয়েছিল।'[২]

গান্ধীজী মালিকদের ট্রাস্টি হিসাবে বিবেচনা করতেন। এই ট্রাস্টির ব্যাখ্যাও গান্ধী দিয়েছেন। 'আমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে গান্ধীজী তাদের বলেছিলেন যে তারাই হচ্ছে কারখানার প্রকৃত মালিক। পুঁজি-পতিদের সম্পদের চেয়ে তাদের শ্রম অনেক বেশী মূল্যবান। কিন্তু যদি ট্রাস্টিই প্রকৃত মালিকের স্বার্থে কাজ না করে তবে কি হবে? নাগরিক জীবনে ট্রাস্টি বিশ্বাস ভঙ্গ করলে পর তার প্রতিকারের পথ আছে। আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। যদি ট্রাস্টি প্রকৃত মালিকের স্বার্থে কাজ না করে তবে আদালত সেই ট্রাস্টিকে বাতিল করে দিয়ে নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করতে পারে। যতক্ষণ না জনগণের স্বার্থে কাজ করে এমন সরকার গঠিত হয় ততক্ষণ এই পদ্ধতি শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। গান্ধীজী তাই শ্রমিক ও কৃষকদের তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহের উপদেশ দিয়েছিলেন।'

১। Report of the Royal Commission on Labour in India 1931. p. 139.
২। J. B. Kripalani, Gandhi, 'His Life and Thought', p.78.
৩। Ibid, p, 370.

গান্ধীজীর আত্মজীবনী থেকেই পূর্বে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে যখন আমেদাবাদের মিলমালিকদের কাছে শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি সালিশীর প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন মালিকরা বলেছিল যে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কাজেই এখানে সালিশীর কোন প্রয়োজন নেই। গান্ধীও বলেছেন যে এই মালিকরাই হচ্ছে শ্রমিকদের ট্রাস্টি। 'তিনি অহিংসায় বিশ্বাস করতেন এবং তাই তিনি নিশ্চিতভাবে পুঁজিপতি ও জমিদারদের অস্তিত্ব বিলোপের বিপক্ষে ছিলেন। তথাপি তিনি চাইতেন যে শোষণের অবসান হোক। তিনি বিশ্বাস করতেন এটা সম্ভব হয় যদি জমিদার ও পুঁজিপতিরা গরীবদের ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করে। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রেই এটা প্রয়োগ করা যায়। পিতামাতারা সন্তানদের ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করে।......ট্রাস্টি শব্দটির অর্থ যা তা হচ্ছে এই যে সে প্রকৃত মালিক নয়। ট্রাস্টি যার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত সেই হচ্ছে প্রকৃত মালিক।'[১]

আমেদাবাদের মিলমালিকরা যখন বলে শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের পিতাপুত্রের সম্পর্ক তখন গান্ধী প্রবর্তিত এই ট্রাস্টি-তত্ত্বের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। মিলমালিকদের মোটা কথাগুলিকেই গান্ধী একটা তত্ত্বরূপ দান করে শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয়, শোষণের বিলোপের পরিবর্তে শোষণকে জীইয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই তত্ত্ব রচিত। পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষককে জঙ্গী আন্দোলনের পথ থেকে বিরত করা এবং একদিকে পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের এবং অপরদিকে জমিদার ও কৃষকদের সহাবস্থান বজায় রেখে শ্রেণী-শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং শোষণ-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাকে বহাল তবিয়তে রক্ষা করাই এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। এই প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব উদ্ভাবনই গান্ধী-আদর্শের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এই আদর্শ নিয়েই আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশন গঠিত। এই এসোসিয়েশনের চাঁদাও মালিকদের সাহায্যে শ্রমিকদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হ'ত। এই এসোসিয়েশনের আদর্শ অনুযায়ী মালিকরাও শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারতেন। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এমন কি কারখানার ম্যানেজারও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারতেন। অর্থাৎ সবদিক দিয়েই গান্ধী এই এসোসিয়েশনকে একটা কোম্পানী

১। Ibid, p. 370.

ইউনিয়নের চরিত্র দান করেছিলেন। ভারতের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে এই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করবার দিবাস্বপ্নই গান্ধীজী দেখেছিলেন।

১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর গান্ধী এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। গান্ধীজী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 'একটা সময় আসবে যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষে আমেদাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে······কিন্তু আমি তাড়াহুড়া করব না। ঠিক সময়মতই এটা হবে।'[১]

বস্তুত গান্ধীজী শ্রেণী বিশ্লেষণে বিশ্বাস করতেন না। শ্রমিকরা তাঁর মতে কোন শ্রেণী নয়। মালিকরাও কোন শ্রেণী নয়। নতুন শিল্প-সমাজকেই তিনি অত্যন্ত সর্বনাশাকর বলে মনে করতেন এবং তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল বৃহৎ ও আধুনিক শিল্পভিত্তিক এই সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে প্রাচীন ভারতের হস্তশিল্প-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদী মালিকানার মধ্যে নিহিত ক্ষতিকারক দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তিনি যন্ত্রের মধ্যেই সব সর্বনাশ আবিষ্কার করলেন। তাই তিনি প্রাচীন ভারতের হিন্দু বর্ণ-পদ্ধতির পুনর্জীবনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। স্পষ্টতই সমাজ বিশ্লেষণে তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল।

হিন্দু বর্ণ-পদ্ধতির পুনর্জীবনের কামনা করলেও তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীকে তিনি গণ্য করতেন মোটামুটি শূদ্র বর্ণের সমতুল্য। প্রাচীন ভারতের আদর্শ মতই এই শূদ্রদের দায়িত্ব ছিল পরিশ্রম করা এবং ধনীদের কর্তব্য শূদ্রদের অন্নের ব্যবস্থা করা। কোন পক্ষই তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারবে না এবং যদি করে তবে সেই পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণাম হিসাবে শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে সংগঠিত হওয়ার বিষয়টিকে তিনি কখনই সমর্থন করেননি। বিভিন্ন স্থানের বা বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের একই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। ইউনিয়ন শুধু শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে এবং কোন রাজনীতির সংস্পর্শে আসবে না—এই কথা তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাই দেখা যায় স্বাধীনতা

১। P. P. Lakshman, Congress and Labour Movement in India, p. 10

আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি দেশের জনগণকে বারংবার হরতাল পালনের আবেদন জানালেও শ্রমিকদের সম্বন্ধে সেই হরতালের আওতা থেকে বাদ রেখেছেন। অর্থাৎ হরতালের অর্থই করা হয়েছে শ্রমিক ধর্মঘট বাদ দিয়ে দোকান পাট বন্ধ ইত্যাদির কার্যক্রম। তাঁর এই মতাদর্শ ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় ও বিদেশী পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ ফলপ্রসূরূপেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

আমেদাবাদের 'মজুর মহাজন' তাঁর এই আদর্শেই গঠিত এবং গান্ধী-প্রভাব দীর্ঘদিন আমেদাবাদের মজুরশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনার বিকাশে বিঘ্নস্বরূপ ক্রিয়া করেছে।

অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন

গান্ধী প্রতিষ্ঠিত আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন অবশ্য ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাধারণ ধারায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নিরবচ্ছিন্ন ধর্মঘট সংগ্রাম ও তার মধ্য দিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির আবির্ভাব ভারতের মাটিতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করল। যদিও অনেক ট্রেড ইউনিয়নই এই সময়ে গঠিত হয়েছিল ধর্মঘটের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সেগুলির আয়ুষ্কালও ছিল স্বল্পস্থায়ী, তা' সত্ত্বেও অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়নই স্থায়ী চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হল। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নের নাম তাদের প্রতিষ্ঠা সাল সহ নীচে উল্লেখ করা হল।

তালিকা নং ১৭

১। দি প্রেস এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, কলিকাতা (১৯১৯)
২। দি ক্যালকাটা ট্রামওয়ে এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (১৯১৯)
৩। নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯)
৪। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯)
৫। মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯১৯)
৬। পাঞ্জাব প্রেস এসোসিয়েশন (১৯১৯)
৭। মাদ্রাজ এণ্ড সাদার্ন মহারাষ্ট্র রেলওয়ে ইউনিয়ন, মাদ্রাজ (১৯১৯)
৮। জামশেদপুর লেবার এসোসিয়েশন (১৯২০)

৯। আমেদাবাদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯২০)

১০। ইণ্ডিয়ান কলিয়ারী ইমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (১৯২০)

১১। বি. এন. রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন (১৯২০)

১২। অল ইণ্ডিয়া পোস্টাল এণ্ড আর. এম. এস. ইউনিয়ন (১৯২০)

১৩। দি ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়ান স্টাফ এসোসিয়েশন (১৯২০)

১৪। দি বার্মা লেবার ইউনিয়ন (১৯২০)

১৫। হাওড়া লেবার ইউনিয়ন (১৯২০)

১৬। দি ওড়িয়া লেবার ইউনিয়ন (১৯২০)

১৭। বি. এণ্ড এন. ডব্লিউ রেলওয়েমেনস্ এসোসিয়েশন (১৯২০)

১৮। বি বি. এণ্ড সি. আই রেলওয়ে এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (১৯২০)

১৯। ই. বি. রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (১৯২০)

২০। বম্বে পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (১৯২০)

২১। বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন (১৯২০)

২২। দি ড্রাইভার্স, অয়েলমেনস্ এণ্ড ফায়ারমেনস্ ইউনিয়ন, থ্রসল্ ইউনিয়ন, দি ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, আমেদাবাদ (১৯২০)

শ্রমিকদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত বিভিন্ন প্রার্থক্য সত্ত্বেও, শিল্পগত ঐতিহ্যের অভাবের মধ্যেও এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং আরো নানরূপ অসুবিধা সত্বেও ভারতের শ্রমিকরা প্রারম্ভিক যুগেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল এবং তাদের এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠল ভারতের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ। ১৯২০ সাল নাগাদ ভারতে ১২৫টি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা হল ২,৫০,০০০।[১] স্থায়ী ভিত্তিতে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার যুগের উদ্বোধন হল এভাবেই।

প্রারম্ভিক যুগে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি সরকারের মনোভাব

ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিস্তৃতি ও তীব্রতার পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের এই নতুন তরঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল।

১। S. D. Puunekar, Trade Unionism in India, (Bombay, 1947), p, 78.

১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মসের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের এই তীব্রতা সরকারকে আরও চিন্তিত করে তুলল। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের এই উপলব্ধিতে বিলম্ব ঘটল না যে রাজনৈতিক আন্দোলনে অশান্ত ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের এই নতুন সংযোজন পরিস্থিতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট আরো জটিলতর করে তুলবে। তাই এই প্রথম যুগেই সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করবার ব্যবস্থা করল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর ইউরোপীয় ধনবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর উপর রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের প্রভাব সরকারগুলিকে ইতিমধ্যেই শংকিত করে তুলেছিল। তারই সঙ্গে যখন ভারতেও শ্রমিক জাগরণ শুরু হল তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার স্বভাবতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপকে তারা মনে করত রাজদ্রোহিতা হিসাবে। শ্রমিকদের সভা শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গুপ্তচর বৃত্তি, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড প্রদান এবং আরো বিভিন্নরূপ পুলিশী হয়রানী চালানো হতো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে। এই কঠিন অবস্থার মধ্যেই প্রথম যুগের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করা অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে ভারতের মাটিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন।

শ্রমিক অশান্তিতে বিচলিত হয়ে দমনপীড়নের পাশাপাশি সরকার শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য ইংলণ্ডের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোর্ট এ্যাক্টের কায়দায় শ্রমআইন প্রণয়নের কথাও চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমবিরোধসমূহে সরকারের হস্তক্ষেপ সর্বক্ষেত্রে মালিকশ্রেণীর পক্ষেই যেতে লাগল। তা ছাড়া মালিকদের সাহায্য করা ব্যতীত শ্রমবিরোধে সরকারী হস্তক্ষেপের খুব বেশী আগ্রহও দেখা যেত না।

মাদ্রাজ সরকার একটা লেবার এ্যাডভাইসরী বোর্ড স্থাপন করেছিলেন। শ্রমবিরোধ তদন্তের জন্য কোর্টস্ অফ এনকোয়ারী নিয়োগ করার জন্যই এই বোর্ড অভিমত প্রদান করেছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কোর্টস্ অফ এনকোয়ারী কিছু কিছু শ্রমবিরোধ মীমাংসা করতে সক্ষম হলেও অচিরেই এই পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছিল।

১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট্‌স্ এন্‌কোয়ারী কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনায় অনুকূল মনোভাব থাকলে এবং

আলোচনার কোন পদ্ধতি চালু থাকলে এই প্রদেশের অনেক শ্রমবিরোধই গুরুতর আকার ধারণ করার পূর্বেই মীমাংসা করা যেত।[১] এই কমিটি সুপারিশ করে যে গ্রেট ব্রিটেনের হুইটলি কমিটির অনুকরণে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিতে ওয়ার্কার্স কমিটি গঠন করা হোক এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কনসিলিয়েশন বোর্ড স্থাপন করা হোক। কিন্তু এই সুপারিশ অনুযায়ী ওয়ার্কার্স কমিটি বা কনসিলিয়েশন বোর্ড কোনটাই শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়নি। শ্রমিকদের পূর্বের অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯২১ সালের নভেম্বরে বোম্বাইতেও অনুরূপ একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সুপারিশ করে যে শ্রমবিরোধ দূর করবার জন্য মজুরির হার সংশোধন করা হোক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্বাধীনভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া হোক, মালিকদের দ্বারা ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কার্স কমিটি, শ্রমিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা, বাসস্থানের উন্নত ব্যবস্থা ইত্যাদি চালু করা হোক।[২] ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোর্ট এ্যাক্টের অনুকরণে আইন প্রণয়নের সুপারিশও করে এই কমিটি। কোর্টস অফ এন্‌কোয়ারী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কোর্টস অফ কনসিলিয়েশন চালু করবার সুপারিশও করা হয়। বোম্বাই প্রাদেশিক সরকার এই বিষয়ে একটি বিলও প্রণয়ন করেন কিন্তু অবশেষে ভারত সরকারের নির্দেশে সবকিছুই পরিত্যক্ত হয়।

মোট কথা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভারতবর্ষে তখনও এমন জোরদার হয়নি বা এর সমর্থনে জনমতও এমন প্রবল হয়নি যে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের শ্রমিকরা সরকারকে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য করেছিল তার ভগ্নাংশও সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই দেশে প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেও এই সময় শ্রমিকদের পক্ষে এই ধরনের কোন দাবী তোলা হয়নি। যদিও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সবসময়ই অনুভব করতেন যে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণে মালিকদের ক্রমাগত অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু এই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী সরকার শ্রমিক আন্দোলনকে একটা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবেই গণ্য করত এবং সেই অনুযায়ী সরকারী হস্তক্ষেপের অর্থই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীকে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শ্রমিক আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা।

১। Ahmed Mukhtar, Trade Unionism and Trade Disputes in India, p. 116

২। Ibid, p 118.

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৯২০

ঐতিহাসিক মুহূর্ত

মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালীন, বিশেষ করে অক্টোবর বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি ভারতে যে গণ-সংগ্রাম ও জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটায় তারই পটভূমিকায় জন্মলাভ করে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করে অধিকতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি। যুদ্ধের সমাপ্তি, অক্টোবর বিপ্লব, এবং পুঁজিবাদের প্রথম বিশ্ব সংকটের আবির্ভাব ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগায় নতুন শক্তি। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও এই সংগ্রামে তারা স্থান বেছে নেয়। ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসাবে।

বোম্বাই-এর শ্রমিকদের সঙ্গে বালগঙ্গাধর তিলকের যোগাযোগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইংলণ্ড প্রবাসের সময় তিলকের দৃষ্টিভঙ্গী আরো সম্প্রসারিত হয়। তিনি বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে পরিচিত হলেন। বৃটেনে শ্রমিক আন্দোলনের গতিধারার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি হয়ে ভারতেও অনুরূপ শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করলেন। তাঁর এই নতুন অনুভূতিজাত কার্যকলাপ এবং বোম্বাই-এর শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে অক্টোবর বিপ্লবের পর সারা বিশ্বে, বিশেষ করে ইউরোপে যে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয় ভার্সাই চুক্তিতে তার গুরুত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি। তাই জাতিসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে

১৯১৯ সালে লীগ অফ নেশন্‌সের অংশ হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা হয়।[১] ব্রিটিশ-ভারত এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিল এবং ১৯১৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্মেলনে ভারতের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বি. পি. ওয়াদিয়া ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন।

১৯২০ সালে ওয়াশিংটনে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারত সরকার এন. এম. যোশীকে মনোনীত করেছিলেন এবং তিলক নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রধান প্রতিনিধির উপদেষ্টা হিসাবে। তিলক প্রধান প্রতিনিধির সহকারী হিসাবে ওয়াশিংটন কনফারেন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করেন এবং ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯১৯ সালের ২৯শে নভেম্বর বোম্বাই শহরে এলফিনষ্টোন মিলের নিকট দশ সহস্র শ্রমিকের এক সভায় তিলক এই অস্বীকৃতির কারণ ব্যাখ্যা করেন।[২]

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় যে আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার সম্পর্কে ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুরুতর প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল। প্রশ্নটা এই যে ভারতের শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধি কে এবং এই প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে কাদের দ্বারা। এন. এম. যোশীর সহকারী হিসাবে শ্রম সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে সরকার কর্তৃক এন. এম. যোশীর মনোনয়ন সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ২৯শে নভেম্বরের সভায় তিলকের প্রকাশ্য অস্বীকৃতি পরবর্তীকালে এন. এম. যোশীর মনোনয়নের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর শ্রমিকরা সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ৭ই জুলাই বোম্বাই-এর প্যারেলে শ্রমিকরা এক সভায় মিলিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন,

'লীগ অফ নেশন্‌সের সনদের ৩৮৯ এবং ৪১২ ধারাকে সরাসরি লংঘন করে ভারত সরকার যেরূপ অসাংবিধানিকভাবে ইন্টারন্যাশনাল লেবর কনফারেন্সে

১। আই. এল. ও. একটি ত্রিপক্ষীয় সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা এখানে মিলিত হয়ে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সংস্কারমূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করবেন এটাই ছিল লক্ষ্য। আই. এল. ওর সনদ রচিত হয়েছিল মানবিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের সরকারকে আই. এল ওর সুপারিশ কার্যকর করতে বাধ্য করার কোন ক্ষমতা এই সংস্থার নেই।

২। Source Material for A History of the Freedom Movement in India, Collected from Bombay Govt. Records, vol. II. 1885-1920. p, 317.

এবং কমিশন অফ এনকোয়ারীতে ভারতের শ্রমিকদের প্রতিনিধি মনোয়ন করেছে বোম্বাই-এর সংগঠিত শ্রমিকদের এই সভা এবং উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং শ্রমিকদের নিজস্ব প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা নির্বাচনের সুস্পষ্ট অধিকার ঘোষণা করছে। শ্রমিকদের প্রদত্ত অধিকার অনুসারে এই সভা সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে যে মিঃ এন. এম. যোশীর মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হোক এবং তৎপরিবর্তে যথাযথভাবে নির্বাচিত ভারতের সংগঠিত শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করা হোক।

'এই সভা বোম্বাইতে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করছে এবং প্রথম সভাপতি হিসাবে লালা লাজপত রায়কে নির্বাচিত করছে।'[১]

দেওয়ান চমনলাল তার রিপোর্টে বলছেন,

'সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সংঘটিত করবার কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে হাতে নেওয়া হয়। ৫০০ জন সদস্যকে নিয়ে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। ২২শে আগষ্ট দিন নির্ধারিত হয়। লালা লাজপত রায় সভাপতি নির্বাচিত হন। মেসার্স ব্যাপ্টিস্টা, এণ্ডুজ, ব্রেলভি, লোকমান্য তিলক এবং মিসেস বেসান্ত সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।'[২]

আই. এল. ওর প্রতিনিধিত্বকে কেন্দ্র করে সংঘটিত উপরোক্ত ঘটনাকেই অনেকে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সৃষ্টির কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। এ. আই. টি. ইউ. সির. গঠনে আই. এল. ওর প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটির তাৎক্ষণিক ভূমিকা থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে যে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সর্বপ্রথম এই কেন্দ্রীয় শ্রেণী সংগঠনটি। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন,

'আগেই বলেছি, ১৯১৮ সালে আমাদের দেশের মজুরদের ভিতরেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওই সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হয়। এই সময় নানাস্থানে মজুরদের ধর্মঘট ও শুরু হয়ে যায়। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে তা বেড়েই চলল। রুশ বিপ্লব আমাদের মজুরদের

১। A. I. T. U. C.—Fifty years Documents, Vol. I. Preliminary note by D. Chaman Lall. p. 4.

২। Ibid. p. 4.

সামনেও আশার আলো তুলে ধরেছিল। মজুর সংগ্রামের ভিতর দিয়েই ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।'[১]

কিন্তু এভাবেও অনেকে বিশ্লেষণ করেন যে ১৯২০ সালের অপেক্ষা ১৯০৫-৮ সালে যেহেতু তিলকের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে শ্রমিকশ্রেণী তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাই বোধ হয় ঐ সময়টাই ছিল শ্রমিকদের শ্রেণী-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়বার উপযুক্ত মুহূর্ত। কিন্তু ১৯০৫-৮ সালে তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকা থাকলেও শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে সাম্রাজ্য-বাদী ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরাও যুদ্ধোত্তরকালে যে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করেছেন তার নজীর অতীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ১৯১৭ সালের রুশ অক্টোবর বিপ্লব সারা পৃথিবীতে অগ্রণী শ্রমিকদের মনে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল, যে আশাবাদ ও সম্ভাবনার বাণী বহন করে এনেছিল তার প্রভাব এক্ষেত্রে ছিল অতুলনীয়। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতের তথা সারা বিশ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অত্যন্ত সঠিক মুহূর্তেই ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর এই শ্রেণীভিত্তিক কেন্দ্রীয় সংগঠনটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।[২]

নেতৃত্বের রাজনৈতিক মতাদর্শ

১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর কেন্দ্রীয় শ্রেণীসংগঠনের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিল এবং যাঁরা এই সংগঠন গড়তে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা। ধ্যানধারণায় জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল 'সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া'। লোকমান্য তিলক ছিলেন তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের সুবৃহৎ স্তম্ভ এবং মতামতের দিক

১। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি' ১৯২০-১৯২৯, পৃঃ ১৩।

২। অপর দিকে ১৯২০ সালেই এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা খুব তাড়াহুড়া করে করা হয়েছে এই ধরনের মতামতও ঠিক নয়। এ. আই. টি. ইউ. সি'র প্রথম অধিবেশনেই সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় এই মত খণ্ডন করে বলেন, 'The Trade Union movement of our country is yet in its infancy and it may be said that All India Trade Union Congress is rather premature. In my humble judgement, it has not come a day too soon'. Presidential Address, A. I. T. C.— Fifty years, Documents, Vol. I p. 26,

থেকে অনেক বেশী জঙ্গী। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের সমস্যাকে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রমিক সমস্যা তাঁর কাছে ছিল বিচার্য।

ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ২৯শে নভেম্বর, ১৯১৯ বোম্বাই-এর শ্রমিকদের সভায় তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তার থেকে শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে পরিস্ফুটিত হয়। তিনি যা বলেন তার সারাংশ হচ্ছে,

'এই দেশের প্রত্যেককেই একজন মজুর বা শ্রমিক বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে হিন্দু এবং খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোক্ত ধর্মের মতে কাজ হচ্ছে এটা অভিশাপ, প্রথমোক্ত ধর্ম অনুযায়ী কাজ আশীর্বাদস্বরূপ এবং মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত। কবি তুকারাম বলেছেন ঈশ্বর প্রদত্ত কাজ সম্পন্ন করবার জন্য যেন বারংবার জন্মলাভ হয়। কাজেই মানুষকে শ্রমিক এবং মালিক হিসাবে বিভক্ত করা ভুল। এই ধারণার জন্ম ইংলণ্ডে এবং সেখান থেকে ভারতে এসেছে, কিন্তু কিছুতেই এই ধারণা বিস্তারলাভ করতে দেওয়া হবে না। ইংরেজরা বুঝতে শুরু করেছে যে এই ধারণা ভুল।

... ...

'তারপর বক্তা ভারত ও ইংলণ্ডের মজুরির তুলনা করলেন। ভারতের শ্রমিকরা দৈনিক দুই আনা মজুরি পেতেন, এখন যুদ্ধের জন্য দৈনিক ১২ আনা বা ইংরেজী মুদ্রায় ১ শিলিং পেয়ে থাকেন। অথচ ইংলণ্ডে একজন সাধারণ কনেষ্টবল মাসিক ১৫০'০০ টাকা এবং একজন ট্রাম কণ্ডাক্টার সপ্তাহে ১৪ পাউণ্ড পেয়ে থাকেন। শ্রোতারা কল্পনা করতে পারেন যে কি বিলাসিতার মধ্যে তারা বাস করে। যা হোক তিনি শ্রোতাদের সতর্ক করে দেন যে ঐশ্বর্য একটা আপেক্ষিক শব্দ এবং মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার উপর তা নির্ভরশীল। ইংলণ্ডে যুদ্ধপূর্বকালের অপেক্ষা বর্তমানে সকলেই অনেক বেশী দরিদ্র। তিনি যে সিদ্ধান্তে আসতে চান তা হচ্ছে এই যে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি অপেক্ষা সুখ বৃদ্ধিই অধিকতর কাম্য। মানুষের মজুরি তার ব্যয় অনুপাতে হওয়া প্রয়োজন.........

'তারপর তিনি ওয়াশিংটনে সেবারা কনফারেন্সে কেন যাননি তার কারণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে যে শ্রমিকদের দ্বারা

প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সরকার মনোনীত ব্যক্তির সহকারী হিসাবে যেতে নারাজ।

'তিনি আরো বললেন যে ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে তিনি তাদের জন্য একটি বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। বাণীটি হচ্ছে যে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করতে হবে এবং যত শক্তিশালী তারা হবে তত দ্রুত তারা তাদের অধিকার অর্জন করবে। এই বিষয়ে কোন বাধার কাছে তারা নতি স্বীকার করবে না।'[১]

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পূর্বে শ্রমিকদের সভায় প্রদত্ত এই বক্তব্য থেকে শ্রমিক সমস্যার প্রতি তিলকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, মানবিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার বোধে এবং বিরাট অসংগঠিত ও বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়েই তিলক এবং অন্যান্যরা শ্রমিকদের সংগঠিত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে যাঁরা এই বিষয়ে তিলকের ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন তাঁদের মধ্যে লালা লাজপত রায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লালা লাজপত রায় এ. আই. টি. ইউ. সি-র প্রথম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ অধিবেশনে তিনি সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দান করেন তাতে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুটিত হয়।

অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্রখ্যাত নেতৃদ্বয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং বিঠলভাই প্যাটেল সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু সম্মেলন মঞ্চে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন থ্যাঙ বি. পি. ওয়াদিয়া উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন থিয়োসফিষ্ট মিসেস এ্যানি বেসান্ত। সার্ভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এন. এম. যোশী উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বোম্বাই-এর মিল মালিকরাও দূরে থাকেননি। যে ধনী ব্যক্তিরা সম্মেলন

১। Source Material for A History of the Freedom Movement in India, Collected from Bombay Govt. Records, Vol. II, 1885-1929, pp. 317-318.

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে লালুভাই সামলদাস, লালজী নারেইনজী, হংস্‌রাজ পি. থ্যাকার্‌সে, লালুভাই ডি. জাভেরজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধনীদের মধ্যে আরো কয়েকজন ছিলেন যাঁদের সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের যৎসামান্য যোগাযোগ ছিল। লক্ষীদাস রাউজী তাইরসী একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ. আই. টি. ইউ. সির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। মাভজী গোবিন্দজীও একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তিলকের সহযোগী হিসাবে বোম্বাই-এর প্যারেল অঞ্চলে শ্রমিকদের অনেক সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে মিঞা মহম্মদ হাজী জান মহম্মদ ছোটানী নামে বোম্বাই শহরের একজন বৃহৎ ব্যবসায়ীর নামও উল্লিখিত আছে। তিনি এ. আই. টি. ইউ. সি. অধিবেশনের জন্য পাঁচশত টাকা দান করেছিলেন। তিনি খিলাফৎ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন।[১]

সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এল. আর. তাইরসী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাকে সমর্থন করেন জে. এন. হালদার, জলিল খান এবং সুভানি। এই সুভানির পুরো নাম ওমর সুভানি এবং তিনি ছিলেন বোম্বাই-এর একজন মিল মালিক। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে জানা যায়।[২]

তৎকালীন অগ্রণী মহিলাদের মধ্যে সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মিস্‌ নাগুতাই যোশী, মিসেস্‌ অবন্তিকাবাঈ গোখেল। মিস নাগুতাই যোশী একজন চিকিৎসক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে সম্মেলনে মিঃ জিন্নার সঙ্গে মিসেস্‌ জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। মিসেস গোখেল ছিলেন একজন সমাজসেবী।

সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বম্বে ক্রনিকল-এর সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি এবং কে. এফ. নরীম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রেলভি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রায় আঠারো বৎসর পর মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের আমলে তিনি বম্বে টেক্সটাইল এনকোয়ারী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। নরীম্যান ছিলেন একজন প্রগতিশীল পার্শী যুবক। তৎকালীন পার্শী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী মূলত

১। A. I. T. U. C.—Fifty years, Documents, Vol. I, Introduction, pp. IXXIIXIXXII.

২। Ibid, p IXXIV.

ব্রিটিশ রাজত্বের অনুকূলেই ছিল। নরীম্যান ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এস. এ. ডাঙ্গের মতে ১৯৩৭ সালে মন্ত্রিত্ব গঠনের সংকটকালে সর্দার প্যাটেল নরীম্যানের খ্যাতি এবং রাজনৈতিক জীবনের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেন [১]

উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারী রেভাঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজ, ছিলেন দেওয়ান চমনলাল। চমনলাল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এ. আই. টি. ইউ. সি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইলংণ্ডে ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ অব ইণ্ডিয়ার অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। ১৯২০ সালে নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের শ্রমিক ধর্মঘটে তিনি সক্রিয় সমর্থন দান করেন।

সম্মেলনের জন্য যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় তার চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ ব্যাপ্টিস্টা। পেশায় তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার এবং যথেষ্ট ধনীও ছিলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচন করার মধ্য থেকে অনুভব করা যায় তিনিও শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের ইনডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির আদর্শে প্রভাবান্বিত ছিলেন এবং ভারতে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন।

লক্ষ্যণীয় যে এ. আই. টি. ইউ. সির এই প্রথম সম্মেলনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ সহ, শ্রমিকনেতা, সমাজসেবী বুর্জোয়াদের একাংশ সমবেতভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের নিজস্ব ধ্যানধারণা নিয়ে এঁরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে শ্রমিক সমস্যার প্রতি এঁদের সহানুভূতি প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে গান্ধীজী এই সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন এবং এমনকি কোন বাণীও সম্মেলনে প্রেরণ করেননি। এস. এ. ডাঙ্গের বক্তব্য অনুযায়ী 'যদিও এ. আই. টি. ইউ. সির গঠনের প্রথম পর্বে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিলকই ছিলেন এর পরিচালিকাশক্তি তবু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও এই বিষয়ে পরামর্শ করা হয়েছিল। তিনি এই পরিকল্পনাও অনুমোদন করেননি। এবং যখন এ. আই. টি. ইউ. সির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল তখন তিনি তথায় উপস্থিত হতে বা কোন বাণী প্রেরণ করতে অসম্মত হলেন। এই বিষয়ে তাঁর একটা নীতি ও কৌশলগত লাইন ছিল। এবং তা ছিল শ্রমিকশ্রেণীর

১। A. I. T. U. C.—Fifty Years, Documents Vol, I. Introduction p, IXXV.

এবং তাঁর ট্রেড ইউনিয়নগুলির কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার বিরোধী।'[১] গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী তাঁর এই ভূমিকা সঙ্গতিপূর্ণই ছিল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার বিপজ্জনক ফলাফল তিনি তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লক্ষপতি ধনী ব্যক্তিরা সম্মেলন মঞ্চকে সুশোভিত করলেও সভাস্থলে অন্যরা যাঁরা স্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ভারতের শ্রমিকশ্রেণী। লোকমান্য তিলকের সঙ্গে শ্রমিকদের যোগাযোগ থাকলেও ১লা আগস্ট, ১৯২০ তারিখে তিলকের মৃত্যুর ফলে তিলকের সম্মেলন মঞ্চ দেখা সম্ভব হয়নি। আর যাঁরা মঞ্চে ছিলেন তাঁদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গেই শ্রমিকদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তৎকালীন শ্রমিক ধর্মঘট ও রাজনৈতিক আলোড়ন শ্রমিকদের মধ্যেও যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তারই আহ্বানে বোম্বাই-এর শ্রমিকরা দলে দলে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্রমিকদের পাশে উপস্থিত ছিলেন ছাত্ররাও। বোম্বাই-এর ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে অগ্রণী অংশ যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকের কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্নরকম দায়িত্ব পালন করেছিলেন এঁরা। রাজনীতি সচেতন এই ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এস. এ ডাঙ্গে, আর. এস. নিম্বকর প্রমুখরা।

৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর, ১৯২০ যখন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তখন ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলন বা শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠেনি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সমগ্র নেতৃত্বটাই ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে। অথচ বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও তার আদর্শ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার না করে পারেনি। তাই এই বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন সৃষ্টি হল অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তখন ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় ফ্রন্টের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বেও প্রতিষ্ঠিত হল এবং শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্ত মোর্চায় অগ্রসর হল।

১। A. I. T. U. C—Fifty Years, Documents, Vol. I, Introduction, p, IXXXIII, Italics Original.

ফলে জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বের স্বভাবসিদ্ধ দোদুল্যমানতা ও দুর্বলতার প্রভাব এই নবজাত শ্রমিক সংগঠনের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের উপরও প্রত্যক্ষ হল। কিন্তু কালক্রমে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পরিপক্কতা অর্জন, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা, কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ঐতিহাসিক পক্রিয়ায় ভারতের এই প্রথম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনটিকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে অনেক পরিবর্তন ও ভাঙন-গডনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এই ভাঙন-গড়ন চলেছিল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই ভাঙন-গড়নের প্রক্রিয়ায় সংস্কার পন্থী ও অপোষপন্থীরা এ আই. টি ইউ. সি ত্যাগ করে গিয়েছিল এবং গড়ে তুলেছিল সংস্কারপন্থী একাধিক সংগঠন। কিন্তু এখানেই ঠেকে থাকেনি। ১৯৪৭ সালে ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তীকালে ৬০-এর দশকে আন্তর্জাতিক ভাবে মার্কসবাদকে সংশোধনের অপচেষ্টা এবং ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তার প্রভাব, ভারতের শাসকশ্রেণীর চরিত্রের মূল্যায়ন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে গুরুতর মতভেদ, পার্টির একাংশের সংশোধনবাদীর নীতি গ্রহণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। অনুরূপ অবস্থায় সংশোধনবাদীদের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রেণী সহযোগিতার পথে চালিত করবার চেষ্টাকে প্রতিহত করে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে বিপ্লবী কায়দায় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করবার জরুরী তাগিদে এ. আই. টি ইউ. সিও দ্বিধা বিভক্ত হয়। আবার গড়ে উঠল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে নতুন কেন্দ্রীয় সংগঠন।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সংঘাত-বহুল এই ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়-গুলির আলোচ্য বিষয়।

প্রথম প্রতিষ্ঠা অধিবেশন

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ২২শে আগষ্ট, ১৯২০। কিন্তু ইতোমধ্যে ১লা আগষ্ট লোকমান্য

তিলকের মৃত্যু এবং সময়ের স্বল্পতার জন্য সম্মেলনের তারিখ পরিবর্তিত হয়ে ৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর ১৯২০ পুনর্নির্ধারিত হল।

সম্মেলনের প্রাথমিক নোটে দেওয়ান চমনলাল লিখেছেন,

বোম্বাই-এর এম্পায়ার থিয়েটারে অক্টোবর মাসে সম্মেলনের যে উদ্বোধন হল তার সাফল্য ছিল বিপুল এবং এই সাফল্য আমাদের সমস্ত কল্পনাকেই অতিক্রম করে গেল। এই অধিবেশনে ভারতের সমস্ত অংশ থেকে আটশত একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। বিহার এবং বাংলার কয়লাখনি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে স্বামী বিশ্বানন্দ এবং অপর একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। ষাটটি ইউনিয়ন নিশ্চিতভাবেই এখানে সমবেত হয়েছিল এবং বিয়াল্লিশটি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। যদিও বিভিন্ন কারণে তারা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সমর্থ হয়নি। সংশ্লিষ্ট তালিকা থেকে দেখা যাবে যে কার্যত ভারতের সমস্ত অংশের শ্রমিকরাই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা দুই লক্ষ শ্রমিকের পক্ষ হয়ে এসেছিলেন। এটা দেখা যাবে যে কয়লাখনি শ্রমিক এবং অন্যান্য সহানুভূতিশীল ইউনিয়নগুলি সহ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে তার সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কম হবে না।'[১]

এই প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন সম্পর্কে নিম্নরূপ কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ রয়েছে,

'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের অভিমুখে'

'বিপুল উদ্দীপনাময় দৃশ্যের মধ্যে ৩১শে অক্টোবর, ১৯২০, রবিবার, বোম্বাই-এর এম্পায়ার থিয়েটারে ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধন হল। প্রতিনিধি এবং দর্শকদের দ্বারা সভাকক্ষটি চূড়ান্তভাবে জনাকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কার্যত ভারতের শ্রমিকদের সমস্ত বিভাগের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা বিরাট সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই এর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিই অবশ্য সর্বাধিক ছিল। কিন্তু দেশের অন্যান্য প্রান্তের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাও যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণও বিরাট সংখ্যায় যোগদান করেন। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়াছিল। মঞ্চটিও অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য গণ্যমান্য নাগরিকদের দ্বারা সমর্ভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

১। A. I. T. U. C.—*Fifty Years, Documents,* Vol, I, p.

'কংগ্রেসের সভাপতি লালা লাজপত রায় উপস্থিত হলে তিনি প্রচণ্ড সম্বর্ধনা পেলেন। কর্ণেল জে. সি. ওয়েজউড এবং মিঃ জে. ব্যাপ্টিস্টাও প্রতিনিধি মণ্ডলীর দ্বারা স্বাগত হলেন। সভাপতি এবং অভ্যর্থনা কমিটির অধ্যক্ষ ব্যতিত অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন: কর্ণেল এবং মিসেস্ জে সি. ওয়েজউড, মিসেস এ্যানি বেসান্ত, মিঃ এবং মিসেস এম এ জিন্না, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, অনারেবল্ মিঃ লালুভাই সামলদাস, মিঃ ভি. জে. প্যাটেল, মিঃ যমুনাদাস, দ্বারকাদাস, মিঃ বি. পি. ওয়াদিয়া, মিঃ মিলার, মিঃ এস, এ. ব্রেলভি, মিঃ এল. আর. তাইরসী, মিঃ মাভজী গোবিন্দজী, মিঃ লালজী নারানজী, মিঃ বি. এফ. ভারুচা, মিস্ যোশী, মিসেস অবন্তিকাবাঈ গোখেল, মিঃ এবং মিসেস্ ডি. চমনলাল, মিঃ ভি এম পাওয়ার, মিঃ কে. এফ নরীম্যান, মিঃ হংস্‌রাজ পি. থ্যাকারসে, মিঃ লালুভাই ডি. জাভেরী, মিঃ ছগনলাল পি. নানাবতী, মিঃ এস. জি. বাংকার, মিঃ আহ্‌মদ হাজী সিদ্দিক খাত্রী এবং অন্যান্যরা।

'শ্রমিক-সংগীতের দ্বারা সম্মেলনের কাজ শুরু হল। তারপর অভ্যর্থনা কমিটির অধ্যক্ষ মিঃ জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি যখন ভাষণ দিতে উঠলেন প্রতিনিধিমণ্ডলী তখন তাঁকে অত্যন্ত উদ্দীপনাময় সম্বর্ধনা জানালো এবং তাঁর ভাষণ মুহূর্মুহু অভিনন্দিত হল।'[১]

ব্যাপ্টিস্টা তাঁর ভাষণে ভারতের শ্রমিকদের দাসত্বমূলক অবস্থা তুলে ধরলেন। মজুরী—দাসত্বমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিদের নিকট তারা তাদের শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য। একমাত্র শ্রম-শক্তি ছাড়া শ্রমিকদের আর কোন সম্পদই নেই। পুঁজিপতি শ্রমিকদের সেই সম্পদই শোষণ ক'রে আপন মুনাফাবৃদ্ধি করে। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজবিজ্ঞানের এই সত্যটি ব্যাপ্টিস্টা অনুধাবন করতে পারেননি। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন ধনিকের মুনাফার উৎস শ্রমিকের শ্রম-শক্তি শোষণ। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন,

'পুঁজিপতিরা ক্রীতদাস ক্রয় করা বন্ধ করেছে, কিন্তু তারা এখনও শ্রম ক্রয় করে এবং চাহিদা ও সরবরাহের চিরন্তন এবং নারকীয় নিয়ম অনুযায়ী এই শ্রমের মূল্য তারা দেয়। ক্রয় করার এই ধারণাই সমস্ত অনিষ্টের

১। Ibid. pp. 10.

মূল।'[১] কিন্তু এই শোষণের অবসান যে ঘটতে পারে একমাত্র পুঁজিবাদের অবসানের মধ্য দিয়ে তা তাঁর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না এর মূলোৎপাটন ঘটছে এবং অংশীদারত্বের উন্নত ধারণা এর স্থান গ্রহণ করছে ততক্ষণ শ্রমিকদের কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব নয়। তারা হচ্ছে অংশীদার ও সহযোগী, শ্রমের ক্রেতা ও বিক্রেতা নয়।'[২]

লালা লাজপত রায় আপন অধিকারেই সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা হিসাবে শুধু নয়, জাতীয় আন্দোলনে তাঁর সুদৃঢ় ভূমিকা এবং শ্রমিক এবং নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁর সহানুভূতিমূলক মনোভাব এবং তাঁর সর্বাঙ্গীন জনপ্রিয়তার গুণেই তিনি ভারতের এই প্রথম শ্রমিক সম্মেলনের সভাপতির সম্মানিত পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বি পি. ওয়াদিয়ার প্রস্তাবক্রমে এবং এন. এম. যোশী, দেওয়ান চমনলাল এবং একজন শ্রমিক প্রতিনিধির সমর্থন ক্রমে লালা লাজপত রায় বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

সভাপতি অভিভাষণে শুরুতেই তিনি যা বললেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি বললেন,

'এটি একটি অনন্য ঘটনা, আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশের ইতিহাসে এই প্রথম। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বিস্তৃত ইতিহাসে ভারত বহু মহান সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সম্মেলনসমূহে এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের এবং জনসংখ্যার সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন, ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, আইন এবং রাজনীতির বিভিন্ন প্রশ্ন সেখানে আলোচিত এবং মীমাংসিত হয়েছে এবং বিদেশাগত পণ্ডিতরা, বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং কূটনৈতিকরা তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোন অধিবেশনের নজীর নেই যা একান্তভাবেই আহ্বান করা হয়েছে শুধু এই শহরের নয়, এই প্রদেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রমিকদের স্বার্থ এবং কল্যাণ আলোচনার জন্য।

'এমনকি ব্রিটিশ শাসনেও আমরা রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন সর্বভারতীয় সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু দেশের শ্রমিকদের সর্বভারতীয় সম্মেলন অথবা যেখানে মানুষ সমবেত হয়েছে শুধুমাত্র শ্রমিকদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণ আলোচনার

১। Ibid. p. 12.
২। Ibid. p. 12.

জন্য—তেমন কোন সম্মেলন কদাপি আমরা দেখিনি। যদি অন্য কিছু থেকেও না বুঝতে পারি, তা হলেও একমাত্র এর থেকেই প্রতীয়মান হয় যে আজকের ভারত প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারত থেকে এবং এমনকি গতকালের ভারত থেকেও বহু পৃথক। আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যে যুগে পৃথিবীতে কেউ দেখেনি বা জানে না। ফলে আমাদের নিকট এবং বহুদূরের পিতৃপুরুষরা যেসব সমস্যা বা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন বাস্তব কারণেই আমরা তার থেকে পৃথক ধরনের সমস্যা এবং প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা পছন্দ করি বা না করি এই ঘটনার স্বীকৃতি দিতেই হবে।'[১]

অক্টোবর বিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় বিশ্বে যে নতুন যুগের সূচনা করেছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে তার যথাযথ তাৎপর্য লালাজীর চিন্তায় না থাকলেও, পৃথিবীর শ্রমিক জাগরণ এবং ভারতের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে যে অতীত যুগের বিদায় ঘটছে এবং একটা নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে তার তাৎপর্য লালাজী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সর্বনাশা ধনতন্ত্রের পাল্টা শক্তি যে সংগঠিত শ্রমিক এই উপলব্ধিও লাজপত রায়ের এসেছিল। তাঁর অভিভাষণে তিনি বলছেন, 'সামরিকতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের যমজ সন্তান; এরা তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এদের ছায়া, এদের ফল, এদের বল্কল—সবকিছুই বিষাক্ত। একমাত্র সম্প্রতি এর পালটা শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই পাল্টা শক্তি হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী।'[২]

'ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জোটবদ্ধতা যে বিশেষ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের সংহত হতে হবে এই উপলব্ধিও তাঁর ভাষণে পরিস্ফুট। বিশ্বের শ্রমিকদের সংহতিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, 'ইউরোপ এবং আমেরিকার শ্রমিকরা এখন বুঝতে পারছে যে সারা জগৎ জুড়ে শ্রমিকদের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন এবং যতক্ষণ না এশিয়ার শ্রমিকরা সংগঠিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে যুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ তাদের কোন মুক্তি আসতে পারে না। ইউরোপের শ্রমিকরা তাদের মালিকদের এবং প্রভুদের শোষণের অবসান ঘটাতে চাইছে, কিন্তু তারা স্বীকার করে যে তাদের আন্দোলনের

১। Ibid, pp, 23-24,

২। Ibid. p, 25,

সাফল্য ইউরোপীয় শ্রমিকদের সঙ্গে এশীয় শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধতার দাবী করে।'[১]

বর্তমানে ভারতের শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রতি প্রচণ্ড বিরোধিতা প্রকাশ করে বলে যে ধর্মঘট ইত্যাদি দেশ-দ্রোহীতামূলক কাজ, অতএব দেশপ্রেমিক শ্রমিকদের ধর্মঘট বা কোন আন্দোলনের পথে যাওয়া উচিত নয়। পুঁজিপতিদের ক্রমবর্দ্ধমান মুনাফা সঞ্চয়ের প্রতি তারা নীরব। বরং রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাকেই শাসকশ্রেণী সুচারুরূপে ব্যবহার করছে শ্রমিকদের শোষণকে তীব্রতর করে পুঁজিপতিদের মুনাফাকে স্ফীত করবার জন্য। এরই সঙ্গে এরা সংগ্রামী শ্রমিকদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু এই কংগ্রেসেরই প্রথমযুগের শীর্ষস্থানীয় নেতা তাঁর অভিভাষণে বললেন, 'যদি ভারতের পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের দাবিগুলিকে অগ্রাহ্য করে এবং কেবল বিপুল মুনাফা অর্জনের কথাই চিন্তা করে তাহলে শ্রমিকদের কাছ থেকে এরা কোন সাড়া পাবে না বা জনসাধারণের কাছ থেকেও কোন সহানুভূতি পাবে না। যদি শ্রমিকদের অর্ধনগ্ন থাকতে হয়, অত্যন্ত খারাপ ধরনের বাসস্থানে এবং শিক্ষাদীক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকতে হয়, তাহলে এদের পক্ষে ভারতের শিল্পায়নে কোনরকম আগ্রহ দেখানো সম্ভব নয়। এবং তাহলে দেশপ্রেমের নামে সমস্ত আবেদনই ব্যর্থ হতে বাধ্য।'[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মার্কসীয় দৃষ্টিতে রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের যথাযথ তাৎপর্য লালাজীর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তাঁর ভাষণ থেকে সুস্পষ্ট যে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা এবং রাজনৈতিক অধিকারের আবশ্যিক গুরুত্ব তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি বললেন, 'যদিও এটা সত্য যে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন তবু এটাও সমভাবে সত্য যে প্রতি দেশেই শ্রমিকদের শক্তি সেই দেশের স্থানীয় বা জাতীয় পরিস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইউরোপের শ্রমিকরা কর্তৃত্বের অবস্থায় এসেছে। ইউরোপের শ্রমিকরা দেখেছে যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সেই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপর

১। Ibid, p, 36,

২। Ibid, p, 30,

নির্ভর করা অলীক এবং অস্বাভাবিক যার সম্পত্তিবান লোকদের ভোটে সংসদীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজের এবং নিজের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের ভোটের অধিকার পেতে হবে এবং সে তার নিজের শ্রেণীভুক্ত কোন ব্যক্তিকে বা এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় প্রতিশ্রুত কোন ব্যক্তিকেই সেই ভোট প্রদান করবে। তাই ইউরোপের প্রতিটি শ্রমিকই একটি রাজনৈতিক শক্তি। সর্বোপরি ইউরোপের শ্রমিকরা আরেকটি অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সকলের শীর্ষে অধিষ্ঠিত রয়েছে রুশ শ্রমিক যার লক্ষ্য সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।'[১]

লালাজী শ্রমিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার এবং বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার সমস্ত প্রচেষ্টাই সরকার সামরিক শক্তির দ্বারা চূর্ণ করবার চেষ্টা করবে। 'সোভিয়েত রাশিয়া' এবং লণ্ডনের 'ডেইলী হেরাল্ড' পত্রিকার ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে ব্রিটিশ সরকার যে আদেশ জারী করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নবজাত রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার যে কুৎসা প্রচারাভিযানে অবতীর্ণ হয় তার কারণ ও চরিত্র উপলব্ধি করতেও লালাজীর কোন অসুবিধা হয়নি। 'সত্যের' চরিত্র যে দ্বিবিধ তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—পুঁজিপতিদের দৃষ্টির মাপকাঠিতে 'সত্য' এবং শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির মাপকাঠিতে 'সত্য'। তিনি বলছেন, 'সম্প্রতি তাদের দ্বারা "সোভিয়েত রাশিয়া" এবং লণ্ডনের "ডেইলী হেরাল্ড"-এর ভারতে আমদানী নিষিদ্ধকরণ এই বিষয়ে একটা উদাহরণ (ছি-ছি-ধ্বনি)। যখন একদিকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে দিন-রাত সুস্পষ্ট মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে তখন ভারত সরকার ভারতের জনগণকে সত্য ঘটনা জানাতে বাধা দিচ্ছে। ইউরোপে সত্য দুই রকম: (ক) ধনতান্ত্রিক এবং সরকারী সত্য যার প্রতিনিধিত্ব করে মিঃ উইনস্টন চার্চিলের মতো ব্যক্তিরা এবং লণ্ডন টাইমস ও মর্নিংস্টারের মতো পত্রিকাগুলি এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক এবং শ্রমিকশ্রেণীর সত্য যার প্রতিনিধিত্ব করে 'জাস্টিস,' 'ডেইলী হেরাল্ড' এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মতো শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্রগুলি।'[২]

'বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক এবং শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তার সঙ্গে ভারতের জনগণের যোগাযোগকে নিষিদ্ধ করবার জন্য ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ-এর সমস্ত

১। Ibid. p. 32.
২। Ibid. p. 33.

নিপীড়নমূলক কার্যাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্যায় এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে এই কাজকে নিন্দা করতে হবে (হর্ষধ্বনি) ।'[১]

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের সঙ্গে ভারতের শ্রমিকদের পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করার পর তিনি বলেন যে রাশিয়ার শ্রমিক-আদর্শ ভারতে হঠাৎ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন সংগঠন এবং শ্রেণী-সচেতনতা। দেখা যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনার ধারণাটিও লালাজীর অনুভূতিতে এসেছিল। তিনি বলছেন, 'ভারতে এমন একজন কেউ নেই যে বিশ্বাস করে যে ইউরোপীয় এবং রুশ শ্রমিকদের মানদণ্ড আজকের ভারতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি সেইরকম কেউ থেকে থাকে তবে আমি তাকে লেনিন বেলাকুঁকে যে বাণী প্রেরণ করেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দেব। ঐ বাণীতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্তকে হাঙ্গেরীতে অপরিপক্ক অবস্থায় রুশ মানদণ্ড প্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আমাদের অবশ্যই শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে, তাদের শ্রেণী-সচেতন করতে হবে এবং জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করতে হবে।'[২]

শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কে, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে এতখানি সচেতনতা এবং এমনকি রাশিয়ার সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা সত্বেও লালা লাজপত রায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান দিতে পারেননি, এমনকি তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতার দাবিও অনুপস্থিত। উপসংহারে তিনি যা বললেন সেই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যের আমূল স্ববিরোধিতা। সরকার সম্পর্কে মনোভাব বিশ্লেষণ করতে যেয়ে তিনি বলছেন, 'এই মিনিটের মধ্যে আমি সরকারের প্রতি আমাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে চাই। এটা সমর্থনও নয় আবার বিরোধিতাও নয়।'[৩]

এই প্রচণ্ড স্ববিরোধিতা লালাজীর একক নয়, এই স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতা জাতীয় কংগ্রেসের। 'স্বরাজ' সম্পর্কেই জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দোদুল্যমানতা ছিল। লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধী-মতিলাল

১। Ibid. p, 34.
২। Ibid. p, 34.
৩। Ibid. p, 35.

নেহেরুর 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু 'স্বরাজের' দাবি সম্পর্কে কংগ্রেস তখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অতি সীমাবদ্ধ ধারণা ও আকাঙ্খা তখনও পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বরাজ সম্পর্কে স্পষ্ট দাবি দূরে থাক, কলকাতা কংগ্রেসের পূর্বে অনুষ্ঠিত ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে প্রদত্ত গঠনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কেও কংগ্রেসের কোন ঐক্যমত ছিল না। তিলক এবং তাঁর সহযোগীরা এই সংস্কার গ্রহণের বিরোধিতা করলেও ব্রিটিশরাজের গুণে আচ্ছন্ন এবং অ্যানি বেসান্তের সমর্থনপুষ্ট গান্ধীজী ঐ সংস্কারকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত একটা মধবর্তী ফর্মূলা মেনে নিয়ে কংগ্রেস একটা দ্বিধাজড়িত স্থান গ্রহণ করল।

এই সামগ্রিক হতবুদ্ধির অবস্থা এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রচণ্ড দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ এ আই. টি. ইউ সির অধিবেশনে লালা লাজপত রায়ের সুপ্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন এবং অতীব সচেতন ভাষণের অত্যন্ত শোচনীয় উপসংহার। শুধু সভাপতি হিসাবে লালা লাজপত রায়ের ভাষণেই নয়, অন্য নেতাদের ভাষণেও স্বরাজের দাবির কোন উল্লেখ ছিল না এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম সম্মেলনে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বরাজের কোন প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার পক্ষ থেকে যে তারবার্তা এবং পত্রাদি এসেছিল সভাপতির ভাষণ সমাপ্তির পর দেওয়ান চমনলাল সেই বার্তাগুলি পাঠ করেন। লণ্ডনের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জর্জ ল্যান্সবেরী কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটিশ লেবার পার্টির পক্ষ থেকে কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন কর্ণেল ওয়েজউড। অন্যান্য যেসব সংস্থার কাছ থেকে বাণী এসেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস ফেডারেশন, তিন লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা আইরিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, আইরিশ উইমেন ওয়ার্কাস ইউনিয়ন। এ ছাড়াও গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের অন্যান্য শ্রমিক সংস্থাগুলিও সম্মেলনে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেছিল। চমনলাল জানিয়েছিলেন যে লণ্ডনে মিঃ সাকলাতওয়ালার প্রচেষ্টাতেই ওয়ার্কাস ওয়েলফেয়ার লীগ ফর ইণ্ডিয়ার মারফৎ এই বাণীগুলি এনেছিল।

সম্মেলন উপস্থিত ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা কর্ণেল ওয়েজউডকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায় এবং তিনিও প্রত্যুত্তরে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

অভিনন্দন বার্তাগুলি শ্রবণ করবার পর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং আইরিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে শ্রমিকদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল: ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা সুপারিশ করে কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দৈনিক ১০ ঘণ্টার কাজ সুপারিশ করা হয়। এই বিষয়টি সম্মেলনে নির্বাচিত স্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে বিবেচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সম্মেলন লক্ষ্য করে যে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স বিভিন্ন দেশের বেকারদের বেকার-ভাতার সুপারিশ করলেও ভারতের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে নাবালকদের কারখানায় নিযুক্ত হবার নিম্নতম বয়স নির্দ্ধারিত হয় ১৪ বৎসর অথচ ভারতের ক্ষেত্রে তা হয় ১২ বৎসর।[১]

পশ্চিমী দেশের শ্রমিকদের তুলনায় ভারতের শ্রমিকদের প্রতি এই বৈষম্য-মূলক আচরণ সম্মেলন ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করে এবং স্থির হয় যে এই সমগ্র বিষয়গুলি স্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে।

কংগ্রেস নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির উপর একটা বিস্তৃত স্মারকলিপি প্রস্তুত করবার জন্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে।

(১) ধর্মঘটজনিত কারণে শ্রমিকদের চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদি, (২) শ্রমিকদের গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থাগুলি হরণের অপচেষ্টা, (৩) ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ এবং পাঠান গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া, (৪) মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের উপর দৈহিক নির্যাতন, (৫) কয়লাখনির শ্রমিকদের অবস্থা, (৬) শ্রমিকদের মজুরী কেটে নেওয়া।

বিদেশে ভারতীয় শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও প্রস্তাব গৃহীত

১। Ibid. p. 50.

হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'এই কংগ্রেস ফিজিতে, ভারতীয় নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের উপর যে বর্বর নির্যাতন চালানো হচ্ছে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং প্রস্তাব করছে যে এই ব্যাপারে একটা পূর্ণ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক এবং মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ দেওয়া হোক।'[১]

কয়লাখনি শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রস্তাবে বলা হয়, 'এই কংগ্রেস ভারতের কয়লাখনিগুলিতে শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং সরকারও কয়লাখনি মালিকদের কাছে দাবি জানাচ্ছে অবিলম্বে এই ভয়াবহ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'[২]

শ্রমিকদের ভোটাধিকার সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎকালীন ভারতে শ্রমিকদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। এই বিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়, 'এই কংগ্রেস মনে করে যে এমনভাবে আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন যাতে চেম্বার্স অফ কমার্স এবং মিল ওনার্স এবং প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশনের অনুরূপ শ্রমিকদেরও দেশের লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে একজন বিশেষ প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয়।'[৩]

সম্মেলন নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধারও দাবী করে। শ্রমিকদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও সম্মেলনে আলোচনা হয়।

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এল. আর তায়িরসী।

'লীগ অফ নেশনসের কনভেনশন অনুসারে পরবর্তী বৎসরে জেনেভায় যে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য এই কংগ্রেস নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মনোনীত করছে: (১) প্রতিনিধি (রিপ্রেজেণ্টেটিভস ডেলিগেট)—লালা লাজপত রায়, সভাপতি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (২) উপদেষ্টা, মিঃ বি. পি. ওয়াদিয়া এবং মিঃ ডি. চমনলাল এবং কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আরো দুইজন উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য সভাপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হল। এ ছাড়া লীগের সনদ অনুযায়ী গঠিত কমিশন অফ এনকোয়ারীর প্যানেলের সদস্য হিসাবে এই কংগ্রেস এন. এম যোশীকে

১। Ibid. p. 55.
২। Ibid. p. 56.
৩। Ibid. p. 57.

মনোনীত করছে।'[১] জে এন হালদার জলিল খান এবং সুভানী কর্তৃক সমর্থনের পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

মিঃ বি জি. হর্নিম্যানের উপর বোম্বাই প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয় এবং হর্নিম্যানকে বোম্বাই তথা ভারতের শ্রমিকদের বন্ধু হিসাবে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

এ ছাড়া লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ এবং শাপুরজী সাকলাতওয়ালা সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে বলা হয় 'ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ এবং মিঃ শাপুরজী সাকলাতওয়ালা যে ভূমিকা পালন করেছেন তার প্রতি এই কংগ্রেস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং ইংলণ্ডে ভারতের শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য লীগের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপন করতে স্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে ক্ষমতা অর্পণ করছে।'[২]

লণ্ডনের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়, 'লণ্ডনের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার যে আদেশ জারী করেছেন তার বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।'[৩]

সম্মেলনের শেষে ব্যাপ্টিস্টার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বোম্বাই-এর গভর্নরের হাতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সম্মেলনে কর্মকর্তা নির্বাচন

সম্মেলন থেকে পরবর্তী বৎসরের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটা স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়। লালা লাজপত রায় এবং জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যথাক্রমে প্রথম সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন। স্ট্যাণ্ডিং কমিটি বা এই এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রথম বৈঠক হয় ২রা নভেম্বর, ১৯২০ এবং দ্বিতীয় বৈঠক হয় ৫ই এপ্রিল, ১৯২১। এই

১। Ibid p. 54.
২। Ibid p, 63,
৩। Ibid, p, 63,

বৈঠকগুলিতে জেনারেল সেক্রেটারী এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারীর বেতন নির্ধারিত হয় মাসিক ৫০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বৈঠকটিতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দেওয়ান চমনলালের নিয়োগকে পাকা করা হয়।

সম্মেলন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে প্রথম স্ট্যাণ্ডিং কমিটি নির্বাচিত হয় তার সদস্যদের তালিকাটি দীর্ঘ। কিন্তু ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগের উৎসাহী ও দরদী ব্যক্তিদের নামের যথেষ্ট ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে, তাই তালিকাটি দেওয়া হল।

তালিকা নং ১৯

স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যদের নাম[১]

১। লালা লাজপত রায়	২১। লালা চুনিচাঁদ
২। জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা	২২। জে. বি. মিলার
৩। দেওয়ান চমনলাল	২৩। লালা ঈশ্বরদাস সাহনী
৪। এম. ভি ডালভি	২৪। এম এ খাঁন
৫। এল. আর. তায়িরসী	২৫। জি. আর. সাহনী
৬। ভি ভি সাথে	২৬। কুমারস্বামী চেট্টী
৭। এন. ভি. সওয়ারকার	২৬। বনম অনন্ত প্যাটেল
৮। এম. বি. ভেলকার	২৮। ডি. সি. পণ্ডিত
৯। শেঠ মাভজী গোবিন্দজী	২৯। ভি চক্করাই চেট্টী
১০। এফ জে গিনওয়ালা	৩০। মিস্ত্রী করম ইলাহী
১১। এল. জি. থারে	৩১। সুব্রাহ্মম নায়েকার
১২। এস. এ. ব্রেলভি	৩২। রাজারাম গোপাল
১৩। এন এম. যোশী	৩৩। গোবিন্দ তুকারাম
১৪। কাঞ্জী দোয়ারকাদাস	৩৪। শিব নন্দন
১৫। ই. এল. আয়ার	৩৫। জি. কে. গ্যাডগীল
১৬। এস. এন. হালদার	৩৬। ভেকটরাম রেলে
১৭। দীপ নারায়ণ সিং	৩৭। এ. ভি. পারাঞ্জপে
১৮। ভি. এম. পাওয়ার	৩৮। শংকর নাচরেকর
১৯। বি. পি. ওয়াদিয়া	৩৯। জে. টি. গোখেল
২০। অনন্তম বৈকুনথ্রম	৪০। সি. এম. পেরেরা

১। Ibid. p 80-81.

৪১। এ. জে. রাওয়াল
৪২। সীতারাম শিবাজী
৪৩। এস. সত্যমূর্তি
৪৪। কৃষ্ণরাম কেশবরাম ভট্ট
৪৫। সি ভি সওয়ান্ত
৪৬। ত্রিমবাক সীতারাম সওয়ান্ত
৪৭। তেজ সিং ভর
৪৮। বাপু রামচন্দ্র
৪৯। এম. আর আরজু
৫০। আর এস. হাবুলেকর
৫১। বি. কে. কানে
৫২। অমৃতলাল শর্মা
৫৩। এন এল মাটকর
৫৪। আবদুল্লা রহমান কাজী
৫৫। তুকারাম সান্তাজী
৫৬। জে বি. নায়েক
৫৭। মিসেস দীপনারায়ণ সিং
৫৮। কে. শান্তনম
৫৯। লালা জগন্নাথ
৬০। শংকর লাডোবা
৬১। পাণ্ডুরাং সবাজী মাসরুকর
৬২। এ. বি. কোলহাতকর
৬৩। বিনায়ক শিরোদকর
৬৪। স্বামী বিশ্বানন্দ
৬৫। আর. কে. মিশ্র
৬৬। জে. এইচ. খান্না
৬৭। জি. এস. কান্তী
৬৮। মাধব রাও
৬৯। পি. এল নালতেকচাঁদ *
৭০। মিসেস অবন্তিকাবাঈ গোখেল
৭১। মিস চট্টোপাধ্যায়
৭২। মিস রুইবেন
৭৩। এম. বি মনিয়ার
৭৪। জলিল খান
৭৫। গুলাবচাঁদ দেওচাঁদ
৭৬। জি. এ. প্রধান
৭৭। নাদকার্ণি
*৭৮। টেণ্ডুলকর
*৭৯। ভুকনদাস
*৮০। মুরারীলাল
*৮১। অলকনসো
*৮২। দালভী

এঁদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যান্যরা নবজাত সংগঠনটির প্রতি একটা মোটামুটি এবং ভাসা ভাসা আকর্ষণবোধে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই আকর্ষণ আর থাকেনি।

---

* এই সদস্যদের নামগুলি ৩০ শে জুলাই, ১৯২১ তারিখে অনুষ্ঠিত স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভায় সংযোজিত হয়।

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে প্রথম 'ম্যানিফেস্টো'

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে যে প্রথম 'ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হয় তাতে শ্রেণী বিশ্লেষণ বা শ্রেণী সংগ্রামের বক্তব্য ছিল না। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আবেদনটি ছিল সুস্পষ্ট। প্রথম 'ম্যানিফেস্টো' হিসাবে এই দলিলটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে তাই এটি এখানে সংযোজিত হল।[১]

'ভারতের শ্রমিকদের প্রতি ইশতেহার

ভারতের শ্রমিকগণ!

দেশের ভাগ্য নির্ধারক হিসাবে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় এখন এসেছে। জাতীয় জীবনের ধারা থেকে আপনারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। যে ঘটনাগুলি আজ ভারতের ইতিহাস তৈরী করতে চলেছে তার থেকে আপনারা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। আপনারাই হচ্ছেন দেশের সাধারণ জনগণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কোন আলোড়ন, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে যেকোন পদক্ষেপ অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় আপনাদের উপর বেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আপনাদের সচেতন হতে হবে। আপনাদের অধিকার আপনাদের অনুভব করতে হবে। নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্য আপনাদের নিজেদের তৈরী হতে হবে।

'ভারতের শ্রমিকগণ! আপনাদের ভাগ্য খুব কঠিন। কি করে আপনারা এর উন্নতি ঘটাবেন? আসামের চা বাগিচার ক্রীতদাসদের প্রতি তাকিয়ে দেখুন। তারা এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। সরকারী আইনে নির্ধারিত দৈনিক তিন আনা মজুরির চেয়েও তাদের প্রকৃত দৈনিক মজুরি কম। তারা প্রায়শই বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়। অনির্দিষ্টকালীন কাজের সময়ের দুঃসহ জ্বালা তাদের ভোগ করতে হয়। অথচ এই চা বাগিচার অনেকগুলিতেই ২০ থেকে ৪০ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়া হয়। এই লভ্যাংশ দেওয়া হয় মৃত্যু আর অনাহারের বিনিময়ে। আপনারা এবং আপনাদের স্ত্রী পুত্ররা হচ্ছে এর নিরপরাধ শিকার। আমরা আপনাদের আহ্বান জানাই, এই শোষণের তাৎপর্য উপলব্ধি করুন এবং প্রতিটি ইউনিয়নের সদস্যদের কাছ থেকে বিশেষ চাঁদা সংগ্রহ করে চাঁদপুরে এই অর্দ্ধ-ক্রীতদাসদের সংগ্রাম পরিচালনাকারী মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজের নিকট প্রেরণ করুন।

'ভারতের শ্রমিকগণ! এই পৃথিবীতে আপনাদের সকলের উত্তরাধিকার।

১। Ibid. pp. 78-79.

এটা পেশাদার রাজনীতিবিদ, সিমলার আমলাশাহী বা কলকারখানার মালিক লক্ষপতিদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত নয়। যখন আপনাদের দেশের নেতারা স্বরাজ দাবি করেন তখন কিছুতেই আপনাদের হিসেবের বাইরে রেখে তাদের কিছু করতে দেবেন না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাদ দিয়ে আপনাদের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থ নেই। তাই জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে আপনারা উপেক্ষা করতে পারেন না। আপনারা এই আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একমাত্র আপনাদের মুক্তির বিনিময়েই আপনারা একে উপেক্ষা করতে পারেন।

'ভারতের শ্রমিকগণ! আপনাদের ইউনিয়নের সদস্যপদ জাতীয় কংগ্রেসে আপনাদের যোগদানের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। স্বাধীনতার লক্ষ্যকে উর্দ্ধে তুলে ধরবার জন্য আমাদের কমরেডদের মতো আপনাদেরও কষ্ট ভোগ করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্যে আনুগত্য নষ্ট করবার অভিযোগে অসহযোগ-আন্দোলনকারী হিসাবে ধরে নিয়ে ভিনসেণ্ট স্মিথের মতো মালিকরা আপনাদের নেতাদের সন্ত্রস্ত করবার জন্য বে-এক্তিয়ারভাবে অনেক কিছু করবে। আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পাশবিক নির্যাতন, অর্দ্ধ-দাসত্বের অবস্থা এবং নারী ও শিশুদের শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করা কোন অপরাধ নয়। আপনারা ভালভাবেই জানেন যে এই নেতাদের প্রভাবের ফলেই মালিকদের বিরুদ্ধ কার্যকলাপ সত্ত্বেও বিগত ১২ মাসে ভারতে যে বড় বড় ধর্মঘটগুলি হয়েছে তাতে শান্তি বজায় রাখা হয়েছে এবং মীমাংসায় পৌছানো গেছে। আপনাদের স্বার্থ মানবতার স্বার্থ। বিকৃত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এই স্বার্থকে বিপন্ন করা যায় না।

ভারতের শ্রমিকগণ! আপনাদের কেবল একটা কাজই সম্পন্ন করতে হবে। আপনাদের ঐক্য অর্জন করতে হবে। আপনাদের সংগঠনগুলিকে মজবুত করতে হবে। ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের মধ্যে মুক্তি খুঁজবেন না। আইন আপনাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে পারে না। এ কাজটা আপনাদের নিজেদেরই করতে হবে। কলে কারখানায় শ্রমিকদের শোষণ করাই পুঁজিবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ আপনাদের লক্ষ্য হোক। আপনাদের সংগঠনের শক্তির উপরই আপনাদের মুক্তি নির্ভর করে। সেই সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকুন। আপনাদের সমস্ত দুর্বলতা দূর করে ফেলুন, এবং আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হবেন।

ডি. চমনলাল
সাধারণ সম্পাদক
অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

এ. আই. টি. ইউ. সির অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নসমূহ

তালিকা নং ২০

অন্তর্ভুক্ত এবং সহানুভুতিসম্পন্ন ইউনিয়ন সমূহের তালিকা[১]

ক্রমিক সংখ্যা	ইউনিয়নের পুরো নাম	ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা
১	বোম্বাই অয়েল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন	১,৭৬১
২	চাপরাসী ইউনিয়ন, বোম্বাই	২৭
৩	বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট রেলওয়ে স্টাফ ইউনিয়ন	৭৬০
৪	জি. আই. পি. রেলওয়ে ওয়ার্কশপমেনস ইউনিয়ন	৩,৭০০
৫	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন, অমরাবতি	৯৬
৬	এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, কলকাতা	২,৫০৫
৭	লেবার এসোসিয়েশন, জামশেদপুর	৪,০০০
৮	বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন	৩৭০
৯	হ্যাণ্ডলুম উইভার্স ইউনিয়ন, বোম্বাই	২৪৯
১০	বোম্বাই প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন	১,৬৯৮
১১	ইণ্ডিয়ান রেলওয়েমেনস ইউনিয়ন, ভূপাল	১,৬০০
১২	জি আই. পি. রেলওয়েমেনস ইউনিয়ন, কল্যাণ	১,২০০
১৩	ডক ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, বোম্বাই	১,৮০০
১৪	ইণ্ডিয়ান সীমেনস ইউনিয়ন, বোম্বাই	১২,০৫৬
১৫	বোম্বাই ইউনাইটেড টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন	২০৪
১৬	বোম্বাই টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ফেডারেশন	৮২
১৭	প্যারেল লেবার ইউনিয়ন, বোম্বাই	১,৫০০
১৮	বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট ওয়ার্কশপ ইউনিয়ন	৭০৩
১৯	বোম্বাই পোষ্টাল প্যাকার্স ইউনিয়ন	৩৫০
২০	বোম্বাই প্রেসিডেন্সী পোস্টমেনস ইউনিয়ন	৮৫০
২১	বোম্বাই টেলিগ্রাফ মেনস ইউনিয়ন	৩০০
২২	লেবার ইউনিয়ন, অকোলা	৩২
২৩	ভালোড লেবার ইউনিয়ন, কয়রা	২৭৯

১। Ibid pp. 82-84

২৪	মিলহ্যানডস ইউনিয়ন, শোলাপুর	৩২
২৫	মেকানিক্যাল এণ্ড পাম্পিং ওয়ার্কশপ ইউনিয়ন, মাদ্রাজ	৮১
২৬	হোটেল সার্ভেন্টস ইউনিয়ন, বোম্বাই	৬৮
২৭	মিস্ত্রী এণ্ড খানসামা এলায়েড ইউনিয়ন	৩২
২৮	ক্লার্কস ইউনিয়ন, বোম্বাই	৪৪৬
২৯	মাদ্রাজ ট্রামওমেনস ইউনিয়ন	১৭০
৩০	বোম্বাই ট্রামওমেনস ইউনিয়ন	২,৩০০
৩১	প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, করাচী	১২৮
৩২	ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, কিরকী	৪২০
৩৩	ন্যাশনাল ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, বোম্বাই	৪০
৩৪	গিরনি কামগর সংঘ	১,২০০
৩৫	ইণ্ডিয়ান লেবার লীগ	৬০০
৩৬	ফ্যাক্টরী ক্লার্কস ইউনিয়ন	৬২
৩৭	মান্দভী সার্ভেন্টস এসোসিয়েশন, বোম্বাই	২০০
৩৮	বি বি. এণ্ড সি আই রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন	২,০০০
৩৯	জার্নালিস্টস ইউনিয়ন, বোম্বাই	১৮
৪০	আর. আই. এন. ডক ক্লার্কস ইউনিয়ন	৭২
৪১	মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন	৮০০
৪২	গ্যাস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন	৭০২
৪৩	নর্থ-ওয়েষ্টার্ন রেলওয়েমেনস এসোসিয়েশন, লাহোর	৭০,০০০
৪৪	ক্লার্কস ইউনিয়ন, রাওয়ালপিণ্ডি	৬০
৪৫	অডিট ক্লার্ক ইউনিয়ন, নর্থ-ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ে, লাহোর	৭১
৪৬	তালাথি সংঘ, আমেদনগর	২৪৮
৪৭	কানপুর মজুর সংঘ	২,৮০০
৪৮	পাঞ্জাব ক্লার্কস ইউনিয়ন, লাহোর	১২২
৪৯	পোস্টাল এসোসিয়েশন, আমেদাবাদ	১১৩
৫০	বোম্বাই প্রেসিডেন্সী পোস্টাল এসোসিয়েশন	৭২
৫১	এস. আই রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, মাদ্রাজ	৯৩
৫২	বোম্বাই মিলহ্যাণ্ডস ইউনিয়ন	৫২
৫৩	মাদ্রাজ কুলি ইউনিয়ন	১৮৯
৫৪	বি. ও. সি. এমপ্লয়িজ, বোম্বাই	৮০২

৫৫	এম এস এম রেলওয়েমেনস ইউনিয়ন, মাদ্রাজ	৮১২
৫৬	খাদ্য বাসার সার্ভেন্টস ইউনিয়ন	৫৬
৫৭	জি. আই. পি রেলওয়ে অডিট ক্লার্কস ইউনিয়ন	৮৫
৫৮	ডেকান পোষ্টাল এসোসিয়েশন, সাতারা	—
৫৯	ক্লার্কস ইউনিয়ন, পুনা	—
৬০	তালাথিস এসোসিয়েশন, রত্নগিরি	—
৬১	কামগর হিতবর্দ্ধক সভা	—
৬২	বোম্বাই ক্লথ মার্চেণ্টস সার্ভেণ্টস ইউনিয়ন	—
৬৩	দি মিৎসুই এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, মিরাজ	—
৬৪	আর এম. এস. এণ্ড পোষ্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, আমেদাবাদ	—
৬৫	বোম্বাই সোফার্স মিউচুয়াল বেনিফিট ইউনিয়ন	—
৬৬	সিলোন ওয়ার্কাস ফেডারেশন, কলম্বো	—
৬৭	রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, রাণাঘাট	—
৬৮	প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, দিল্লী	—
৬৯	মাদ্রাজ পুলিশমেনস ইউনিয়ন	—
৭০	ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, করাচী	—
৭১	এম. এস. এম. রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, আরকোনাম	—
৭২	মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল লেবার বোর্ড, মাদ্রাজ	—
৭৩	বি এন. রেলওয়ে মেনস এসোসিয়েশন, খড়্গপুর	—
৭৪	ডিষ্ট্রিক্ট ক্লার্কস ইউনিয়ন, অমরাবতী	—
৭৫	রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, জামসেদপুর	—
৭৬	রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, জামালপুর	—
৭৭	রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, এলাহাবাদ	—
৭৮	রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, লক্ষ্ণৌ	—
৭৯	আর. এম. এস. এসোসিয়েশন, মাদ্রাজ	—
৮০	ইউ. পি পোস্টাল এণ্ড আর. এম. এস. ইউনিয়ন, লক্ষ্ণৌ	—
৮১	পাঞ্জাব পোষ্টমেনস ইউনিয়ন, লাহোর	—
৮২	পোস্টাল ক্লার্কস ইউনিয়ন, লাহোর	—
৮৩	পোস্টাল এণ্ড আর. এম. এস. ইউনিয়ন, কানপুর	—
৮৪	মিলিটারী একাউণ্টস এসোসিয়েশন, পুনা	—
৮৫	দি পিওনস এসোসিয়েশন, পুনা	—

৮৬	রাজনন্দনগর মিলহ্যাণ্ডস ইউনিয়ন, রাজনন্দনগর	—
৮৭	পোদানুর রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কানপুর	—
৮৮	কয়েম্বাটুর লেবার ইউনিয়ন, কয়েম্বাটুর	—
৮৯	মজুর সংঘ, গামালপুর (সি পি)	—
৯০	মাদ্রাজ রিক্সাওয়ালাজ ইউনিয়ন, মাদ্রাজ	—
৯১	বি. বি. এণ্ড সি. আই. ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, এলাহাবাদ	—
৯২	ক্যালকাটা পোষ্টাল ক্লাব, কলকাতা	—
৯৩	প্রভিন্সিয়াল পোষ্টাল এণ্ড আর. এম. এস. এসোসিয়েশন, লাহোর	—
৯৪	লোকরাজ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, জব্বলপুর	—
৯৫	মাদ্রাজ পোষ্টম্যানস ইউনিয়ন, মাদ্রাজ	—
৯৬	ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সীমেনস ইউনিয়ন, কলকাতা	—
৯৭	প্রেসমেনস ইউনিয়ন, কলকাতা	—
৯৮	গভর্নমেণ্ট প্রেস ওয়ার্কাস পীস এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট ইউনিয়ন, দিল্লী	—
৯৯	প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, লক্ষ্ণৌ	—
১০০	রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, ইগাতপুরী	—
১০১	রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, ঝাঁসী	—

অতিরিক্ত তালিকা **তালিকা নং ২১**

১	বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট স্টাফ ইউনিয়ন, (ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট)	৮০০
২	ওয়ালেস ফ্লোর মিল ইউনিয়ন	১৫০
৩	সিম্পলেকস মিল ইউনিয়ন	১,১০০
৪	আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ইউনিয়ন	১০,০০০
৫	গ্লোব মিল ইউনিয়ন	৩,০০০
৬	ইণ্ডিয়ান সীমেনস ইউনিয়ন, বোম্বাই (অতিরিক্ত)	৫,৯৪৪
		২০,৯৯৪

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাবে যে সারা ভারতের বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলি এ. আই. টি. ইউ. সি.র অন্তর্ভুক্ত ছিল অথবা এর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। এমনকি সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলিও এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল অথবা সহযোগী শক্তি ছিল। তেমনি লক্ষ্যণীয় যে শ্রমিকদের অনেক ইউনিয়নই তখনও পর্যন্ত এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য এই বাকী ইউনিয়নগুলিরও অনেকই এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৯২১

বোম্বাই থেকে ঝরিয়া

অবশেষে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'শান্তিপূর্ণ এবং আইনানুগ উপায়ে স্বরাজ' অর্জনের লক্ষ্য ঘোষিত হলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী থেকে জাতীয় কংগ্রেস আরো কিছুটা অগ্রসর হল। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২১-এর মধ্যে স্বরাজ অর্জনের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। গণ-আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর চেষ্টার কোন কসুর ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিক এবং সাধারণ জনগণের অগ্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘটগুলি এবং জনগণের রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলি জঙ্গীরূপে আত্মপ্রকাশ করল এবং কোন কোন সময় সেই সংগ্রামগুলি অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করল। কৃষকদের সংগ্রামগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে ফেটে পড়তে শুরু করল। গান্ধীজী এই বিপ্লবাত্মক সংগ্রামগুলিকে অনুমোদন করলেন না—তিনি প্রকাশ্যেই এর বিরুদ্ধতা করলেন। বোম্বাই-এর শ্রমিক ও জনগণের ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান, চৌরিচোরার কৃষকদের তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী জঙ্গীরূপ—সবই তাঁর কাছে নিন্দনীয়। তিনি ঘোষণা করলেন, এই রক্তাক্ত অভ্যুত্থানগুলির মধ্য দিয়ে 'স্বরাজের' যে চেহারা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই স্বরাজ তাঁর আকাঙ্খিত নয়।

কিন্তু তাঁর এই আক্ষেপ সত্ত্বেও ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হচ্ছিল। কৃষকদের অভ্যুত্থান, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘট এবং ১৭ই নভেম্বর, ১৯২১ সারা ভারতে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে উচ্চগ্রামে উন্নীত করল।

এই অনুকূল অবস্থায় শ্রমিকরা তাঁদের নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে আরো

ব্যাপকতরভাবে অগ্রসর হল। একমাত্র ১৯২১ সালেই ৩৭৬টি ধর্মঘটে ও লকআউটে ছয় লক্ষাধিক শ্রমিক সংশ্লিষ্ট হলেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হল। শ্রমিকশ্রেণীর নবজাত রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিন ও বলশেভিক পার্টির যোগ্য নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও প্রতি-বিপ্লবকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিপ্লবের সাফল্যকে সংহত করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করল এবং তার প্রভাব বিস্তৃত হল সারা বিশ্বে।

ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর যুদ্ধোত্তরকালীন উত্তাল অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখল। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং প্রায় অন্যান্য প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই শ্রমিকশ্রেণী ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হল। যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তরকালীন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় এই সময় শ্রমিক আন্দোলন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ল। একটা অংশের নেতৃত্বে রইল ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস এবং আমস্টারডাম হল এর কেন্দ্রীয় দপ্তর। আরেকটি অংশের নেতৃত্বে রইল ইন্টারন্যাশনাল অফ ট্রেড ইউনিয়ন এবং এর কেন্দ্র হল মস্কো।

এই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিফলিত হয়েছিল। রুশদেশে একদিকে যেমন বিপ্লবকে সংহত করা হচ্ছিল অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, গৃহযুদ্ধ এবং উৎখাত জমিদার ও কুলাকদের ষড়যন্ত্রে দেশে দুর্ভিক্ষও দেখা দিল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন এই বিষয়ে তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছিল।

জাতীয় পরিস্থিতির প্রভাবও সুস্পষ্ট হল দ্বিতীয় অধিবেশনে। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দ্বিধা ও সংশয়ের জন্য প্রথম অধিবেশনে যা সম্ভব হয়নি দ্বিতীয় অধিবেশনে তা সম্ভব হয়েছিল—অধিবেশন 'স্বরাজ অর্জনের' প্রস্তাব গ্রহণ করল।

ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই সময় ভারতে শতাধিক বৃহৎ বৃহৎ ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যখন দ্বিতীয় অধিবেশন ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে চলছে ঠিক সেই সময়েই কয়লাখনি শ্রমিকদেরও চলছিল এক নিরবচ্ছিন্ন ধর্মঘট সংগ্রাম। শ্রমিকদের শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি বৃদ্ধির সাফল্যের মধ্য দিয়ে সেই ধর্মঘটের গৌরবজনক পরিসমাপ্তি ঘটল।

এমনি একটা পরিস্থিতিতে ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে ৩০শে নভেম্বর, ১৯২১ অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হল।

দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল বক্তব্য ও সিদ্ধান্তসমূহ

৩০শে জুলাই, ১৯২১ বোম্বাই-এর সার্ভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া হলে লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বিহারের ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে নভেম্বর মাসে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে যোশেফ ব্যাপ্টিস্টা ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা স্বামী বিশ্বানন্দকে অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং রামযশ আগরওয়ালাকে চেয়ারম্যান করে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতের সর্বস্তরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন স্থল খনিশ্রমিক এবং নারী-পুরুষ প্রতিনিধি ও দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রতিদিন অধিবেশনে পঞ্চাশ হাজার নর-নারী সমবেত হতেন।

সম্মেলন মঞ্চে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন: স্বামী বিশ্বানন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী স্বামী দর্শনানন্দ, হরদেবদাস আগরওয়ালা, ডি. ডি. ট্যাকার, করমশী খোরা, কেশবজী পিতম্বর, মাধবজী জীবন, লালা নারায়ণ সিং, নিবারণচন্দ্র সরকার, শেঠ ছগনলাল, কে. পারেখ, ডঃ দৌলত রাম, শ্রীমতি সাবিত্রী দেবী, ই. এল. আয়ার, জলিল খাঁন, আই. বি. সেন, এম. ডি. দালভী, দেওয়ান চমনলাল, অধ্যাপক কৌশিক, ডি. আর ঠেংডি, জে. এইচ. প্যাটিসন, সিম্পসন, গিলক্রিষ্ট এবং আর. এ. মুকাদ্দম।[১]

বিভিন্ন শ্রমসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং বন্দেমাতরম গীত হবার পর অধিবেশন শুরু হল। তারপর অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান রামযশ আগরওয়ালা তাঁর স্বাগত ভাষণ প্রদান করলেন। উল্লেখযোগ্য যে শ্রী আগরওয়ালা ছিলেন ঝরিয়া অঞ্চলের একজন কয়লাখনি মালিক।

১। A. I. T. U. C.—Fifty years, Collection of Documents, Vol. I. p. 108.

আরো উল্লেখযোগ্য যে সম্মেলন মণ্ডপটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল খাদি বস্ত্রের দ্বারা এবং ঐ মণ্ডপে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদেরও অধিকাংশই ছিলেন খাদি পরিহিত।

আরো লক্ষণীয় যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বোম্বাই সম্মেলনের তুলনায় ঝরিয়া সম্মেলনে অনেক বেশী আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছিল। গান্ধী বাদে সি. আর. দাশ, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ প্রথম-সারির কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের যে নেতৃবৃন্দ এবং যে প্রতিষ্ঠাবান নাগরিকরা সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন: সি. আর. দাশ, লালা লাজপত রায়, সরোজিনী নাইডু, সরলাদেবী চৌধুরাণী, অবন্তিকাবাঈ গোখেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, জে. এল. ব্যানার্জী, এস. সত্যমূর্তী, পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এস. এ. ব্রেলভী, শেঠজামাল বাজাজ, এম. বি. ওয়েলকার, গোপাল আচারী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, লালা গোবর্ধন দাস, সর্দার পি সিং, ভি. এম. পাওয়ার, চণ্ডিকাপ্রসাদ, কে. ডি. যোশী, সিঙ্গরাভেলু, এফ. জি. গিনওয়ালা, এস. এইচ. ঝাবওয়ালা, ডঃ এন. ডি. সওয়ারকর, জি. এস. কান্তি, কাঞ্জী দোয়ারকাদাস।[১]

ঝরিয়া অধিবেশন শুধুমাত্র জাতীয় ক্ষেত্রে নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। ব্রিটিশ ব্যুরো অফ দি রেড ট্রেড ইউনিয়ন ইণ্টারন্যাশনাল সম্মেলনে একটি পত্র প্রেরণ করে। ঘটনাটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া বিদেশের অন্যান্য যে সব প্রখ্যাত ব্যক্তি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ অফ ইণ্ডিয়া (লণ্ডন), স্কটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, আইরিশ লেবার পার্টি এণ্ড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (ডাবলিন), মাইনার্স ফেডারেশন অফ গ্রেট বৃটেন, মিঃ বাওয়ারম্যান, এম. পি. (লণ্ডন), নরউইচ লেবার পার্টি ইনডাস্ট্রিয়াল কাউন্সিল, ই. এল পলটন, (লণ্ডন), এলিজাবেথ উইলসন (লাইটস স্টার, জর্জ কেম্পটন (লণ্ডন) ইনডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি (লণ্ডন), জি. সি. বৃস্টন, জেনারেল ইউনিয়ন অফ টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স (হাডার্স ফিল্ড), কেটারিং এণ্ড লেবার কাউন্সিল, আলফ্রেড হিল (লাইসেস্টার), ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ

১। Ibid. p 111.

বিল্ডিং ট্রেড অপারেটিভস্ (লণ্ডন), ডি. এম. পেজ, ইণ্ডিয়ান ট্রেডস ইউনিয়ন (মোম্বাসা)।[১]

লণ্ডনের ব্রিটিশ ব্যুরো অফ ট্রেড ইউনিয়ন ইণ্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে মিঃ টমম্যান ও মিঃ এন. ওয়াটকিনস ঝরিয়া অধিবেশনে যে পত্র প্রেরণ করেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি স্পষ্ট বক্তব্য এই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শ্রমিকদের দ্বারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নিকট পরিবেশিত হয় এই পত্রের মাধ্যমে। পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য তাই অনস্বীকার্য। পত্রে বলা হয়েছে।[২]

'তোমাদের সুন্দর মানুষগুলো আমাদের পুঁজিবাদী শোষকদের লালসার দ্বারা যেখানে পাণ্ডুর দাসত্বে পিষ্ট হচ্ছে সেই বাংলাতে অন্ধকার এবং ধূলিকাচ্ছন্ন কয়লাখনি অঞ্চলে তোমাদের এই মহান সম্মেলনে তোমাদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। রেড ট্রেড ইউনিয়ন ইণ্টারন্যাশনালের ব্রিটিশ ব্যুরো হিসাবে আমরা শুধু ব্রিটিশ শ্রমিকদের অভিনন্দনই তোমাদের জানাচ্ছি না, আমরা তোমাদের জানাচ্ছি এই মহান আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের অভিনন্দনও। কমরেডস আমরা জানি তোমাদের সাফল্য কামনা করে আমরা সকলের সাফল্য এবং স্বাধীনতাই কামনা করছি। অতীতের অদূরদর্শী শ্রমিক আন্দোলন এই মহান সত্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল এবং পশ্চিমী পুঁজিবাদী দাসত্বকে নিরাধ এবং অসহায় জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছিল এবং আমরা সকলেই এখন তার ফল প্রত্যক্ষ করছি।

'কমরেডস, এই বিধ্বস্ত, বিভক্ত, নির্যাতীত এবং লুণ্ঠিত পৃথিবীর দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখুন। ঘৃণ্য আমস্টারডাম ইণ্টারন্যাশনালের মধ্যে সংঘবদ্ধ ভাবনা-চিন্তাহীন পশ্চিমী শ্রমিকরা পৃথিবীর বুকে এই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এই শ্রমিকরা তাদের পুঁজিবাদী প্রভুদের হাতে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং একে অপরকে হত্যা করেছে ও একে অপরের সর্বস্ব অপহরণও করেছে। যে ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় সৈনিকরা জনগণকে ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং বিদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করবার জন্য দূর প্রাচ্যের শান্তিপূর্ণ দেশগুলিতে বলপূর্বক প্রবেশ করে তারা সকলেই সর্বহারার সন্তান।

১। Ibid. p. 112

২। Bombay Chronicle, December 3, 1921, quoted in A.I T. U. C Fifty years,—Collection of Documents. Vol I, pp. 170—172

এই শ্রমিকেরা আমস্টারডাম ইণ্টারন্যাশনালের সদস্যভুক্ত। তারা নির্যাতন নিজেদের মুক্তির কথা বলে, তারা তাদের প্রভুদের কথা বলে এবং এইভাবে তারা নিজেরা নিজেদের পুঁজিবাদী প্রভুদের মতই সাম্রাজ্যবাদী এবং সংকীর্ণ-স্বার্থসম্পন্ন হয়ে থাকে।

'পুরাতন পৃথিবীর দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করা বৃথা। আসুন আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা পৃথক এবং নতুন পৃথিবীর জন্য লড়াই করি যে পৃথিবীতে কোন জাতি থাকবে না সাম্রাজ্যবাদী, কোন জাতি হবে না পরাভূত। এই পৃথিবীতে অধিকার সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের।

'তোমাদের মহান এবং কৃষ্টিসম্পন্ন দেশের ১৮ কোটি মানুষ যাঁরা এখন শিল্প এবং হস্তশিল্পের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করছে তাঁদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। সম্পূর্ণ সমমর্যাদা নিয়ে পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক সংহতির এই মহান এবং নতুন আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আমরা তোমাদের আবেদন জানাই। আমরা আরো অগ্রসর হয়ে বলছি তোমরা এই আন্দোলনে যোগ দাও তোমাদের নিজেদের স্বার্থে যেমন তেমনি আমাদের স্বার্থেও। কারণ আমরা উপলব্ধি করি, যতদিন তোমরা ক্রীতদাস হয়ে থাকবে এবং মুক্ত হবে না ততদিন পাশ্চাত্যদেশে আমরাও মুক্ত হতে পারিনা। আমরা বিশ্বাস করি তোমাদের কমিটির অন্যতম প্রথম কাজ হবে এই নতুন ইণ্টারন্যাশনালের ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। আমরা আরো আশা করি যে লণ্ডনে তোমাদের প্রতিনিধি ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ ফর ইণ্ডিয়া যাতে আমাদের সঙ্গে তোমাদের হয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে তার জন্য তোমাদের কমিটি নির্দেশ দেবে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি, যাদের সদস্যরা তাদের প্রভুদের মতই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন আমরা দূরে থেকে তাদের কৌতুকজনক পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি ইণ্ডিয়া অফিসের আমলাদের তুষ্ট করবার জন্য তারা কিভাবে তোমাদের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেছে এবং মিঃ হার্নিম্যান এবং মিঃ সাকলাতওয়ালাকে [১] তাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে

১। ৩০শে জুলাই, ১৯২১ তারিখে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ কমিটির পঞ্চম বৈঠকে স্থির হয়েছিল যে মিঃ বি. জি. হার্নিম্যান এবং শাপুরজী সাকলাতওয়ালা ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে এ. আই. টি. ইউ. সির প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করবেন।

এবং তোমাদের সম্পর্কে সত্য ঘটনাগুলিকে প্রকাশ করতে বাধা দিয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আমাদের সম্মেলনগুলিতে যোগ দেবার জন্য তোমাদেব মনোনীত কমরেডদের আমরা স্বাগত জানাব। এবং আরো বিশ্বাস করি, অতি স্বল্পকালের মধ্যেই আমরা দেখতে পাব যে ব্রিটিশ শ্রমিকদের পাশাপাশি ভারত থেকে আমাদের বন্ধু, কমরেড এবং ভাইএরা রেড ট্রেড ইউনিয়ন ইণ্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে এসে যোগ দিচ্ছেন।

'আপনাদেব সাফল্যের জন্য জানাই আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, আর জানাই আপনাদের প্রতি আমাদের সমর্থন, সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছার সর্বরকম প্রতিশ্রুতি।'

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকরা যখন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে তথা জনগণকে অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে ব্রিটিশ অর্থ-নীতিকে সম্পাদসম্পন্ন করে তুলছে তখন ব্রিটিশ শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই পত্রে যে বক্তব্য উত্থাপন করা হয়েছে তা ভারতেব শ্রমিক আন্দোলন শুধু নয় ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী এক তাদের স্বার্থও অভিন্ন, উপনিবেশের শ্রমিকদের মুক্তি শুধু উপনিবেশের শ্রমিকদের স্বার্থেই নয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকদের মুক্তির স্বার্থেবও প্রয়োজন, ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকের মুক্তির প্রশ্নটি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, ঔপনিবেশিকবাদ বজায় রেখে, অপর দেশের শ্রমিকদের পদানত ও নির্যাতীত কবে যে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকের মুক্তি সম্ভব নয় এবং সেই জন্যই যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীও উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম লড়তে হবে—শ্রমিক-শ্রেণীর এই আন্তর্জাতিক ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এই পত্রে। এই পত্রের মর্মবাণী ভারতীয় শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও চেতনা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পালন করেছিল অন্যতম প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এ আই. টি. ইউ. সির প্রথম অধিবেশনে ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রতিনিধি যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার সঙ্গে এই পত্রের বক্তব্য ছিল আমূল পৃথক।

এই অধিবেশনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির আরেকটি প্রকাশ ঘটে একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে। সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ তখন বিদেশী হস্তক্ষেপে এবং গৃহযুদ্ধজনিত অবস্থায় প্রবল দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সম্মুখীন। ঝরিয়া সম্মেলন রুশ জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণের জন্য প্রতীক সাহায্য প্রেরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে রুশ জনগনের শান্তির সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সম্মেলন আবেদন জানায়।

বোম্বাই সম্মেলন থেকে ঝরিয়া সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ঝরিয়া সম্মেলনে স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নাগপুর অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যেই স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তার প্রতিফলন ঝরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনেও প্রতিফলিত হল। স্বরাজের প্রস্তাবটিই ছিল সম্মেলনের একনম্বর প্রস্তাব। দেওয়ান চমনলাল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটিতে বলা হয়, 'এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে ভারতের জনগণ কর্তৃক স্বরাজ অর্জনের সময় এখন উপস্থিত হয়েছে।' শ্রমিকদের সঙ্গে স্বরাজের কোন সম্পর্ক নেই—কোন কোন মহল থেকে প্রচারিত এই ধরনের ভ্রান্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করে চমনলাল প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন যে যারা বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং গাড়ী-বাড়ী ও সরকারী খানাপিনায় অভ্যস্ত স্বরাজ তাদের জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের পরিশ্রমের ফলেই ধনীর কোষাগার পূর্ণ হয় স্বরাজ সেই মানুষদের জন্যই। চমনলাল যখন প্রতিনিধিমণ্ডলীকে প্রশ্ন করেন তাঁরা স্বরাজ চান কিনা তখন প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি করে স্বরাজের স্বপক্ষে রায় দেন।[১]

স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণের পরই সম্মেলনে দ্বিতীয় যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছিল সেটি ছিল কংগ্রেসী ধ্যানধারণা এবং গান্ধী-চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। দার্জিলিং-এর শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী কর্তৃক খুব জোরালো ভাষায় উত্থাপিত এই প্রস্তাবে বলা হয় 'এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভারতের স্বদেশী গ্রহণ সুপারিশ করছে এবং সুতাকাটা ও হস্তবয়নে উৎসাহ প্রদান করছে।'[২] অর্থাৎ গান্ধীর চরখা অর্থনীতি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সমর্থন পেল। এর মধ্য দিয়ে তৎকালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনার পাশাপাশি কংগ্রেসী রাজনীতির প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

১। **A. I. T. U. C.—Fifty Years Collection of Documents. Vol. I. pp 111-112**

২। **Ibid. p. 119.**

সম্মেলনের আরেকটি প্রণিধানযোগ্য দিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ। প্রস্তাবে যুদ্ধকে নিন্দা করা হয়, কারণ যুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকদের অযথা ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং প্রাণ দিতে হয়। সম্মেলনে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান জানানো হয়।

এ ছাড়া শ্রমিকদের জন্য স্ট্রাইক ফাণ্ড গঠন করা, কয়লাখনি ও রেলশ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, ভারতের বাইরে উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা, ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করে। তা' ছাড়া, জাতিগত ভিত্তিতে বেতন বৈষম্যের নিন্দা করেও সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বোম্বাই সম্মেলনে। কিন্তু বোম্বাই ও ঝরিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলন একত্রিতভাবেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করে। বোম্বাই কংগ্রেসে যা ছিল অসম্পূর্ণ ঝরিয়া কংগ্রেসে তা হয় সম্পূর্ণ।

কিন্তু ঝরিয়া সম্মেলন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মূলত রইল কংগ্রেসী রাজনীতিরই প্রভাবে। কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে অবশ্যই আরও কয়েক বৎসর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত চিন্তাধারা ঝরিয়া কংগ্রেসে তখনও পরিস্ফুট হয় নি। সম্মেলনের সভাপতি ব্যাপ্টিস্টার ভাষণে চিন্তার দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে প্রকটভাবে। ব্যাপ্টিস্টা বলেন, 'আমাদের নীতি হবে চরম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও বলশেভিকবাদ থেকে স্পষ্টভাবে দূরে থাকা এবং আমাদের গ্রহণ করতে হবে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের সঠিক মধ্যপন্থা।' এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনে শিক্ষিত হতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা গগনেও নতুন ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটতে শুরু করল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা, মার্কসীয় দর্শন দেশের তরুণদের এক ক্ষুদ্রাংশকে প্রভাবান্বিত করল। তার প্রভাব অনিবার্যভাবেই এসে পড়ল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর। ভারতের রাজনীতিতে নতুন চিন্তা ও নতুন দর্শনের বিকাশ এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর তার প্রভাব ও অপরদিকে জাতীয় কংগ্রেসের ভাবধারায় পুষ্ট আপোষমুখীন ও সংস্কারবাদী চিন্তা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে এক দ্বন্দ্বসংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত করল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরবর্তী ইতিহাস তাই বহু ভাঙাগড়া ও সংঘর্ষের ইতিহাস।

*　　*　　*　　*　　*

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরবর্তী ইতিহাস আলোচিত হবে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নয়, ১৯২০-২১ সাল পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, তার চেতনার উন্নততর বিকাশ মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব ও বিস্তার, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন—শ্রমিক আন্দোলনে যে নতুন দিগন্তের সূচনা করল তার ইতিবৃত্ত এবং মূল্যায়নও পরবর্তী খণ্ডেই দ্রষ্টব্য। শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতায় এবং মার্কসীয় দর্শনের বিস্তারে আতঙ্কিত ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী ভারত ইতিহাসের এই বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই নির্মূল করবার জন্য মারাত্মক আঘাত হানল। শুরু হল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। তারপর সারা ধনতান্ত্রিক জগতকে আচ্ছন্ন করল বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কালোছায়া। সেই প্রবল সংকটের যুগে অপরিসীম নির্যাতনের মোকাবিলা করে অগ্রসর হল ভারতের শ্রমিক আন্দোলন। রাজনৈতিক মঞ্চে জাতীয় কংগ্রেসের নগ্ন আপোষমুখীন কার্যকলাপ এবং তার পাশাপাশি শ্রমিক-শ্রেণীর নব উদ্ভাষিত বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সৃষ্টি করল এক সুস্পষ্ট বৈপরীত্য। কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণীর উপর নিয়ে এল নতুনতর নিপীড়ন। তারপর দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, আর এই বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী প্রবেশ করল এক নতুন সংগ্রামী অধ্যায়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পট পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। তারপর জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম আপোষরফার পাশাপাশি ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সমাজ, ছাত্র সমাজ ও সেনাবাহিনীর একাংশ প্রদর্শন করল এক আপোষবিহীন জঙ্গী সংগ্রামের পথ। কিন্তু গণ-আন্দোলনে আতঙ্কিত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ভারত বিভাগ মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে করল আপোষরফা। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। কিন্তু ১৯৪৭ সাল পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলন প্রবেশ করল এক নতুনতর অধ্যায়ে —যে অধ্যায়ে শত্রু-মিত্রের পরিবেশ ভিন্নতর। সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত কর্মচারীরাও ইতিমধ্যে নেমে এসেছেন দুর্বার সংগ্রামে। তাঁরাও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে সংযোজন করলেন এক নতুন অধ্যায়। ১৯২০-২১ সালে পরবর্তী চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই সামগ্রিক সংগ্রামী প্রেক্ষাপট আলোচিত হবে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ড

ঢ

ত

দ

ন

প

ফ

ব

ল

শ

স

হ
